বৌদ্ধকোষ

[Encyclopaedia of Buddhism]

দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টসহ)

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৭-৯৮

কার্যকরী সম্পাদিকা : ডঃ বেলা ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে বৌদ্ধকোষ (Encyclopaedia of Buddhism) দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই পালি বিভাগ ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের মধ্যে প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করে যে সমস্ত গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত এবং তাতেই এই বিভাগের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি বিশেষ গৌরব দাবী করতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগের উন্নতির প্রতি সর্বদা সচেষ্ট এবং তাঁদের সহযোগিতায় ও অর্থানুকুল্যে অনেক পালিগ্রন্থ আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে, নিয়মিত Journal of the Department of Pali প্রকাশিত হচ্ছে এবং বর্ত্তমান বৌদ্ধকোষও প্রকাশিত হচ্ছে।

বৌদ্ধকোষের প্রথম খণ্ডে জাতক অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। জাতক পালি সাহিত্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সেজন্য এবার থেকে বৌদ্ধকোষে জাতক সম্বন্ধে রচনা থাকা আমরা সমীচীন মনে করি। সুতরাং প্রথম খণ্ডে বাদ দেওয়া জাতকগুলি আমরা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হল। তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে এবং প্রকাশনার মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ত্তি থাকতে পারে ; কোন প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পণ্ডিতগণ যদি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে পরবর্ত্তী খণ্ডে তা সংশোধন করবার চেষ্টা করবো।

পরিশেষে আমরা ভগবান বুদ্ধের অন্তিম-বাণী স্মরণ করি—

বয়ধম্মা সংখারা
অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধ পূর্ণিমা
১৯৯৯

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
বেলা ভট্টাচার্য
কার্যকরী সম্পাদিকা

প্রথম খণ্ড

পরিশিষ্ট

অকালরাবি জাতক—১১৯

শ্রাবস্তীনগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক যুবক বুদ্ধের দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুব্রত পালনে তাঁর মন ছিল না। কর্তব্যকর্মে প্রায়ই অবহেলা করতেন এবং কখন শাস্ত্রপাঠ করতে হবে কখন বুদ্ধের অর্চনা করতে হবে তা কিছুই জানতেন না। কেবল মাঝে মাঝে সময়ে অসময়ে, এমন কি গভীর রাত্রেও বিকট চিৎকার করতেন। এতে অন্য ভিক্ষুদের নিদ্রার ব্যাঘাত হত এবং ঠিকমত পড়াশুনা হত না। এজন্য তারা জেতবনে ধর্মসভায় তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন, 'অমুক ভিক্ষু এরূপ সংঘে প্রবেশ করেও কর্তব্যাকর্তব্য ও কালাকাল জ্ঞান লাভ করতে পারলেন না।' শাস্তা বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচ্য বিষয় জানতে পেরে মন্তব্য করলেন, এই ব্যক্তি অতীতকালেও অকালরাবি হয়ে শাস্তিভোগ করেছিলেন, এই বলে তাঁর পূর্বজন্মের এক কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্তির পরে বহু শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক হয়েছিলেন। তাঁর পাঁচশত শিষ্যের একটা মোরগ ছিল। সে যথাসময়ে ডাকত এবং ঐ ডাক শুনে নিদ্রাত্যাগপূর্বক পাঠ অভ্যাস করত। কিছুদিন পরে ঐ মোরগটি মারা গেলে এক শিষ্য শ্মশান থেকে আরেকটা মোরগ ধরে নিয়ে এল। শ্মশানে বড় হয়েছে বলে কখন ডাকা উচিত সে তা জানত না। গভীর রাতে তার ডাক শুনে নিদ্রাভঙ্গ হলে শিষ্যেরা পাঠ আরম্ভ করত। কিন্তু ভোর হতে না হতেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং ক্লান্তিবশতঃ পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারত না। আবার প্রভাত হবার পর যখন মোরগটি ডাকত তখন তারা পাঠের জন্য আদৌ অবসর পেত না। এইভাবে মোরগের অকালরবহেতু তাদের পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে দেখে খুব বিরক্ত হয়ে শিষ্যরা একদিন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলল এবং সেই কথা আচার্যকে জানাল। তখন আচার্য গাথা আবৃত্তি করে শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে যদি কেউ মাতাপিতা কর্তৃক ভালভাবে লালিত পালিত না হয় কিংবা আচার্যের নিকট প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষালাভ না করে, সে জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করে, এমনকি এই মোরগের মত অকালে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "আমি ছিলাম সেই আচার্য, জেতবনবিহারের ভিক্ষুগণ ছিলেন আচার্যের শিষ্যবৃন্দ আর চিৎকারকারী ভিক্ষু ছিল সেই মোরগ।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অগ্নিক জাতক (অগ্গিক জাতক)—১২৯

শাস্তা বুদ্ধ জেতবনে জনৈক ভণ্ডভিক্ষুর সম্পর্কে বলেছিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব জন্মে ও ভণ্ড ছিল"। অত:পর তিনি সেই অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকরূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের রাজা হয়ে অরণ্যে বাস করতেন। একদিন জঙ্গলে দাবানল জ্বলে উঠলে এক শৃগাল পালাতে

না পেরে কোন বৃক্ষের কাণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে মাথায় শিখার মত একগুচ্ছ লোম ব্যতীত শরীরের সমস্ত লোম পুড়ে গেল। সে একদিন এক সরোবরে জলপান করবার সময় নিজের প্রতিবিম্বে লোমগুচ্ছটি দেখে ভাবল, "এতদিনে আমার জীবনযাপনের একটা উপায় হল"। তারপর মূষিকদের গুহা দেখতে পেয়ে ঠিক করল, "আমি এদের প্রতারিত করে মারব এবং খাব"। তখন সে গুহার কাছে একপায়ে ভর দিয়ে সূর্যের দিকে মুখ রেখে ভণ্ডামি করে বায়ুপান করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব খাবারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে শৃগালকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভাবলেন, "মনে হচ্ছে এই শৃগালের স্বভাব ভাল" তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়ের নাম কি?" শৃগাল বলল, "আমার নাম অগ্নিভরদ্বাজ।" "এখানে কি অভিপ্রায়ে এসেছেন?" 'তোমাদের রক্ষার জন্য।" 'আমাদের কি উপায়ে রক্ষা করবেন"? "আমি আঙুল দিয়ে গুণতে পারি। তোমরা যখন সকালে খাবারের জন্য গুহা থেকে বেরিয়ে চরায় যাবে তখন একবার তোমাদের সংখ্যা গুণব, আবার সন্ধ্যাকালে যখন ফিরবে তখনও গুণব। এইভাবে তোমাদের রক্ষা করব"। "আপনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন, মামা! এখন থেকে আপনি আমাদের রক্ষক হলেন"। "বেশ তাই হবে"।

অত:পর যখন মূষিকগণ সকালে গুহা থেকে বেরিয়ে যেত তখন শৃগাল তাদের একবার গুণত, এবং সন্ধ্যার সময় যখন গুহায় ফিরত তখন আবার গুণত এবং সকলের পিছনের মূষিকটিকে ধরে চিবিয়ে খেত, তারপর মুখ পুঁছে সাধু সেজে বসে থাকত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে যখন মূষিকদের সংখ্যা কমে গেল, তখন বোধিসত্ত্বের শৃগালের উপর সন্দেহ জন্মাল। তাকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি গুহায় ফিরবার সময় সকলের পিছনে রইলেন। শৃগাল গণনা শেষ করে বোধিসত্ত্বকে মারবার জন্য তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ল। তিনি সাবধান ছিলেন বলে শৃগালের আক্রমণ ব্যর্থ হল। তখন বোধিসত্ত্ব শৃগালের দিকে ফিরে বললেন, "ওহে অগ্নিভরদ্বাজ, তুমি শিখা রেখেছ ধর্মের জন্য নয়, উদরপূর্ত্তির জন্য"। তারপর তিনি গাথার সাহায্যে বললেন 'শিক্ষা তোমার পেটের জন্য, পুণ্যের জন্য নয়। তোমার প্রকৃত পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি, তোমার ভণ্ডামিতে আর ভুলবনা। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "পূর্বজন্মে এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিকরাজ"।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অট্‌ঠিসেন জাতক (অস্থিসেন জাতক)—৪০৩

শাস্তা বুদ্ধ এক সময় আলবির নিকটে অগ্রালব চৈত্যে অবস্থানকালে কুটীরনির্মাণ বিষয়ক শিক্ষাপদ সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন। তখন আলবির ভিক্ষুগণ কুটীর নির্মাণ করবার সময় লোকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁরা প্রায়ই অভাব জানিয়ে জন, মজুর ও জিনিষপত্র চাইত। তাঁদের যাচ্‌ঞার অতিমাত্রাবশত: লোকেরা নিজেদের উপদ্রুত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল এবং শেষে ভিক্ষু দেখলেই পালিয়ে যেত। ভিক্ষুদের এরূপ আচরণের কথা জানতে পেরে

বুদ্ধ তাঁদের বললেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্বে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়নি তখন অন্য ধর্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ও সাধুরা কখনও লোকের নিকট যাচ্ঞা করেন নি। রাজারা তাঁদের পরিচর্যা করেন ; তথাপি চাওয়ায় অপরের বিরক্তি জন্মে, এই বিবেচনায় তাঁরা কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নি"। অনন্তর তিনি সেই পূর্বজন্মের কথা বলতে আরম্ভ করলেন :—

প্রাচনীকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল অস্থিসেন-কুমার। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন। অনন্তর বিষয় ভোগের পরিণামে দুঃখ আছে উপলব্ধি করে বোধিসত্ত্ব সন্যাস গ্রহণ পূর্বক দীর্ঘকাল হিমালয় প্রদেশে বাস করলেন। একদা লবণ ও অম্ল সেবনার্থে লোকালয়ে নেমে এলেন এবং পরে বারাণসীতে এসে রাজার উদ্যানে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষা চর্য্যায় বেরিয়ে রাজাঙ্গনে গেলেন। রাজা তাঁর চালচলন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন এবং পালঙ্কে বসিয়ে উৎকৃষ্ট ভোজ্য খাওয়ালেন। আহারান্তে বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিলেন ; তাতে অতীব প্রীত হয়ে তাঁর রাজোদ্যানে বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্বের ধর্মকথায় এত খুশী হলেন যে রাজা বললেন, "মহাত্মন, আপনার কোন জিনিষ দরকার আমাকে বলুন, আমার রাজ্য পর্যন্ত আপনাকে দিতে পারি"। কিন্তু তিনি কিছুই চাইলেন না। তখন রাজা ভাবতে লাগলেন। "অন্য ভিক্ষুক ও যাচকেরা এটা দিন, ওটা দিন' বলে আমার নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু আচার্য্য অস্থিসেনকে অনুরোধ করেও কিছু দেওয়া গেল না। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁকে জিজ্ঞেসা করে দেখি ব্যাপার কি?" অনন্তর রাজা একটি গাথা আবৃত্তি করে জিজ্ঞাসা করলেন অন্যে জিনিষ প্রার্থনা করে অস্থিসেন কেন করেন না। তার উত্তরে দ্বিতীয় গাথায় আচার্য্য বললেন যে যাচক বা যাচিত যদি অপ্রিয় হয় এবং ঈপ্সিত জিনিষ প্রদান না করে, সেইজন্য আমি প্রার্থনা করিনা। তিনি আর ও বললেন, "মহারাজ, যারা বিষয়ভোগী ও গৃহী, যাচ্ঞা তাদেরই অভ্যস্থ, প্রব্রাজকদের ইহা শোভা পায় না ; তাঁরা পরিশুদ্ধভাবে চলবেন এবং গৃহীদের ন্যায় চলবেন না।" এইরূপে রাজাকর্তৃক কিছুমাত্র প্রার্থনা করতে বা কোন দান করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'মহারাজ, অকিঞ্চন হব, এই সংকল্পে প্রব্রজ্যা নিয়েছি"। অতঃপর রাজা তাঁর উপদেশানুসারে চলে দানাদি পুণ্যকাজ করে স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত হলেন ; আর্য্য অস্থিসেন ও অপরিসীম দানবলে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করলেন। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম অস্থিসেন।'

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অণ্ডভূত জাতক—৬২

তথাগত বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু কোন রমণীর জন্য খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ জানতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে ভিক্ষু তুমি নাকি সত্যিই উৎকণ্ঠিত হয়েছে।" "হ্যাঁ ভদন্ত, আমি সত্যিই

উৎকণ্ঠিত হয়েছি।" তখন বুদ্ধ বললেন, "দেখ রমণীরা নিতান্ত অরক্ষণীয়া। পুরাকালে জনৈক পণ্ডিত কোন নারীকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করেও সৎপথে রাখতে পারেন নি। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করেলন।

প্রাচীনকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে যথাধর্ম প্রজাপালন করতে লাগলনে। তিনি পুরোহিতের সঙ্গে পাশা খেলতেন এবং পাশা ফেলবার জিতবার আশায় মন্ত্রোচ্চারণ করে বলতেন, "যার স্বভাব যে রকম সে সেভাবে চলে, কারো সাধ্য নেই এ লঙ্ঘন করবার ; রমণীরা পাপপরায়ণ যখন সুবিধা পায় তারা কুপথে ধাবিত হয় আর ধর্মে মতি হয় না। এই মন্ত্রের প্রভাবে রাজা প্রতিবারেই বাজি জিততেন আর ক্রমাগত হারতে হারতে পুরোহিত প্রায় নিঃস্ব হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন "এমন একটি মেয়ে আনাব যে জন্মের পর থেকে অন্য পুরুষের মুখ দেখেননি, কেবল আমার রক্ষণাবেক্ষণেই থাকবে তাহলে আমার বশে থাকবে। তার চরিত্র ভাল থাকবে, আমিও পাশায় বাজি জিতে ধন লাভ করতে পারব।" পুরোহিত অঙ্গবিদ্যার সাহায্যে বুঝতে পারলেন এক গরিব গর্ভবতী নারী কন্যাসন্তান প্রসব করবে। তিনি তাকে ঘরে এনে রাখলেন এবং প্রসবের পর প্রসূতিকে কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। কন্যার লালন পালনের ভার অর্পিত হল শুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ওপর। সে পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মুখ দেখতে পেত না। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশবর্তিনী হয়ে বড় হতে লাগল। কন্যাটি পূর্ণবয়স্কা না হওয়া অবধি পুরোহিত রাজার সহিত পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হলেন না। সে যৌবনে উপনীত হলে তিনি তাকে বিবাহ করলেন এবং তারপর রাজাকে খেলায় আহ্বান করলেন। এবার থেকে তাঁর জয় হতে থাকল। রাজার সন্দেহ হল এবং তিনি অনুসন্ধান করে পুরোহিতের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা স্ত্রীর কথা জানতে পারলেন। এখন এই রমণীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাবার জন্য তিনি কিছু টাকা দিয়ে এক ধূর্তকে নিয়োগ করলেন।

ধূর্ত রাজদত্ত ধন দ্বারা গন্ধ, ধূপ, নানাবিধ চূর্ণ কিনে পুরোহিতের গৃহের অনতিদূরে একটি গন্ধদ্রব্যের দোকান খুলল। পুরোহিতের বাড়ির প্রত্যেক দরজায় রমণী প্রহরিণী থাকত। যারা ঝুড়িতে করে আবর্জনা ফেলতে যেত তাদের যেতে আসতে প্রহরিণীরা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করত। কাজেই সেই পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ প্রবেশ করতে পারত না। পুরোহিত পত্নীর একজন মাত্র পরিচারিকা ছিল। সে রোজ অর্থ দিয়ে গন্ধপুষ্পাদি কিনবার জন্য ধূর্তের দোকানের নিকট দিয়ে যেত। ধূর্ত বুঝল সে পুরোহিত পত্নীর দাসী এবং একদিন দুহাতে দুপা ধরে, 'মা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে' বলে কাঁদতে লাগল। ঐ ধূর্ত আগে থেকে কয়েকজন ধূর্তকে ঠিক করে রেখেছিল। তারা এক পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "কি আশ্চর্য্য, মাতা ও পুত্র দুজনেরই এক চেহারা, দুজনের মধ্যে কোন তফাত নেই।" পুনঃ পুনঃ নানাজনের মুখে একই কথা শুনতে শুনতে দাসী মনে করল সত্যই ধূর্ত তার ছেলে এবং সে ও তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ধূর্ত তখন জিজ্ঞাসা করল, "মা, তুমি কোথায় আছ?" দাসী বলল যে সে পুরোহিতের অপরূপা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর পরিচারিকা এবং এখন তার জন্য গন্ধদ্রব্য কিনতে দোকানে যাচ্ছে। ধূর্ত তাকে বিনামূল্যে সব জিনিষ দিল। পুরোহিত পত্নী প্রচুর গন্ধপুষ্প পেয়ে খুশী হয়ে বলল, " ঝি মা, ব্রাহ্মণ আজ আমার এত প্রসন্ন যে

এত রাশি রাশি পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য পাঠিয়েছেন।" "না মা, আমার ছেলের দোকান থেকে এই সব এনেছি।" সেদিন থেকে ব্রাহ্মণ যে দাম দিতেন, দাসী তা আত্মসাৎ করত এবং ধূর্তের নিকট থেকে গন্ধপুষ্পাদি নিয়ে যেত।

ধূর্ত কয়েক দিন পরে অসুখের ভাণ করে শুয়ে রইল। দাসী এসে খবর পেয়ে ধূর্তকে দেখতে গেল এবং তাকে বলল, "বাছা, তোর কি অসুখ করেছে?" সে চুপ করে রইল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে বলল, "মা, আমার অন্য কোন অসুখ করেনি। তোমার মুখে পুরোহিত-পত্নীর রূপের কথা শুনে আমি সেই যুবতীর প্রেমে পড়েছি। তাকে না পেলে আমি মারা যাব।" দাসী ধূর্তকে আশ্বাস দিয়ে পুরোহিত-পত্নীর নিকট গিয়ে বলল, মা ঠাকরুণ আমার ছেলেটা তোমার রূপের কথা শুনে পাগল হয়েছে ; এখন কি করি?" "আমি তোকে অনুমতি দিলাম, পারিস্ তো তাকে এখানে নিয়ে আসিস্।" এই আদেশ পেয়ে দাসী বাড়ীর সমস্ত ময়লা ঝাট দিয়ে একটি বড় ঝুড়িতে করে ফেলতে যেত ; যেই প্রহরিণীরা পরীক্ষা করতে চাইত অমনি তাদের মাথার উপর আবর্জনা ফেলে দিত এবং শেষে তারা পরীক্ষা করা ছেড়ে দিল। সুযোগ বুঝে সে একদিন ধূর্তকে ঝুড়িতে বসিয়ে পুরোহিত-পত্নীর কাছে নিয়ে গেল।

ধূর্ত দু-একদিন প্রসাদে থাকল ; যখন পুরোহিত বেরিয়ে যেতেন তখন তাঁর পত্নীর সাথে আমোদ প্রমোদ করত, অন্য সময় লুকিয়ে থাকত। এইরূপে পুরোহিত-পত্নীর চরিত্র নষ্ট হল। একদিন সে নাচবার ভান করে পুরোহিতের চোখ বেঁধে ধূর্তকে দিয়ে প্রহার করাল। তারপর ধূর্ত পলায়ন করে রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল।

অনন্তর পুরোহিত রাজ সভায় গেলে রাজা তাঁকে পাশা খেলায় আহ্বান করলেন। এবার ক্রমাগত পুরোহিত হারতে লাগলেন। এমনকি স্ত্রীর নামে সত্যক্রিয়া করা সত্বেও। তখন রাজা বললেন, "পুরোহিত, আপনার স্ত্রীর পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। তাকে জন্মবধি পাহারা দিয়েও তার চরিত্র রক্ষা করতে পারেন নি" এই বলে ধূর্তের সমস্ত ব্যাপার জানালেন। তখন পুরোহিত বাড়ী গিয়ে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল, এমন কি অগ্নিপরীক্ষার ব্যাবস্থা করেও তার চাতুরিতে ব্যর্থ হলেন। শেষে তাকে প্রহার করতে করতে দূর করে দিলেন। পূর্বজন্ম কাহিনীর শেষ করে বুদ্ধ বললেন—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীর রাজা।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অথসসদ্দার-জাতক (অর্থস্যদ্বার-জাতক)—৮৪

ভগবান বুদ্ধ একসময়ে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীনগরের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর পুত্র ছয় বছর বয়সেই প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিল। বালক একদিন পিতার নিকট গিয়ে অর্থের দ্বার অর্থাৎ পরমার্থ লাভের উপায় কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। পিতা উত্তর দিতে না পেরে পুত্রকে বললেন, "এ অতি জটিল প্রশ্ন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ নয়।" এই বলে তিনি বহু পুষ্পমালা ও গন্ধদ্রব্য নিয়ে পুত্রসহ জেতবনে গেলেন এবং বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ

প্রণাম ও বন্দনা করে তাঁর অভিপ্রায় নিবেদন করে উত্তর জানতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন, "হে ভক্ত উপাসক, এই বালক পূর্বজন্মেও আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল এবং আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম, এখন জন্মান্তর হেতু স্মরণ করতে পারছেনা"। তখন তিনি সেই অতীতকথা বলতে লাগলেন :—

প্রাচীনকালে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন অতীব ধনী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর একটা পুত্র ছয় বছর বয়সেই জ্ঞানী ও পরমার্থ বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিল। সে একদিন পিতাকে অর্থের দ্বার অর্থাৎ পরমার্থ উপায় কি জিজ্ঞাসা করল। বালকের পিতা বোধিসত্ত্ব গাথার সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, অতুলনীয় সম্পদ, স্বাস্থ্য লাভ, সর্বতা সচেষ্ট থাকা, সদাচার পালন, বয়স্কদের কথায় শ্রদ্ধাবান থাকা, শাস্ত্রচর্চায় সদা রত থাকা, ধর্মপথে চলা ও বিষয়-আশয়ে বাসনা ত্যাগ এবং অনাসক্ত থাকা—এই ছয় দ্বার পরমার্থ লাভের উপায়। সেই থেকে বালক উক্ত ষড়বিধ ধর্মাচরণ করত। বোধিসত্ত্ব ও দানাদি পুণ্যকাজ করে কর্মানুরূপ গতি লাভ করেছিলেন। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'সেই জন্মে আমি ছিলাম বারাণসীর শ্রেষ্ঠী আর এই বালক ছিল শ্রেষ্ঠীপুত্র।'

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অননুসোচিয় জাতক (অননুশোচনীয়)—৩২৮

এক সময় তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করেছিলেন। তখন এক বিপত্নীক জমিদার স্ত্রীবিয়োগের পর এত শোকাভিভূত হয়েছিলেন যে স্নানাহার ত্যাগ করলেন, কাজকর্ম ছেড়ে দিলেন এবং শ্মশানে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের সম্ভাবনা ছিল। একদিন প্রত্যূষে বুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে ত্রিলোক (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল) অবলোকন করতে করতে ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে ভাবলেন, 'আমি ছাড়া, আর কেউই একে শোকমুক্ত করে স্রোতাপত্তিমার্গ দান করতে পারবে না।' এই স্থির করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এক শ্রমন সঙ্গে নিয়ে সেই ব্যক্তির গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। ভূস্বামী তাঁকে মহাসমাদরে অভ্যর্তনা করে এবং প্রণাম করে একান্তে আসন গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ বললেন, "উপাসক, তুমি নীরব রয়েছ কেন?"—"ভদন্ত আমার ভার্য্যার মৃত্যু হয়েছে, সেই শোকেই আমি বিচলিত হয়েছি যে অন্য চিন্তা করতে পারছি না।"—"দেখ উপাসক, যা ভঙ্গুর তা ভাঙ্গবেই, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ও পত্নীর মৃত্যুর পর এই জন্য দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্বশাস্ত্রের শিক্ষালাভ করে মাতাপিতার নিকট ফিরে এসেছিলেন। তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ তিনি একটি সোনার প্রতিমা গড়িয়ে বললেন, "যদি এইরূপ কুমারী পাই তাহলে বিবাহ করব।"

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সোনার প্রতিমা যানে তুলে দিয়ে লোকজন সঙ্গে দিয়ে অনুরূপ ব্রাহ্মণকুমারী সন্ধান করতে পাঠালেন। তখন কাশীরাজ্যের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে বিত্তশালী ব্রাহ্মণের গৃহে সস্মিতভাষিণী নামে ষোড়শী কন্যা ছিলেন। তিনি পরমাসুন্দরী, নয়নানন্দদায়িনী, অপ্সরাতুল্যা, সর্বসুলক্ষণা ও শীলবতী ছিলেন। তিনি এতদিন পরমব্রহ্মচারিণীভাবেই জীবন যাপন করছিলেন। যারা সোনার প্রতিমা নিয়ে এমন করছিল তারা কন্যার খবর পেয়ে ব্রাহ্মণের গৃহে গেল এবং সস্মিতভষিণীকে চাইল। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতাপিতা সোনার প্রতিমার বিনিময়ে বহু অনুচর সঙ্গে দিয়ে সস্মিতভাষিণীকে বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং উভয়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক বর্জন করে উভয়ে ব্রহ্মচারীর মত নির্দোষ ভাবে জীবন কাটাতে লাগলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা মারা গেলে তাঁদের শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্বক তিনি সস্মিতভাষিণীকে বললেন, "ভদ্রে, আমার সম্পত্তি আশি কোটি টাকা, তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি ও সেই পরিমাণ । তুমি সব দিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন কর, আমি প্রব্রজ্যা নেব।" সস্মিতভাষিণী বললেন, "স্বামী, আপনি প্রব্রজ্যা নিলে আমিও নেব, আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।" "তবে এস" এই বলে বোধিসত্ত্ব সমস্ত সম্পত্তি দান করে হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা দুজনেই ঋষিপ্রব্রজ্যা (সন্যাস) গ্রহণ কিরে বন্যফলমুলে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

হিমালয়ে বহুদিন থেকে তাঁরা লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য জনপদে এলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে বারাণসীর রাজোদ্যানে এসে বাস করতে লাগলেন। সেখানে নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ করে সস্মিতভাষিণী রক্তামশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে উপযুক্ত ঔষুধের অভাবে অতি দুর্বল হয়ে পড়লেন। একদিন বোধিসত্ত্ব নগরদ্বারের নিকট ধর্মশালায় ফলকে অসুস্থ পত্নীকে শুইয়ে রেখে ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করলেন। বোধিসত্ত্ব ফিরে আসার আগেই পত্নীর মৃত্যু হল এবং তাঁর অপরূপ রূপ দেখে বহু লোক মৃতদেহ ঘিরে কাঁদতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে কেবল বললেন, "যা ভঙ্গুর তা ভেঙ্গেছে, সংস্কার মাত্রই অনিত্য ; সব জীবেরই এই পরিণতি।" অত:পর তিনি প্রশান্তমনে ফলকের পাশে বসেই খাদ্য খেলেন ও মুখ ধুলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, ভদন্ত, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে ছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন "আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পাদপরিচারিকা ছিলেন।" "ভদন্ত, আমরা এঁর জন্য শোক সংবরণ করতে পারছি না অথচ আপনি কাঁদছেন না কেন?" "ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এঁকে কিছুটা আমার বলতাম ; এখন পরলোকগতা হয়েছেন ; এখন তো ইনি আমার কেউইনা ; আমি কেন কাঁদব" এই বলে বোধিসত্ত্ব চারিটি গাথায় সমস্ত লোককে অনিত্যভাব বুঝিয়ে ধর্মোপদেশ দিলেন। সমবেত লোকেরা পরিব্রাজিকার সৎকার করলেন। বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানে-নিরত হলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করে দেহান্তে ব্রহ্মালোকে গেলেন। পূর্বজন্ম বাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, তখন রাহুলমাতা ছিলেন সস্মিতভষিণী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস'।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনঙ্গন জাতক—

এটা অঙ্গুত্তর নিকায়-অট্ঠকথা উল্লিখিত (১ম. পৃ. ৭৪) আনন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধ সঙ্কিস্সতে (সংকাশ্য) যে সমস্ত জাতক বলেছিলেন তার মধ্যে একটি। এই নামে কোন কাহিনী জাতক-অথকথাবগ্ননায় পাওয়া যায় না। তবে অঙ্গুত্তরনিকায়অট্ঠকথায় উদ্ধৃত গাথাটি ঝানসোধন জাতকে (১ম. পৃ ৪৭৩) পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটা জাতকটির অন্য নাম। সমন্ত-পাসাদিকায় উল্লিখিত (১ম. পৃ. ১৫৮) অনঙ্গনবত্থু সম্ভবতঃ অনঙ্গন সুত্তকেই নির্দেশ করে।

[দ্রষ্টব্য : G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, I p 61]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনভিরতি জাতক—১৮৫

শাস্তা বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণ কুমার বেদত্রয়ে পারদর্শী হয়ে বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালককে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে তিনি বিয়ে করলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস-দাসী ও ভূসম্পত্তির চিন্তায় রাগ-দ্বেষ-মোহের বশীভূত হয়ে পড়লেন। এই কারণে তিনি মন্ত্রসমূহ সব স্মরণ করতে বা ঠিকমত আবৃত্তি করতে পারতেন না। তিনি একদিন বহু মাল্য-গন্ধ নিয়ে জেতবনে গিয়ে বুদ্ধের বন্দনা করলেন এবং প্রণাম করে একান্তে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, "কি হে ব্রাহ্মাণকুমার, তুমি কি মন্ত্রশিক্ষা দাও? মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ আছেত?" তিনি উত্তর দিলেন, "ভদন্ত মন্ত্রগুলি আগে আমার কণ্ঠস্থই ছিল ; কিন্তু যেদিন থেকেই বিয়ে করে সংসারী হয়েছি, তদবধি চিত্ত আবিল হয়েছে, আমি যথাযথ আবৃত্তি করতে পারি না।" সব শুনে বুদ্ধ বললেন, "পূর্বজন্মেও তোমার এরূপ হয়েছিল।" অনন্তর ব্রাহ্মণকুমারের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন :—

প্রাচীন কালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ধনী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে মন্ত্র শিক্ষা করেন এবং একজন বিখ্যাত আচার্য হয়ে বারাণসীতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালকদের মন্ত্রশিক্ষা দিতেন। এক ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের নিকট বেদত্রয় এতভালভাবে শিক্ষা করেছিলেন যে আবৃত্তি করবার সময় একটিও পদ ভুল হত না। তিনি আচার্যের সহকারী হয়ে অন্যান্য ছাত্রদের মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে এই ব্যক্তি বিয়ে করে সংসারী হলেন ; কিন্তু সংসারচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় তিনি আগের মত মন্ত্র আবৃত্তি করতে অসমর্থ হলেন।

একদিন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গেলে আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কিহে মাণবক, মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ আছে? ঠিকমত আবৃত্তি করতে পারছ ত?' ব্রাহ্মণ কুমার তাঁর অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করলেন। তখন আচার্য বললেন, "বৎস, চিত্ত সংসার চিন্তায় আবিল হলে কণ্ঠস্থ মন্ত্রও মনে রাখা যায় না আবার চিত্ত অনাবিল থাকলে কিছুতেই বিস্মরণ ঘটতে পারে না।" তারপর তিনি দুটি গাথা আবৃত্তি করে বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। অতীত কথা শেষ করে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকুমারের নিকট চতুরার্যসত্য ব্যাখ্যা করলেন যা শুনে ব্রাহ্মণকুমার স্রোতাপত্তি

ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং তারপর বুদ্ধ বললেন, "সেই জন্মে এই ব্রাহ্মণকুমার ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনভিরতি জাতক—৬৫

বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে বাস করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীবাসী এক ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ উপাসকত্ব বরণ করেছিলেন। এই ব্যক্তির এক অতি পাপরায়ণা ও দুঃশীলা স্ত্রী ছিল। ঐ ব্যক্তি একদিন স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে এবং সেই জন্য মন এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যে , সাত আট দিন বুদ্ধের নিকট যেতে পারেন নি। তারপর একদিন সে বিহারে গিয়ে বুদ্ধকে প্রণামপূর্বক আসন গ্রহণ করলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এতদিন আসোনি কেন?" সে উত্তর দিল, "ভগবান, আমার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার কথা জেনে ব্যাকুলচিত্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি।" বুদ্ধ বললেন, "উপাসক, তোমাকে পণ্ডিতেরা পূর্বেই বলেছিলেন যে স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হলেও তজ্জন্য রাগান্বিত হতে নেই ; পরন্তু চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করতে হবে। জন্মান্তর হেতু তুমি সেই উপদেশ ভুলে গেছ।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে বুদ্ধ সেই অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পাঁচশত শিষ্য তাঁর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করত। তাঁর এক ছাত্র স্ত্রীর দুঃশ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে এত বিক্ষুব্ধচিত্ত হয়েছিল যে কয়েকদিন আচার্য্যের কাছে যেতে পারে নি। আচার্য্য তাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'গুরুদেব, আমার স্ত্রীই এর কারণ। সে এক এক দিন দাসীর মত বিনীতা হয়, আবার এক এক দিন মুখরা ও প্রচণ্ডা হয়ে তর্জন গর্জন করে। তার প্রকৃতি বুঝতে অসমর্থ হয়ে এত বিচলিত হয়ে আপনার পাদপদ্ম দর্শনেও অবহেলা করেছি।" আচার্য্য বললেন, "বৎস, নারীগণ সাধারণ ধন এবং তারা স্বাভাবতঃ দুঃশীলা। এই জন্য পণ্ডিতেরা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন না।" আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দিলেন। তদবধি স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তিনি উদাসীন রইলেন ; তার ভার্য্যা ও, 'আচার্য্য আমার দুষ্কর্ম জানতে পেরেছেন' এই পাপকর্ম থেকে বিরত হলেন। এই বলে বুদ্ধ পূর্বজন্ম কাহিনী শেষ করলেন। সেই উপাসকের স্ত্রীও 'বুদ্ধ আমার দুষ্কর্ম জানতে পেরেছেন' এই ভেবে পাপকার্য্য ত্যাগ করলেন। অনন্তর বুদ্ধ বললেন, তখন এই উপাসক দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনোত্তপ্প

অনোত্তপ্প অকুশল চেতসিকের একটি বিশেষ কুচেতনা। হঠকারী সমস্ত অপকর্মের মূল হচ্ছে অনোত্তপ্প। অনোত্তপ্প ব্যতীত মানসিক চেতনায় কোনরূপ কুচিন্তার উৎপত্তি হতে পারে না। সেজন্য অনোত্তপ্পকে সব অকুশল সাধারণ চেতসিক বলা হয়। যা সব সময় অহিরিক, উদ্ধচ্চ, মোহ প্রভৃতি অকুশল চেতসিকের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হয়। পতঙ্গ যেমন পুড়ে মরবে জেনেও আগুনের শিখার দিকে ধেয়ে যায় ঠিক একইভাবে একজন হঠকারী ব্যক্তি জেনেশুনে নিজেকে মুক্তভাবে সমস্ত পাপকর্মে নিযুক্ত করে।

Malalssekera, G.P. ; ed.,

[দ্রষ্টব্য : Encylopaedia oF Buddhism, Vol. I, Fascicle, 1, pp. 221-2 ; Brahmachari, S. An introduction to Abhidhamma, pp. 54-5]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অন্তজাতক—২৯৫

এক সময় শাস্তা বুদ্ধ জেতবনে বাস করছিলেন। সেই সময় দেবদত্তের উপার্জন কমে যাওয়াতে তাঁর বন্ধু কোকালিক লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাঁর এইরূপে গুণকীর্তন করতেন, "দেবদত্ত উচ্চ বংশজাত ইক্ষাকুকুলের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। তিনি ত্রিপিটক বিশারদ, ধ্যানশীল, ধর্মকথক ও মধুরভাষী। অতএব তোমরা তাঁকে অকাতরে দান কর।" এদিকে দেবদত্তও বলতেন, "কোকালিক উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জাত হয়ে সন্যাসী হয়েছেন। তিনি বহু শাস্ত্র বিশারদ ও উত্তম ধর্মপ্রচারক। সুতরাং দান দ্বারা তাঁর সম্মান কর।" তারা উভয়ে এভাবে পরস্পরের গুণকীর্তনপূর্বক গৃহে গৃহে ভোজন করতে লাগলেন। একদিন ভিক্ষুরা জেতবন বিহারে ধর্মসভায় এঁদের দুজনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সময় বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচ্যমান বিষয় জানতে পেরে বললেন, "এই দুজনে যে কেবল এজন্মে পরস্পরের অলীক গুণকীর্তন করে ভোজন নির্বাহ করছে তা নয়, পূর্বজন্মে ও এরূপ করেছিল" এই বলে তিনি অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামের নিকট এরণ্ডক বৃক্ষ দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন একটি গরু মারা গেলে লোকেরা মৃতদেহটা টেনে এরণ্ডবনে ফেলে দিল। তখন এক শৃগাল গিয়ে তার মাংস খেতে আরম্ভ করল। পরে একটা কাক এসে এরণ্ডশাখায় বসল এবং শৃগালকে দেখতে পেয়ে মাংস খাওয়ার আশায় তার স্তুতি গাইতে লাগল "হে পশুরাজ, আপনি মহাবীর, এই দাস আপনার প্রসাদ পাবার প্রত্যাশায় এখানে এসেছি, আপনি আমার সাধ পূর্ণ করুন।" এই স্তুতি শুনে শৃগাল দ্বিতীয় গাথায় বলল, "হে ময়ূরগ্রীব বায়সপুঙ্গব, তোমার ভদ্রবংশে জন্ম বলেই ভদ্রের মহিমা কীর্তন করছ, এসো, আমার সঙ্গে যথেচ্ছ মাংস খাও।" পশুর অধম ধূর্ত শৃগাল, পাখীর অধম কাক আর বৃক্ষের অধম এরণ্ড, এক জায়গায় তিন অধমের মিলন হয়েছে। এই অতীত কাহিনী শেষ করে

বুদ্ধ বললেন, "তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল, কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অপন্নক জাতক—১

তথাগত বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন একদিন উপাসক শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ (পালি অনাথপিণ্ডিক) অন্যান্য গুরুর শিষ্য তাঁর পাঁচশতসহ মাল্যগন্ধ ও বস্ত্রাদি নিয়ে জেতবনবিহারে গেলেন এবং প্রণাম পূর্বক উপহারাদি অর্পণ করে একান্তে বসলেন এবং বিস্ফারিতনেত্রে ভগবানের অলৌকিক বিভূতি দেখতে লাগলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনে অনাথপিণ্ডিকের বন্ধুরা তাঁর শরণ নিলেন। এরপর বুদ্ধ শ্রাবস্তী ত্যাগ করে রাজগৃহে গেলেন এবং প্রস্থান করা মাত্র ঐ পাঁচশত ব্যক্তি বৌদ্ধশরণ ত্যাগ করে স্ব স্ব পূর্বশরণ গ্রহণ করলেন। সাত আট মাস পরে বুদ্ধ যখন রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে ফিরে এলেন তখন অনাথপিণ্ডদ বন্ধুগণসহ আবার বুদ্ধকে অর্চনা করতে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। তখন তাঁদের বুদ্ধ ধ্যানমার্গ, আধ্যাত্মিক প্রগতি, অর্হত্বলাভ, সম্বোধি ও নির্বাণ সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ভগবান এইভাবে নানাপ্রকারে উপাসকদের উপদেশ দিয়ে বললেন, "উপাসকগণ, পূর্বকালেও লোকে অশরণের শরণ নিয়ে যক্ষ অধ্যুষিত কান্তারে বিনষ্ট হয়েছিল ; কিন্তু যাঁরা সত্যের আশ্রয় সৎপথে চলেছিলেন, তাঁরা সেই কান্তারেই স্বস্তিলাভ করেছিলেন।" তখন অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে বুদ্ধ সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হলেন এবং পাঁচশ গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই করে কখন পূর্ব দেশে কখন পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন স্থূলবুদ্ধি তরুণ বণিক ছিল ; সে কোন অবস্থায় কিরূপ উপায় অবলম্বন করতে হয় তা জানত না।

একবার বোধিসত্ত্ব অনেক মূল্যবান দ্রব্যে গাড়ি বোঝাই করে বিক্রয়ের জন্য কোন দূরদেশে যাবার সঙ্কল্প করেছেন, এ সময়ে শুনতে পেলেন, ঐ নির্বোধ বণিক ও পাঁচশ গাড়ী নিয়ে সে দেশেই যাবার আয়োজন করছে। এক সঙ্গে এক হাজার গেলে এক হাজারের বেশী লোক দু হাজার বলদের খাদ্য-পানীয়ের সমস্যা আছেই, তাছাড়া রাস্তাঘাট ভেঙ্গে নষ্ট হবার সম্ভাবনা, তাই অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন কে আগে যাবেন। সে আগে গেলে, "রাস্তা ভাল থাকবে, গাড়ি চালাবার সুবিধা হবে, গরুর ঘাস আর খাদ্য পানীয় যথেষ্ট পাওয়া যাবে এবং জিনিষ ক্রয়বিক্রয়ের বেশী সুবিধা হবে এই চিন্তা করে আগে যাওয়াই ঠিক করল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "শেষে গেলেই সুবিধা, এই বণিকের গাড়ির চাকায় অসমান পথ সমান হবে, ওর বলদগুলি পাকা ঘাস খাবে আর আমার বলদগুলি কচি পাবে ; আমরা আহারের

জন্য টাটকা ফলমূল পাব ; জলের অভাব হলে ওদের খনন কূপে জল পাব এবং ক্রয়বিক্রয়ের জন্য ওরা দ্রব্যের যে মূল্য ঠিক করে যাবে তাতে আমার সুবিধা হবে।"

অনন্তর সেই নির্বোধ বণিক পাঁচশগাড়ি বোঝাই করে যাত্রা করল। কয়েকদিন পরে লোকালয় ছেড়ে যক্ষ অধ্যুষিত ভীষণ নিরুদক কান্তারে উপস্থিত হল। এর ষাট যোজনের মধ্যে কোথাও জল নেই। বণিকের অনুচরেরা আগে থেকেই প্রকাণ্ড ভাণ্ড জলপূর্ণ করে গাড়িতে তুলেছিল। ক্রমে তারা কান্তারের মাঝখানে পৌঁছাল। তাদের মেরে মাংস খাওয়ার দুরভিসন্ধি করে যক্ষরাজ মায়াবলে এক মনোহর শকট সৃষ্টি করল। যক্ষরাজ বিত্তশালী পুরুষের বেশে বসে আছে, তার মাথায় নীল ও শ্বেত পদ্মের মালা, কেশ ও বস্ত্র জলসিক্ত ; শকটের চাকা কর্দমাক্ত যেন সে বৃষ্টিতে ভিজেছে। ধুলা এড়াবার জন্য নির্বোধ বণিক তার দলের আগে আগে যাচ্ছিল, তখন যক্ষরাজ নিজের শকট এক পাশে সরিয়ে মধুরস্বরে বলল, "মহাশয় কোথা থেকে আসছেন?" বণিক ও শকট থামিয়ে উত্তর দিল, 'আমরা বারাণসী থেকে আসছি। আপনার দেখছি সব ভিজে, পথে বৃষ্টি হয়েছে কি? এবং আপনি আসার সময় পদ্মবনশোভিত জলাশয় দেখতে পেয়েছেন কি?" যক্ষরাজ বলল, "বলেন কি মহাশয়, ঐযে কিছুদূরে বন আছে ওখানে কেবল জল তার সর্বদাই বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের শেষের গাড়ি খুব বোঝাই বলে মনে হচ্ছে, ওতে কি আছে" "ওতে জল আছে।" "জল এনে ভাল করেছেন, এতক্ষণ দরকার ছিল। আর প্রয়োজন নেই, জল ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্কা করুন" এই বলে যক্ষরাজ নিজের আস্তানায় চলে গেল। বণিক যক্ষরাজের কথায় বিশ্বাস করে সব জল ফেলে দিল , তারপর পথে চলতে আরম্ভ করল ; কিন্তু বহুদূর গিয়েও জলের লেশমাত্র দেখতে পেল না। জলের অভাবে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল, ক্রমে একেবারে নির্জীব হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে যক্ষরা অন্ধকারে ফিরে এল এবং মানুষ গরু সমস্ত মেরে তাদের মাংস খেয়ে চলে গেল।

বোধিসত্ত্ব নির্বোধ বণিকের প্রায় দেড়মাস পরে একই ভাবে পাঁচশ গাড়ি নিয়ে বারাণসী থেকে বেরুলেন এবং অনুচরদের সাবধান করে বললেন, "তোমরা কেউ আমার বিনা অনুমতিতে জল ব্যবহার করবে না বা ফুল-ফল মুখে দিও না।" পূর্ববৎ যক্ষরাজ বোধিসত্ত্বের সম্মুখীন হল। তিনি দেখেই বুঝলেন, "এ মনুষ্য নয়, যক্ষ এবং ভাবলেন "দুরাত্মা জানে না আমি কেমন বুদ্ধিমান।" যক্ষরাজ বোধিসত্ত্বের জল ফেলে দিতে বললে তিনি বললেন, "দূর হ পাপিষ্ঠ, আমরা বণিক, স্বচক্ষে জলাশয় না দেখে আমরা কখন সঞ্চিত জল ফেলে দিই না।" উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল বুঝে যক্ষরাজ চলে গেল। অনুচরেরা জল ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্কা করতে চাইলে বোধিসত্ত্ব বললেন, "এখন তোমাদের প্রকৃত কথা বলছি। যারা পরামর্শ দিল তারা সব যক্ষ ; তাদের অভিসন্ধ এই যে আমরা জলের অভাবে ক্লান্ত ও কাতর হয়ে পড়লে তারা আমাদের হত্যা করে মাংস খাবে। নির্বোধ বণিক ও তার জলের বোধ হয় এই পরিণতি ঘটেছে।" তাঁরা কিছুদূর গিয়ে গাড়িগুলি দেখতে পেলেন এবং ঐ স্থানে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটালেন।

প্রভাত হলে বোধিসত্ত্ব যাত্রার ব্যবস্থা করলেন ; বলদগুলিকে খাওয়ালেন, জীর্ণ গাড়িগুলির বদলে নির্বোধ বণিকের ভাল গাড়িগুলি নিলেন। অত:পর গন্তব্য স্থানে গিয়ে দ্বিগুণ

তিনগুণ মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে এলেন। বুদ্ধ এই অতীত কাহিনী শেষ করে বললেন, তখন দেবদত্ত ছিলেন সেই নির্বোধ বণিক ; তাঁর শিষ্যরা ছিল সেই বণিকের অনুচরগণ ; বুদ্ধশিষ্যরা ছিলেন বুদ্ধিমান বণিকের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম বুদ্ধিমান বণিক।

[দ্রষ্টব্য ঃ V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অভিণ্‌হ্‌ জাতক (অভীক্ষ্ণ জাতক)—২৭

শ্রাবস্তী নগরে দুজন বয়স্ক বুদ্ধভক্ত উপাসকের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের একজন প্রব্রজ্যা নিয়ে ভিক্ষু হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন অপরের গৃহে যেতেন। বন্ধু ও তাঁকে আহার্য দিতেন এবং আহারান্তে তাঁর সঙ্গে বিহারে এসে সারাদিন গল্প-সল্প করে সূর্যাস্তে নগরে ফিরে যেতেন। ভিক্ষু তাঁকে নগরদ্বারে পৌঁছে দিয়ে বিহারে ফিরে আসতেন। এই দুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতার কথা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রচার হল। তাঁরা একদিন জেতবন বিহারে ধর্মসভায় বসে এই কথা আলোচনা করতে লাগলেন। শাস্তা বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, পূর্ব জন্মে ও এই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল"। তারপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

প্রাচীন কালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী ছিলেন। একটি কুকুর রাজার হস্তীশালায় গিয়ে মঙ্গলহস্তীর ভোজনস্থানে যে সব খাবার অবশিষ্ট পড়ে থাকত তাই খেত ; এভাবে যেতে যেতে মঙ্গলহস্তীর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হল যে এক সঙ্গে খাবার খেতে লাগল, একজন অপরকে ছেড়ে থাকতে পারত না এবং কুকুরটা হাতীর শুঁড়ের উপর ওঠে দোল খেত।

একদিন গ্রামবাসী এক ব্যক্তি মাহুতের কাছে থেকে কিনে কুকুরটাকে নিজের গ্রামে নিয়ে গেল। সেই থেকে মঙ্গলহস্তী কুকুরকে দেখতে না পেয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। রাজা এই খবর শুনে মন্ত্রীকে বললেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়ে দেখুন তো হাতীটা এরূপ করছে কেন?" মন্ত্রী হস্তীশালায় গিয়ে দেখলেন হাতীর শরীরে কোন রোগ নেই অথচ অতি বিমর্ষভাবে আছে। তখন তিনি ভাবলেন, "বোধ হয় কারো সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে, তাকে দেখতে না পেয়ে শোকে অভিভূত হয়েছে।" তখন তিনি মাহুতের কাছ থেকে কুকুরের সঙ্গে হাতীর বন্ধুত্বের কথা এবং কুকুরের দেখা না পেয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করার কথা জানতে পারলেন। তিনি গিয়ে রাজাকে সমস্ত জানালেন। সব শুনে রাজা বললেন, "পণ্ডিতবর, এখন তবে কর্তব্য কি?" মন্ত্রী অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব বললেন মহারাজ, ভেরী বাজিয়ে এই ঘোষণা করে দিন, আমাদের মঙ্গলহস্তীর সঙ্গে একটি কুকুরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে কোন ব্যক্তি সেই কুকুরটাকে নিয়ে গ্রামে চলে গিয়েছে। অতএব যার ঘরে ঐ কুকুর পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে।" রাজা তাই করলেন, সেই লোকটা কুকুর নিয়ে গিয়েছে সে এই ঘোষণা শুনে তখনই ওটাকে ছেড়ে দিল ; কুকুরও ছুটে গিয়ে হাতীর কাছে উপস্থিত হল। হাতী তাকে দেখামাত্র শুঁড়ে তুলে মাথায় রাখল, আনন্দে অশ্রুবিসর্জন ও ডাক ছাড়তে লাগল ; আবার মাথা থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখল এবং ওর আহার শেষ হলে নিজে আহার করল।

রাজা দেখলেন বোধিসত্ত্ব ইতর প্রাণীদের পর্যন্ত মনের ভাব বুঝতে পারেন। সুতরাং তিনি তাঁকে খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'এই উপাসক ছিল সেই জন্মে ঐ কুকুর ; এই বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিল সেই হাতী এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের বিজ্ঞ মন্ত্রী'।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অম্ব জাতক (আম্র জাতক)—১২৪

শ্রাবস্তীতে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করতেন। তিনি আচার্য বা উপাধ্যায়দের সেবা শুশ্রূষায় পানভোজনে, উপোসথাগারে বা স্নানাগারে সমস্ত কার্যে কর্তব্য সম্পাদনে নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম করতেন না। তিনি বিহার, ভিক্ষুদের ঘর, চংক্রমণস্থান, বিহারের পথঘাট ঝাঁট দিতেন এবং পিপাসার্তদের জল দান করতেন। তাঁর নিষ্ঠাপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে লোকে প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর খাদ্য দান করত। একদিন জেতবনবিহারে ভিক্ষুগণ সমবেত হয়ে এই ভিক্ষুর সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, "অমুক ভিক্ষুর নিষ্ঠাবলে আমাদের কত লাভ ও সুনাম হয়েছে ; তাঁর একার গুণে আমরা বহুজনে পরমসুখে আছি"। এই সময় শাস্তা বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচ্য বিষয় জানতে পেরে বললেন, "এই ভিক্ষু শুধু এজন্মে নয়, পূর্বজন্মে ও নিষ্ঠাবলে পাঁচশত ঋষির আহার্যের বন্দোবস্ত করেছিলেন।" তারপর তিনি পূর্বজন্ম কাহিনী বলতে লাগলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্তির পর সন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশত ঋষি পরিবৃত হলেন ; সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে গেল ; পানীয় জলের অভাবে পশুপাখিরা খুব কষ্ট পেতে লাগল। এদের পিপাসাযন্ত্রণা দেখে বিগলিত হৃদয় এক তাপস একটা কাঠের পাত্র তৈয়ারী করে জলপূর্ণ করে তাদের পান করতে দিলেন। ক্রমে এত প্রাণী জলপান করতে আসতে লাগল যে তাপস নিজের জন্য ফলামূলাদি সংগ্রহ করবার সময় পেতেন না, তবুও অনাহারে থেকেই তাদের জল যোগাতে লাগলেন। তাই দেখে পশুগণ চিন্তা করতে লাগল, এই মাহাত্মা আমাদের জল দেবার জন্য নিজে অনাহারে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এস, আমরা এক ব্যবস্থা করি, আজ থেকে আমরা জলপান করতে আসবার সময় এর জন্য প্রত্যেকে যথাসাধ্য ফল আনব।" এর পর পশুপাখিরা প্রতিদিন আম, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি এত ফল তপস্বীর জন্য আনতে লাগল যে পাঁচশত ঋষিও তা খেয়ে শেষ করতে পারতেন না, উদ্বৃত্তগুলি ফেলে দিতে হত। এ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, "সৎকর্মের কি আশ্চর্য ফল। এক ব্যক্তির ব্রতের ফলে এতগুলি তপস্বীকে আর ফলমূল সংগ্রহ করতে যেতে হয় না, আশ্রমে থেকেই তারা পর্যাপ্ত আহার পাচ্ছেন? সৎকর্মের অনুষ্ঠানে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।" এই বলে একটি গাথা আবৃত্তি করে সকলকে উপদেশ দান করলেন।

এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন এই ভিক্ষু ছিলেন সেই নিষ্ঠাবান তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাদের গুরু।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অম্বচোর জাতক (আম্রচোর জাতক)—৩৪৪

শাস্তা বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে জেতবনের এক প্রান্তে আমবনে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতেন। আম গাছ থেকে যেগুলি ফল পড়ত তিনি সেগুলি নিজে খেতেন এবং নিজের আত্মীয়স্বজনকে দিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বেরুলে কয়েকজন আমচোর আম পেড়ে কতক খেল, অবশিষ্ট নিয়ে গেল। এই সময় চার জন শ্রেষ্ঠীকন্যা অচিরতী নদীতে স্নান করে বেড়াতে বেড়াতে সেই আমবনে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ ভিক্ষু ফিরে এসে এদের দেখতে পান এবং 'তোমরাই আমার আম খেয়েছ' বলে চিল্লাচিল্লি করেন। শ্রেষ্ঠিকন্যাগণ বলল, "ভদন্ত, আমরা এইমাত্র এসেছি, আমরা আপনার আম খাইনি।" "তবে শপথ করে বল যে খাওনি"। "ভদন্ত, শপথ করছি" বলে তারা শপথ করল। স্থবির এইভাবে তাদের শপথ করিয়ে ও লজ্জা দিয়ে ছেড়ে দেন।

তাঁর এই কীর্ত্তির কথা শুনে ভিক্ষুগণ একদিন জেতবনে ধর্মসভায় বলাবলি করতে লাগবেন, 'দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু নাকি শ্রেষ্ঠীকণ্যাদের শপথ করিয়ে ও লজ্জা দিয়ে আমবন থেকে ছেড়ে দিয়েছেন।" এই সময় বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচ্য মান বিষয় জানতে পেরে বললেন, "এই ব্যক্তি পূর্বজন্মে ও আম্ররক্ষক ছিল এবং শ্রেষ্ঠীকণ্যাদের শপথ করিয়ে ও লজ্জা দিয়ে ছেড়েদিল।" তারপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন :—

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন এক জটাধারী দুষ্ট তপস্বী বারাণসীর নিকটে নদীতীরে আমবনে পর্ণকুটীর নির্মাণপূর্বক বাস করত ও আম পাহারা দিত। যে সকল আম পড়ত সেগুলি নিজে খেত আর আত্মীয়স্বজনদের দিত এবং নানারূপ মিথ্যাচরণদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত।

দেবরাজ ইন্দ্র একদিন ভাবতে লাগলেন, 'সম্প্রতি মানুষ্যলোকে কে মাতাপিতার সেবা করে তাকে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে, কে দানধ্যান করে অথবা শীলপালন করে, আর কেই বা অনাচারে রত হয়েছে'? তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে উক্ত দুরাচার তপস্বীকে দেখতে পেয়ে ভাবলেন "এই ভণ্ড জটাধারী সন্ন্যাসধর্ম পালন না করে আমবন রক্ষা করে জীবন যাপন করছে। একে সমুচিত ভয় দেখাতে হবে"। অনন্তর ঐ তপস্বী ভিক্ষায় বেরুলে ইন্দ্র অলৌকিক প্রভাবে সমস্ত আম পেড়ে লুকিয়ে রাখলেন যেন চোরে সব নিয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে বারাণসী থেকে চারজন শ্রেষ্ঠীকন্যা ঐ আমবনে প্রবেশ করেছিল। তপস্বী

ফিরে এসে তাদের দেখতে পেয়ে "তোরাই আমার আম খেয়েছিস" এই বলে আটক করলেন। তারা বলল, 'ভদন্ত, আমরা এইমাত্র এসেছি, আমরা আম খাইনি"। "তবে শপথ করে বল্ , তাহলে যেতে পারবি'। তারা প্রত্যেকে পৃথক ভাবে শপথ করল। তপস্বী সন্তুষ্ট হয়ে, "তোমরা অতি উৎকৃষ্ট শপথ করেছ। সম্ভবত: অন্য লোকেই আম খেয়েছে। অতএব তোমরা এখন যেতে পার" এই বলে শ্রেষ্ঠীকন্যাদের বিদায় দিল। তখন ইন্দ্র ভীষণমূর্তি ধারণ করে দুষ্ট তপস্বীকে এমন ভয় দেখালেন যে সে পালাবার পথ পেল না। এই পূর্বজম্মকাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, তখন এই আম্ররক্ষক বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিল সেই দুষ্ট তপস্বী ; এই চারজন শ্রেষ্ঠীকন্যা ছিল সেই চারজন শ্রেষ্ঠীকন্যা, এবং আমি ছিলাম দেবরাজ ইন্দ্র।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অয়োঘর জাতক—৫১০

বুদ্ধ তথাগত জেতবন বিহারে অবস্থানকালে মহানিষক্রমণ (গৃহত্যাগ) সম্বন্ধে বলেছিলেন যে শুধু বর্তমানে নয় পূর্বজম্মেও তিনি মহানিষ্ক্রমণ করেছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন :—

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অগ্রমহিষী পূর্ণগর্ভা হয়ে একদিন প্রত্যূষে এক পুত্র প্রসব করলেন। পূর্বজম্মে তাঁর এক সতীন ছিল। সে বিদ্বেষবশত: প্রার্থনা করেছিল, "তোর গর্ভজাত সন্তানকে আমি যেন খেতে পাই।" অনন্তর সে যক্ষিণী হয়ে জম্মেছিল যখন অগ্রমহিষী পুত্র প্রসব করে। যক্ষিণী হয়ে এতকাল পরে সুযোগ পেয়ে ভীষণ রূপ ধারণ করল এবং মহিষীর চোখের সামনেই তাঁর পুত্রটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল ও কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল, তারপর মহিষীকে ভয় দেখিয়ে চলে গেল। রাজা শুনে ভাবলেন, "আমি যক্ষীর কি করতে পারি" এই ভেবে নীরব রইলেন। এর পর দ্বিতীয় পুত্রকেও যক্ষিণী একই ভাবে খেয়ে ফেলল।

তৃতীয়বারে বোধিসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জম্মান্তর গ্রহণ করলেন। তখন লোকজনের পরামর্শ শিশুর সুরক্ষার জন্য লোহার ঘর (অয়োঘর) তৈয়ারী করার সিদ্ধান্ত করে রাজ্যের সব কর্মকারকে নিযুক্ত করলেন। তারা নগরের মাঝখানে এক রমণীয় জায়গায় গৃহ নির্মাণ করল ; তার স্তম্ভসমূহ লৌহময়।

মহিষী পূর্ণগর্ভা হয়েছেন জেনে রাজা এই অয়োগৃহ সাজালেন এবং মহিষীকে নিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে মহিষী সুলক্ষণ যুক্ত পুত্র প্রসব করলেন। তার নাম রাখা হল অয়োঘরকুমার। বোধিসত্ত্ব অয়োগৃহে থেকে বড় হতে লাগলেন ও ক্রমে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হলেন। তারপর একদিন রাজ কুমার ষোল বৎসর বয়স্ক, শৌর্যবান ও বলিষ্ঠ হয়েছেন জেনে পুত্রকে রাজ্যদানের অভিপ্রায়ে সমস্ত সুসজ্জিত করালেন এবং আদেশ দিলেন, "আমার পুত্রকে অয়োগৃহ থেকে বাইরে আন"। মন্ত্রীরা, "যে আজ্ঞা" বলে মঙ্গলহস্তীকে অয়োগৃহে নিয়ে গেলেন

এবং কুমারকে সর্বালংকারে ভূষিত করে নগর প্রদক্ষিণ করালেন এবং বললেন, "দেব কাশীরাজ আপনার পিতা, এই নগর আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি, অদ্যই রাজকীয় ও শ্বেতচ্ছত্র লাভ করবেন।"

বোধিসত্ত্ব নগরের সৌন্দর্য্য দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, 'পিতা আমাকে এতকাল বন্ধনাগারে বাস করিয়াছেন ; এমন যে নগর তাও দেখতে দেন নি ; আমি কে দোষ করেছি?" মন্ত্রীদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তারা আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলে মন্তব্য করলেন এতে তাঁর কোন দোষ নেই। অমাত্যদের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "আমি দশমাস মাতৃগর্ভে বাস করেছি, ; তা বিষ্ঠানরকসদৃশ। ভূমিষ্ঠ হবার পর ষোল বৎসর এই বন্ধনাগারে বন্দী ছিলাম ; যক্ষিণীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু অজর ও অমর হতে পারিনি। এখন আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে নিষ্ক্রমণ (গৃহত্যাগ) দুঃসাধ্য হবে। অতএব আজই পিতার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে যাব। এইরূপ চিন্তা করতে করতে নগর প্রদক্ষিণপূর্বক রাজভবনে প্রবেশ করলেন এবং রাজাকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নেই ; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, আমাকে অনুমতি দিন।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, তুমি কি কারণে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে?" "দেব আমি দশমাস মাতৃগর্ভে ছিলাম ; উহা বিষ্ঠানরকসদৃশ ; যক্ষির ভয়ে ষোল বৎসর লৌহঘরে বন্দী ছিলাম ; উহা উৎসদনরকের মত কিন্তু আজর-অমর হতে পারিনি। কেউই মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। যতদিন পারি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধর্মচর্চা করব আমায় অনুমতি দিন।"

তারপর বোধিসত্ত্ব চব্বিশটি গাথায় পিতার নিকট ধর্ম ব্যাখ্যা করে বললেন, "মহারাজ, আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক ; আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই।" অত:পর তিনি কামপাশ ছিন্ন করে মাতাপিতাকে প্রণামপূর্বক রাজভবন থেকে নিষ্ক্রমণ করলেন। 'আমারও রাজ্যে কোন প্রয়োজন নেই' ভেবে রাজাও কুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রমণ করলেন। রাজা নিষ্ক্রান্ত হলে মহিষী, অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করে নিষ্ক্রমণ করলেন। বোধিস্বত্ত্ব সবাইকে নিয়ে হিমালয়ে গেলেন। এত সব লোকের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে পাঠিয়ে বিরাট আশ্রম নির্মাণ করালেন এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্য মজুত করালেন। এইভাবে তারা সবাই ব্রহ্মালোকপরায়ণ হয়ে সদ্‌গতি লাভ করলেন। এই পূর্বজন্মকাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "মহামায়া ও রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন সেই মহিষী ও রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন অয়োঘর পণ্ডিতের সেই সকল অনুচর এবং আমি ছিলাম অয়োঘর পণ্ডিত।'

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. IV ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৪র্থ খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অরক জাতক—১৬৯

শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে একদিন শাস্তা বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন "ভিক্ষুগণ, যারা চিত্তবিমুক্তিসহ (নিষ্কামভাবে) মৈত্রী অনুশীলন করেন, মৈত্রীর ভাবনা করেন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন, উৎসাহের সঙ্গে মৈত্রী ভাবনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রকৃষ্টরূপে

মৈত্রীর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তাঁরা এগার প্রকার ফল লাভ করেন, যথা ঃ— (১) সুখে নিদ্রিত হন ; (২) সুখে জাগ্রত হন ; (৩) দুঃস্বপ্ন দেখেন না ; (৪) মানুষের প্রিয় হন ; (৫) অমানুষদের প্রিয় হন ; (৬) দেবতারা তাঁদের রক্ষা করেন ; (৭) অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাঁদের কোন অনিষ্ট করে না ; (৮) সহসা তাঁদের চিত্ত সমাধিস্থ হয় ; (৯) তাঁদের মুখের চেহারা সর্বদা প্রসন্ন থাকে ; (১০) সজ্ঞানে তাঁদের দেহত্যাগ হয় এবং (১১) তাঁরা অর্হত্ব বা মোক্ষ লাভ করতে না পারলেও মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এইরূপ এগার প্রকার সুফলপ্রদ মৈত্রীর মাহাত্ম্যকীর্তন ও সর্বজীবে মৈত্রী প্রদর্শন প্রত্যেক ভিক্ষুর কর্তব্য। হিতকামী, অহিতকামী নির্বিশেষে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক এই চতুর্বিধ ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থেকে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পদান করতে হবে। তা পারলে মার্গও ফললাভ না কররেও ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ও পণ্ডিতেরা সাত বছর ধরে মৈত্রী ভাবনা করে ব্রহ্মলোকে বাস করেছিলেন।" এই বলে তিনি পূর্বজন্মের কথা আরম্ভ করলেন ঃ—

অতীতকালে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সংসার-আসক্তি ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন এবং উক্ত চারপ্রকার ব্রহ্মবিহার লাভ করে অরক ঋষি নামে প্রসিদ্ধ আচার্য হয়েছিলেন। তিনি শিষ্য ঋষিদের উপদেশ দিতেন, "তোমরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করবে। যে দৃঢ়চিত্তে মৈত্রীর অনুশীলন ও অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হয়।" এই বলে তিনি শিষ্যদের দুটি গাথা আবৃত্তি করে মৈত্রীভাবনার সুফল বুঝিয়ে দিলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুন্ন রেখে ব্রহ্মলোকে বহু কল্প বাস করেছিলেন। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন ভিক্ষুরা ছিলেন সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য অরক।"

[দ্রষ্টব্য ঃ V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অরঞ্ঞ জাতক (অরণ্য জাতক)—৩৪৮

তথাগত বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে এক পরিবরে ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী কন্যা ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ তাকে বিয়ে করতে চায় নি ; তাই তার মা ভাবলেন, "কোন ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করে মেয়ের পাত্র জোটাতে হবে।" ঐ সময়ে শ্রাবস্তীবাসী এক যুবক বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা (ভিক্ষুত্ববরণ) নিয়েছিলেন বটে ভিক্ষোচিত শিক্ষাদীক্ষা ও শীলপালনে তাঁর মন ছিলনা। তিনি আলস্যে ও শীররের বেশ বিন্যাসে নিরত ছিলেন। একদিন ঐ কুমারীর মা নানাবিধ খাদ্য নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে লক্ষ্য করছিলেন কোন ভিক্ষুকে আহারের লোভ দেখিয়ে বশ করা যায় কিনা। কত ধার্মিক ও পণ্ডিত ভিক্ষু ঐ পথ দিয়ে গেলেন ; কিন্তু তিনি তাঁদের মধ্যে প্রলোভনের কোন পাত্র দেখতে পেলেন না। পরিশেষে তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যাঁর চোখ কজ্জলরঞ্জিত, কেশ সুবিন্যস্ত, হস্তে মণিবর্ণ ভিক্ষাপাত্র এবং মস্তকে মনোহর ছত্র। ভিক্ষুর বিলাসভাব দেখে তিনি ভাবলেন, "এবার শিকার মিলেছে।" তারপর তাঁকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে খুব আপ্যায়নসহকারে

খাওয়াচ্ছিলেন এবং আহার শেষে তিনি বললেন, "ভদন্ত, এখন থেকে প্রতিদিন আপনি আসবেন।" এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন তিনি কন্যাকে বললেন, "এই লোকটাকে লোভ দেখিয়ে বশ কর।" এই আদেশে পেয়ে কন্যা অলংকার পরে ও বেশ বিন্যাস করে স্ত্রীজন সুলভ কূটবিলাসে সেই ভিক্ষুকে লোভ দেখাতে লাগল। নবীন ভিক্ষু কামপরবশ হয়ে ভাবলেন 'আমি আর এখন বুদ্ধশাসনে থাকতে পারব না"। তিনি বিহারে গিয়ে পাত্রচীবর ত্যাগ করে এবং তাঁর আচার্য্য ও উপাধ্যায়কে বললেন, যে তিনি খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। বুদ্ধ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জন্য তুমি এত উৎকণ্ঠিত হয়েছে"? এক কুমারীর জন্য।" দেখ ভিক্ষু, পূর্বেও তুমি যখন অরণ্যে বাস করতে, তখন এই রমণী তোমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় হয়েছিল। তুমি আবার কেন এর জন্য উৎকণ্ঠিত হলে"? অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণপূর্বক যথাসময়ে তক্ষশিলায় সর্বশাস্ত্রে শিক্ষা সমাপান্তে গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ করেন। স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি পুত্রসহ সন্যাস গ্রহণপূর্বক হিমালয়ে অবস্থান করেন। তিনি পুত্রকে আশ্রমে রেখে বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহের জন্য বাইরে যেতেন। একদিন একদল দস্যু প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণ করে কয়েকজন লোককে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে এক কুমারী পলায়ন করে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে প্রবেশ করল এবং বোধিসত্ত্বের পুত্রকে প্রলুব্ধ করল। সে যুবকের চরিত্র নষ্ট করে তাকে বলল, "চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।" যুবক বলল, "বাবাকে আসতে দাও ; তাঁকে দেখে যাব।" "আচ্ছা, তাঁকে দেখেই যাবে।" এই বলে কুমারী আশ্রমের বাইরে গিয়ে পথের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব ফিরে সমস্ত ব্যাপার জেনে পুত্রকে উপদেশ দিলেন যে এসব লোকের সংসর্গে থাকলে বিপদ ঘটবে। শুনে পুত্র বলল, "পিতা, আপনার মত গুণবান লোক আমি কোথায় পাব? আমি আপনার নিকটেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না"। অনন্তর সে প্রতিনিবৃত্ত হল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ও তাঁর পুত্র উভয়েই অপরিসীম ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হলেন। এইপূর্বজন্ম কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন তখন এই ভিক্ষু এবং এই কুমারী ছিল সেই তাপসকুমার ও সেই কুমারী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অরিয় অট্ঠংগিক মগ্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ)

গয়ার নৈরঞ্জনা নদীরতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথে মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের (বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম, অস্সজি ও অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ) প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেন তা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রে চারি আর্যসত্য— দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বর্ণিত হয়েছে। যে কোন জাগতিক বস্তুকে এই চারিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করাই এই সত্যের মূল লক্ষ্য। মধ্যমপন্থা বা Middle

Path আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এই চারি আর্যসত্য ত্রিপিটকের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

আটটি মার্গ হল : সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প। এই আটটি মার্গকে আবার তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি ভাগ হল—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব শীল বিভাগের অন্তর্গত, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি চিত্ত বা সমাধি বিভাগের অন্তর্গত। প্রজ্ঞার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ না করে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের চিরাচরিত প্রথায় প্রথম হতে অষ্টম মার্গ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হল।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম মার্গ বা পথ হল সম্যক দৃষ্টি। বৌদ্ধ ধর্মে সম্যক দৃষ্টির একটি পৃথক অর্থ অন্তর্নিহিত আছে। এটি হল সত্যজ্ঞান উপলব্ধি অর্থাৎ এটি আত্মপরীক্ষণ এবং আত্মপর্যবেক্ষণ। এই মার্গটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই পথটির দ্বারা অন্যান্য সাতটি পথ পরিচালিত হতে পারে। সম্যক দৃষ্টিই মানুষকে সম্যক সংকল্পের পথে অগ্রসর করতে সাহায্য করে। যদি দৃষ্টিই ভ্রান্ত হয় তাহলে সম্যক সংকল্পের কল্পনা করা যাবে না। যদি দৃষ্টি সম্যক হয় তাহলে বাক্য, কর্ম, ধারণা সমস্তই সঠিক হবে। এটি মানুষকে স্মৃতির উন্নতি করতে সাহায্য করে।

যে 'বস্তুটি' যে রকম তাকে সঠিকভাবে দেখাই সম্যক দৃষ্টি। এটি আবার দুরকম হতে পারে একটি বাস্তব অপরটি অতিবাস্তব। বাস্তবটি হল জাগতিক কর্ম ও তার ফল, চারি আর্যসত্যের জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। কখন কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হয় এবং স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব স্তরে উপস্থিত হয়—তাহাই হল অতিবাস্তব সম্যক দৃষ্টি। এটি মানসিক বিশুদ্ধিকরণের উচ্চতম স্তর। সম্যক দৃষ্টির এই স্তরটি মানবকে দুঃখের হাত হতে মুক্তি দান করে। কোনও ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকৃত জীবনের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বিতীয় পথ হল সম্যক সংকল্প। সম্যক দৃষ্টির ফলই হল সম্যক সংকল্প। মানবেরই একমাত্র মননের বা চিন্তার (সংকল্পের) ক্ষমতা আছে। সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প কোনও ব্যক্তিকে মানসিক একাগ্রতার পথে অগ্রসর হতে একান্তভাবে সাহায্য করে। এই পথগুলিই মানুষকে নির্বাণ স্তরে উপনীত হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি যখন ক্রমশঃ মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা লাভ করে তখন প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হয় এবং পরিশেষে চারি আর্যসত্য লাভ করে এবং উচ্চতম সত্যে উপনীত হয়। সম্যক সংকল্প হল আত্মত্যাগ, অসৎ ইচ্ছার অনুপস্থিতি ও নিষ্ঠুরতার অনুপস্থিতি, আসক্তি বর্জন করা, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করা, সকলের প্রতি করুণা ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করা। এইসব সংকল্পই হল সম্যক সংকল্প। সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং মানুষকে সত্য জ্ঞানলাভে পরিচালিত করে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তৃতীয় পথ হল সম্যক বাক্য। সম্যক সংকল্পের উপর সম্যক বাক্য নির্ভর করে। যদি চিন্তা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয় তাহলে বাক্যও সুস্পষ্ট ও সুন্দর হবে।

এই পথটি শীল বিভাগের অন্তর্গত। নৈতিক চরিত্রের পরিশুদ্ধি না থাকলে মানসিক পরিশুদ্ধি লাভ করা যায় না। চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য পঞ্চশীল ও পাতিমোক্‌খ নির্দেশিত সংযম পালন করা উচিত। সম্যক বাক্য বলতে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হওয়া, বিদ্বেষপরায়ণ ভাষণ হতে বিরত হওয়া, কর্কশ ভাষণ হতে বিরত হওয়া ও তুচ্ছ ভাষণ হতে বিরত হওয়া। অতএব সম্যক বাক্যের দান অপরিসীম। এটি মানবের জীবনের সততাকে একান্তভাবে নির্ধারিত করে।

সম্যক কর্ম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের চতুর্থ পথ, সম্যক কর্ম হল সংযত আচরণ। এটি হল হত্যা, চুরি এবং ব্যভিচার হতে বিরত হওয়া। আচরণই মানুষের চরিত্রের একমাত্র নির্মাতা। হত্যা করা, চুরি করা ও ব্যভিচার সমাজের ক্ষতিকারক, এরূপ আচরণ কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। ডাকাত সহজেই হত্যা করতে পারে, চোর অনায়াসে চুরি করতে পারে, সংযমহীন ব্যক্তি ব্যভিচারে মননিয়োগ করতে পারে, সেজন্য আত্মসংযম একান্ত প্রয়োজন। সম্যক কর্মই আমাদের অতীত ও বর্তমান জীবনের ফল। ভাল কর্ম করলে ভাল ফল লাভ করা যায় খারাপ কর্মের খারাপ ফল অনিবার্যই।

সম্যক আজীব নৈতিকতার তৃতীয় মার্গ যেটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পঞ্চম পথ অধিকার করে আছে। সম্যক আজীব বলতে সৎভাবে জীবন ধারণ বোঝায়। বর্তমান সমাজে দরিদ্রতা মানুষের সৎজীবন যাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। তবুও বলা যায় বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে, সংযমশীল মনোভাব নিয়ে সম্যকজীবন যাপনে উদগ্রীব হওয়া উচিত। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবন বৌদ্ধধর্মের শীলের পর্যায়ভুক্ত।

সম্যক ব্যায়াম চিত্ত বিভাগের অন্তর্গত। এটি অষ্টাঙ্গিক মার্গের ষষ্ঠ পথ হিসেবে বিবেচ্য। এটি আবার সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। সম্যক চেষ্টা ব্যতীত মানসিক অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। সম্যক চেষ্টাতেই একমাত্র মানবের কুচিন্তাকে দূরীভূত করতে পারে। যে সব চিন্তা থেকে অসৎ চিন্তার উৎপত্তি হয় তাদের বিশ্লেষণ করা এবং ত্যাগ করা উচিত। দেহ নিশ্চল করে মনকে নিজের বশীভূত করা উচিত। সম্যক চেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে মনসংযম।

সম্যক স্মৃতি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তম পথ। সৎ স্মৃতিক্ষমতা মানবেরই আছে। স্মৃতি সম্যক না হলে শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রেও সম্যক স্মৃতির অবদান অনস্বীকার্য। ধ্যানের ক্ষেত্রে সম্যক স্মৃতি না থাকলে ধ্যান কখনই পরিপূর্ণ হয় না, যেমন আনাপানাসতিতে মনকে একান্ত জাগ্রতভাবে মনসংযোগ করতে হবে, এমন কি প্রতিটি নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে ও লোভ-দোষ-মোহ আমাদের মনের ভারসাম্যতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু সম্যক স্মৃতি আমাদের কুকর্ম হতে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যথার্থ জ্ঞানকে সর্বদা স্মরণে রাখাই হল সম্যক স্মৃতি। মুক্তিকামী মানুষকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে দেহ দেহই, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ই, মন মনই। আমাদের দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজও মরুৎ এই চারটি ভূতের সমন্বয়ে গঠিত। দেহ নশ্বর এটি অস্থি, মজ্জা ক্লেদ রক্ত, নাড়িভুড়ি, মলমূত্র প্রভৃতি কদর্য জিনিষের আধার। জীবদেহের পরিণতি সমাধি ক্ষেত্রে স্পষ্ট। মৃত দেহ শৃগাল, কুকুর—ও শকুনের ভক্ষ্য। এই কথা বার বার ভাবলে দেহের প্রতি আকর্ষণ চলে যায়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ এবং অষ্টম পথ হল সম্যক সমাধি। সম্যক সমাধি হল একাগ্র চিত্তে নিবিষ্ট হওয়া তাতে আধ্যাত্মিক প্রগতি হয়। এটি হল শুদ্ধ ধ্যান বা মনসংযোগ। এটি মানুষের একান্ত অন্তরের উন্নতিকরণ। মানুষ সম্যক মানসিক শক্তির উন্নতির দ্বারাই মনস্তাত্তিক ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়। ধ্যানের চারিটি স্তর—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর। প্রথম স্তরে মনে অনাসক্তি শান্তি এবং আনন্দ জাগবে। দ্বিতীয় স্তরে ধ্যানীর মনে সত্য সম্পর্কে সমস্ত সংশয় দূর হবে। তৃতীয় স্তরে ধ্যানীর মন সুখ ও আনন্দের অনুভূতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হবে। তার দেহ শান্ত হবে। চতুর্থ স্তরে ধ্যানীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ, মানসিক সমত্ব এবং সকল প্রকার অনুভূতি চলে যাবে। তিনি নিরুদ্বেগ নিস্পৃহভাবে আত্ম-সমাহিত হবেন। এই অবস্থায় প্রজ্ঞা বা পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবে। এটি হল নির্বাণস্তর। এটি হল সম্যক সমাধির রূপ ধ্যান, এইরূপ আরও পাঁচটি আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, অকিঞ্চন আয়তন, নেব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন, সংজ্ঞা বেদয়তি নিরোধ—এইগুলি অরূপ ধ্যান বা সমাপত্তি। এই স্তরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে মানসিক পরিশুদ্ধি লাভ করে। এই স্তরে মানুষ ইচ্ছা, আকাঙ্খা সমস্ত কামনা নির্বাপিত করে এবং বিমুক্তি লাভ করে। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মে সম্যক সমাধির গুরুত্ব অপরিসীম।

মহাযান সম্প্রদায়ের মতে সবই শূন্য। অতএব তাঁরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বিশ্বাস করে না। "The Mahāyānic conception of Śunyatā, i.e., that everything is non-existence," Nagarijuna says that "those who admit the reality of unconstituted things, can not logically support the Āryasatyas and the Pratityasamutpāda." আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে চিন্তার নিম্নতম স্তর হতে উচ্চতম স্তরে উপনীত হতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনের অন্ধকারে আলোকবর্ত্তিকা যার ফলে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে, নির্বান লাভ করে। মানবের জীবনে পবিত্রতা ও মুক্তির আস্বাদ দান করে। এটি সততার দূতরূপে মানবের দ্বারে উপস্থিত হয়। "It is a must for the spiritual uplift of the mind of a man"[2] and final liberation.

[দ্রষ্টব্য : 1. Aspects of Mahāyāna Buddhism and its relation to Hīnayāna, N. Dutt. Luzac & co hondon, 1930, Page, 223.
2. Facets as Early Buddhism, Bela Bhattacharya, Page, 90.
3. Early Monastic Buddhism, N. Dutt. Firma K. L. M. Calcutta, 12, 1971. Page, 139-145.]

বেলা ভট্টাচার্য

অরিয়সচ্চ (আর্যসত্য)

পালি অরিয় 'বাংলায় আর্য অর্থে বোঝায়, মূলত: শ্রেষ্ঠ সুগম্ভীর সুদুষ্করার্থে এখানে অরিয় বা আর্য শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। সাধারণত: আর্য বলতে বলা হয়ছে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র। বস্তুত বুদ্ধ এবং বুদ্ধগণই আর্য নামে অভিহিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নবগুণ সম্পন্ন সংঘকে বলা হয় আর্যসংঘ। বুদ্ধের পরিভাষায় চারি আর্যসত্যে যে সাধকের পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁকে বলা হয় আর্য। পালি সচ্চ বাংলায় সত্য অর্থে বোঝায়। যথাভূত অর্থাৎ যে যা তাই। সত্য

অর্থে অখণ্ডনীয় সত্য। আর্যসত্য বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মৌলিক ও সামগ্রিক তত্ত্ব। কারণ তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক যে সত্য তপস্যার মাধ্যমে জ্ঞানগুলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং উপলব্ধতত্ত্ব সুপনিপুনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে বলেই ইহা আর্যসত্য নামে অভিহিত।

আর্যসত্যের কথা আমরা সর্বপ্রথমে পাই বিনয় পিটকের অন্তর্গত "মহাবগ্‌গ" নামক গ্রন্থের "ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্তে"। সিদ্ধার্থ গৌতম গয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে বুদ্ধত্বলাভের পর বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট তিনি সর্বপ্রথম যে ধর্ম উপদেশ তা-ই "ধম্মচক্ক পবত্তনসুত্ত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। "বিনয়মহাবগ্‌গ" ব্যতীত পালি "সংযুক্ত নিকায়ের মহাবগ্‌গ শীর্ষক পঞ্চম খণ্ডে (সংযুক্ত নিকায় ৫খণ্ড, PTS. পৃঃ ৪২১-৪২৫) ও ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত" হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে। আবার "পটিসম্ভিদামগ্‌গের পটিসম্ভিদাকথা (পটি সম্ভিদামগ্‌গ- ২য় খণ্ড, PTS. পৃঃ ১৪৭-১৫৮) এবং ধম্মচক্ক কথাতে (পটিসম্ভিদামগ্‌গ ২য় খণ্ড, PTS. পৃঃ ১৫৯-১৬৫) "ধম্মচক্ক পবত্তন" সুত্ত হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে।

এই "ধম্মচক্ক প্রবত্তন সুত্তের" বা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রেরর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, "চারি আর্য সত্য"। কিন্তু এই চারি আর্যসত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে" পাওয়া যায় না। সর্বপ্রয়াস এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পালি মজ্‌ঝিম নিকায়ের (৩য় খণ্ড, PTS. পৃঃ ২৪৮-২৫২) "সচ্চবিভঙ্গ সুত্তে" (সুত্র নং ১৪১) এই ব্যাখ্যায় আবার হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে পটিসম্ভিদামগ্‌গের" শ্রুতময় বদান নির্দেশ (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭-৪২) আবার ইহা পালি "বিভঙ্গ প্রকরণের" (বিভঙ্গ (PTS) পৃঃ ৯৯-১২১) সচ্চবিভঙ্গের উদ্ধৃত হয়েছে এবং অভিধর্ম শৈলী অনুসারে "সুত্তন্তভাজনীয়" "অভিধম্মভাজনীয়" এবং "পাঞ্‌হাপুচ্ছক" পদ্ধতিতে আরও বিশদীকৃত হয়েছে।

"মজ্‌ঝিম নিকায়ের" "সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত" থেকে আরও একটি বিষয় অবগত হওয়া যায় যে, চারি আর্য সত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র। তবে ইহা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়াতে বুদ্ধবচনরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আর্যসত্য চার প্রকার, যথাঃ— দুঃখ আর্য সত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ, নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য। এই চারি আর্যসত্যের দুইটি বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়—(১) চারি আর্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা যদি তথ্যের দিকে বিচার করা যায়। (২) আবার যদি দুঃখমুক্তি মার্গের অনুশীলনের দিকে বিচার করা যায় তা হলেও চারি আর্যসত্য হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের শেষ কথা। অতএব তথ্য ও অনুশীলন উভয়তঃ চারি অর্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ।

(১) দুঃখ আর্য সত্য ঃ— বুদ্ধ বলেছেন—জাতি বা জন্ম দুঃখ জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, এবং সংক্ষেপে পঞ্চোপদান (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) এই পঞ্চস্কন্ধ উপাদান স্কন্ধই দুঃখের মূল। মহাসমুদ্রের জলের স্বাদ যেমন এক বিন্দুতে উপলব্ধ হয়, তেমনি পঞ্চস্কন্ধ দ্বারা সকল দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কারণ পঞ্চস্কন্ধের কারণে জন্ম দুঃখ থেকে একে একে সকল দুঃখকে বরণ করতে হয়। তাই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। বৌদ্ধধর্মে দুঃখের কথা যেমন বলা

হয়েছে, তেমনি দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ও দেখানো হয়েছে। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

(২) **দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য ঃ—** দুঃখ সমুদয়ের অর্থ হচ্ছে দুঃখের কারণ। দুঃখের কারণ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেছেন—তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। যে তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করায়, যে তৃষ্ণা ভোগও ভোগাসক্তি সহগত এবং যে তৃষ্ণা মুহূর্তে মুহূর্তে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সুখের অন্বেষণ করায়। মোহমুগ্ধ বা মোহান্ধ মানুষের সকল প্রকার কর্মসম্পাদনের মূলে হচ্ছে এই তৃষ্ণা। ইহাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করায়। তাই তৃষ্ণাকে বারবার পুর্নজন্মদায়ী বলা হয়েছে। ফলে প্রাণিগণ তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হয়ে দুঃখকে আলিঙ্গন করে নেয়। এই তৃষ্ণা ত্রিবিধ, যথা ঃ—কামতৃষ্ণা (রূপাদি পঞ্চকামগুণ উপভোগের জন্য যে বাসনা), ভব তৃষ্ণা (আস্তিক্য বাসনা) এবং বিভব তৃষ্ণা (নাস্তিক্য বাসনা)। সুতরাং তৃষ্ণাই সমস্ত দুঃখের মূল। তাই বুদ্ধ সারবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—"তন্হায় মূলং খনথ"—অর্থাৎ সমূল তৃষ্ণাকে উৎপাটিত কর।

(৩) **দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ঃ—** দুঃখের কারণ থাকলে দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভবব। বুদ্ধ বলেছেন—"ইমস্মিং সতি ইদংহোতি। ইমস্‌সা উপ্‌পাদা ইদং উপ্‌পজ্জতি" অর্থাৎ এটা থাকলে ওটা হয়। এটার উৎপত্তিতে ওটারও উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণা থাকলে দুঃখ হয়। তৃষ্ণার উৎপত্তিতে দুঃখের উৎপত্তি। আবার যা কিছু উৎপন্ন হয় তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধ বলেছেন—"ইমস্মিং অসতি ইদং ন হেতি। ইমস্‌স নিরোধা অয়ং নিরুজ্ঝতি"। অর্থাৎ এটা না থাকলে আর ওটা হয় না। এটার নিবৃত্তিতে অন্যটারও নিবৃত্তি হয়। অতএব বেদনা বা অনুভূতির নিবৃত্তিতে তৃষ্ণা-নিবৃত্তি। তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে উপাদান-নিবৃত্তি। উপাদানের নিবৃত্তিতে ভব-নিবৃত্তি। ভবের নিবৃত্তিতে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। পুনর্জন্মের নিবৃত্তিতে জরামরণাদি উপশান্তি হয়ে দুঃখ নিবৃত্তি হবে। এই দুঃখের নিরবশেষ নিবৃত্তিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে নির্বাণ। এই নির্বাণকেই দুঃখ নিবৃত্তি বা তৃতীয় আর্যসত্য বলা হয়েছে।

(৪) **দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য ঃ—** দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণ উপলব্ধির উপায় আছে যা স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন। এই উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই মার্গাঙ্গ সমূহকে শীল, সমাধিও প্রজ্ঞা এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্‌কর্মও সম্যক্ জীবিকা শীলের অন্তর্গত। ইহাই আর্যসত্যের প্রথম স্তর। সম্যক্ ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি সমাধির অন্তর্গত। ইহা মার্গ সত্যের দ্বিতীয় স্তর। কারণ এই তিনটি হচ্ছে মানসিক অনুশীলন। সম্যক্ দৃষ্টিও সম্যক্ সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। ইহা মার্গ সত্যের তৃতীয় সত্য। শীলের পূর্ণতা সমাধির উন্নয়ন বিধান করে এবং সমাধিই বিদর্শন প্রজ্ঞার বিধান করে। ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং এটাই দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য নামে অভিহিত।

[দ্রষ্টব্য ঃ Guide Through the Abhidhamma pitaka—Nyanotiloka. Colombo. 1958. P. 22. (The) Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy—Gobinda, Anagarika. B, Delhi, Nag

Publishers—1975. P. 65. দীর্ঘনিকায় ২য় খণ্ড, সম্পা, টি, ডব্লিউ, রিস, ডেভিড্স, পি, টি, এস, লণ্ডন, ১৯৭৪, পৃঃ ৩১১। মজ্ঝিম নিকায়—৩য় খণ্ড ; অনু ; ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলি-১৯৯৩, পৃঃ ১৮৯-১৯১। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধিবুক এজেন্সী, কলিকাতা-১৯৯৭, পৃঃ ১৫-৪১]।

জিনবোধি ভিক্ষু

অলম্বুসা জাতক (অলম্বুষা জাতক)—৫২৩

তথাগত বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক নির্বাণলাভের জন্য স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর গত হলেও স্ত্রীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি যখন ভিক্ষার জন্য নিজের গৃহদ্বারে উপস্থিত হতেন, তখন স্ত্রী খুব সমাদর করে ভোজন করাতেন। একদিন স্ত্রী বললেন, "প্রভু, এভাবে ত থাকা যায় না, আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যাব।" ভিক্ষু বললেন, "তুমি যেওনা। আমি চীবর ফেরত দিয়ে আবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসব।" এই বলে ভিক্ষু বিহারে গেলেন। তথাগত জানতে পেরে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি উৎকণ্ঠিত হয়েছ নাকি?" "ভিক্ষু উত্তর দিলেন, হাঁ ভদন্ত"। "কে তোমাকে উৎকণ্ঠিত করল?" "আমার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নী।" "দেখ ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী ; এর জন্য তুমি ধ্যানভ্রষ্ট হয়ে তিন বৎসর মূঢ় ও বিসংজ্ঞ হয়ে পড়েছিলে।" অনন্তর বুদ্ধ সেই পূর্বজন্ম কথা আরম্ভ করলেন ঃ—

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক অরণ্যে ফলমূল আহার করে থাকতেন। তাঁর প্রস্রাবস্থানে একটা মৃগী বীর্য্যমিশ্রিত তৃণভক্ষণ ও জলপান করে গর্ভধারণ করল এবং কালক্রমে সে একটা মানবসন্তান প্রসব করল। বোধিসত্ত্ব পুত্রস্নেহ পরায়ণ হয়ে শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। শিশুটির নাম রাখা হল ঋষ্যশৃঙ্গ। বড় হলে তাঁকে বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা দিলেন এবং একদিন তাকে নিয়ে নারীবনে গমনপূর্বক বললেন, " বৎস, এই হিমালয়ে বহু সুন্দরী রমণী বিচরণ করে। তারা পুরুষকে বশীভূত করে তাদের সর্বনাশ করে ; সুতরাং সাবধান থাকা উচিত" পুত্রকে এই উপদেশ দিয়ে তিনি ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ কঠোরতপা হয়ে সর্ববিধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করলেন এবং ধ্যানসুখে মগ্ন হয়ে হিমালয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর শীলতেজে স্বর্গের শক্রভবন (ইন্দ্রভবন) কম্পিত হল। ইন্দ্র এর কারণ চিন্তা করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন এবং ভাবলেন, "এই ঋষি হয়ত আমাকে ইন্দ্রত্ব থেকে বিচ্যুত করবে ; অতএব একজন অপসরা পাঠিয়ে একে শীলভ্রষ্ট করতে হবে।' তিনি সমস্ত দেবলোক পর্য্যবেক্ষণ করে অলম্বুষা ব্যতীত আর কাউকে এই কাজের উপযুক্ত দেখতে পেলেন না। কাজেই তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের শীলভঙ্গ করতে অলম্বুষাকে আদেশ দিলেন।

অত:পর অপসরা অলম্বুষা তার দিব্য দেহ নানা আভরণে সাজিয়ে প্রাত:কালে যখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ঝাঁট দিচ্ছেন তখন সেখানে দেখা দিল, তখন তাপস অলম্বুষার আপাদমস্তক

রূপ বর্ণনা করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভাতে পূর্বাকাশে শুকতারার মত তড়িৎশক্তি ওখানে দাঁড়িয়ে কে তুমি? তোমার হাতে শোভা পায় বিচিত্র আভরণ আর কানে দুলছে মণিময় কুণ্ডল। তোমার গায়ের বর্ণ সূর্যের মত উজ্জ্বল, সারা শরীর থেকে হরিচন্দনের গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তোমার সুন্দর উরুদ্বয় সুবর্তুল, সুন্দর দেহকান্তি, কি মোহিনী তার শক্তি ও পবিত্র রূপ ; কটি ক্ষীণ আর চরণযুগল সুগঠিত ; তোমার মনোহরগতি মরালের মত—সেটা আমার মনকে মুগ্ধ করেছে। তোমার নিতম্বদেশ বিশাল ; নাভি কত সুন্দর ; তোমার বুকে পীনোন্নত পয়োধরদ্বয় বৃন্তহীন দ্বিধাভিন্ন অলাবুর মত ; মরালীর মত গ্রীবা আর অধরৌষ্ঠ পক্ব দড়িম্বের মত সুলোহিত ; দন্তরাজি মুক্তার সারির মত এবং বাহুদ্বয় সুডৌল। গুঞ্জফল সদৃশ তোমার আয়তনয়ন এবং চন্দন গন্ধিকা কেশরাশি মাথায় শোভা পায়। এই পৃথিবীতে তুমি অতুলনীয়া। অয়ি বরাননে, পরিচয় দাও কে তুমি?" ঋষ্যশৃঙ্গের দীর্ঘ বর্ণনা শেষে অলম্বুষা বুঝতে পারল মুনি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। সে বলল, "হে কাশ্যপ, আমার পরিচয় নেবার এটা সময় নয় ; এস আমরা এই আশ্রমে রতিসুখ ভোগ করি। এস প্রিয়, আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নানাবিধ রতিসুখ আস্বাদন করি।" তারপর স্ত্রীসুলভ মায়ায় নিপুণা অলম্বুষা চলে যাবার ভান করে তপস্বীর হৃদয় কম্পিত করে যে পথে এসেছিল সেই দিকে মুখ ফেরাল। তাকে যেতে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গ দ্রুতবেগে তার অনুসরণ করে কেশ আকর্ষণ করলেন। তখন অলম্বুষা ফিরে ঋষ্যশৃঙ্গকে গাঢ় আলিঙ্গন করল, তাতে মুনির ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল ও প্রভুর উদ্দেশ্য সাধন করে অপ্সরার মন পরিতুষ্ট হল। সেই অবস্থায় সে ইন্দ্রকে দিয়ে সুসজ্জিত সুকোমল শয্যা অলৌকিকভাবে আশ্রমে আনাল এবং মুনিকে বক্ষে ধারণপূর্বক সুন্দরী তাতে শয়ন করল। এই সুখশয়নে মুহূর্তের মত তিনটি বৎসর কেটে গেল। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ সম্বিৎ ফিরে পেল ; তিনি আবার আগের মত আশ্রমের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করলেন ; তিনি দেখলেন শ্যামতরুগণ, তাঁর অগ্নিশালা আর শুনলেন নবপল্লবিত পুষ্পিত কাননে সুধা বর্ষণ করছে। চারদিক নিরীক্ষা করে তাঁর মনে অনুশোচনা জাগল, করলেন বিলাপ, "হায়, এতকাল আমি তপস্যা করিনি, আহুতি দিই নি ও মন্ত্র জপ করিনি ; আমি একাকী বনে বাস করি, কে আমার সর্বনাশ করল?"

ঋষির পরিদেবন শুনে অলম্বুষা ভাবল, "আমি যদি প্রকৃত বৃত্তান্ত না বলি, তাহলে ইনি আমাকে অভিশাপ দেবেন। ভাগ্যে যাই থাকুক আমি এঁকে সব কথা খুলে বলি।" অনন্তর সে ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ও তাকে পাঠাবার কথা বলল। অলম্বুষার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার উপদেশের কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, "হায়, পিতার উপদেশ লঙ্ঘন করেছি বলে আমার এই সর্বনাশ হয়েছে। ইনি কামরাগ ত্যাগ পূর্বক পুনর্বার ধ্যানবল লাভ করেছেন বুঝে অলম্বুষা ভয়ে কাঁপতে লাগল। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তুমি যেখানে অভিরুচি প্রস্থান কর।" অলম্বুষা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করে সুবর্ণ পালঙ্কে আরোহণ পূর্বক দেবলোকে চলে গেল, এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'তখন এই ভিক্ষুর গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী ছিল অলম্বুষা ; এই ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ আর আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা যিনি মহর্ষি।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with Commentary, Vol. V ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৫ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অলীনচিত্ত জাতক—১৫৬

তথাগত বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তী নগরের এক যুবক বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে ভিক্ষু হয়েছিলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের অনুগত ছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। পাঁচ বৎসর অরণ্যে ধ্যানের অভিপ্রায়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁর ভিক্ষু জনোচিত আচরণ দেখে সন্তুষ্ট হন। তিনি পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন ; গ্রামবাসীরা তাঁর সেবা করতেন। তিনি একাদিক্রমে তিন মাস কর্মস্থান ভাবনা করে ধ্যানবল লাভের জন্য কত উদ্যোগ, কত চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। সুতরাং আর অরণ্যে থাকা নিরর্থ জেনে জেতবনে বুদ্ধসান্নিধ্যে চলে এলেন। তথাগত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই নিরুৎসাহ হয়েছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবান" বুদ্ধ বললেন, "সে কি কথা! তুমিই না পূর্বজন্মে নিজ বীর্য্যবলে বারযোজন বিস্তৃত বারাণসীরাজ্য রক্ষা করে রাজকুমার দান করেছিলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। তখন বারাণসীর নিকটে একটি গ্রাম ছিল। যেখানে পাঁচশ ছুতোর বাস করত। তারা নৌকোয় করে নদীর উজানে যেত ; তারপর জঙ্গলে গাছ কেটে কাঠ চেরাই করত এবং গৃহ নির্মাণের উপযোগী তক্তা নদীতীরে নিয়ে গিয়ে নৌকো বোঝাই করে অনুকূল স্রোতের সাহায্যে নগরে নিয়ে আসত। সেখানে লোকের গৃহনির্মাণ করে জীবিকা অর্জন করত। একবার ছুতাররা বনমধ্যে কাঠ কাটবার সময় একটা হাতির পায়ের তলায় খয়ের কাঠের টুকরো বিদ্ধ হয়েছিল। ক্রমে পা ফুলে উঠল, পুঁজ জমে যন্ত্রণা হতে লাগল। কাঠ কাটার শব্দ শুনে সাহায্যের জন্য তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুতারদের কাছে উপস্থিত হল। তখন তারা ধারাল অস্ত্র দ্বারা কাঠের কুচি বার করে, পুঁজ মুছে ওষুধ লাগিয়ে দিল এবং ক্রমে ঘা শুকিয়ে গেল। আরোগ্য লাভের পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হাতী ছুতারদের কাটা কাঠ টেনে নদীতে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে লাগল এবং ছুতারাও খাওয়ার সময় প্রত্যেকে এক একটা খাবারের পিণ্ড দিত।

এই হাতীর সাদা এবং আজানেয় (উৎকৃষ্টজাত) এক পুত্র ছিল। একদিন সে চিন্তা করল, 'আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, এখন থেকে আমার পুত্রই ছুতারদের সহায়তা করুক" এই ভেবে বন থেকে পুত্রকে নিয়ে এসে তাদের বলল, "এটি আমার পুত্র, আপনারা আমার উপকার করেছেন, একে আপনাদের দান করলাম।" এই বলে সে বনে চলে গেল। সেদিন থেকে হস্তিপুত্র পিতার ন্যায় ছুতারদের অনুগত হয়ে কাজ করতে লাগল। দিনের শেষে সে নদীতে গিয়ে জলকেলি করত এবং তাতে ছুতারদের ছেলেমেয়েরা যোগদান করত। হস্তিপুত্র সৎকুলজাত বলে মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হলে জল থেকে উঠে আসত। একদিন নদীর উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং উক্ত হস্তীর এক খণ্ড শুষ্কমল বৃষ্টি জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ল এবং ভাসতে ভাসতে বারাণসীর ঘাটে গিয়ে এক গুল্মে আটকে রইল। ঐ সময়ে রাজার হস্তিপালেরা স্নান করাবার পাঁচশত হস্তী এনেছিল কিন্তু তারা আজানের হস্তীর মলগন্ধ পেয়ে ভয়ে নদীতে নামলই না উপরন্তু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন আরম্ভ করল। তখন গজাচার্য্যরা অনুসন্ধান করে সেই মলখণ্ড খুঁজে পেল এবং জলে গুলে হাতীদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন,

তখন তারা শান্ত হল। গজাচার্য্যরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই আজানের হস্তীটাকে আনিয়ে আপনার কাজে লাগালে ভাল হয়।" তখন রাজা ছুতারদের কাছে গিয়ে হস্তীটা চাইলেন। ছুতাররা রাজাকে দিল বটে কিন্তু সে রাজার সঙ্গে যেতে সম্মত হল না। রাজা যখন হস্তীর সাহায্যের মূল্যস্বরূপ ছুতারদের কয়েক লক্ষ মুদ্রা এবং পরিবারসহ প্রত্যেককে এক জোড়া কাপড় দিলেন ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করলেন, তখন রাজার সঙ্গে গেল। রাজা বারাণসীতে পৌঁছে হস্তীটাকে সর্বালংকার ও বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত করে জাঁক-জমকসহকারে হস্তীশালায় প্রবেশ করালেন এবং প্রধান বাহনের পদে নিযুক্ত করে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। আজানেয় হস্তী আসায় তিনি সমগ্র জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করলেন।

এর কিছুদিন পর বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করলেন কিন্তু মহিষীর প্রসবের সময় হলে রাজা মারা গেলেন। রাজার মৃত্যু সংবাদ পেলে মঙ্গলহস্তীর হৃদয় বিদীর্ণ হবে এই আশংকায় তার কাছে এই ঘটনা গোপন রাখলেন। এদিকে রাজার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কোশলরাজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বারাণসী আক্রমণ করলেন। অধিবাসীরা নগরদ্বার রুদ্ধ করে বলে পাঠাল, "আমাদের মহিষী এখন পূর্ণ গর্ভা। তিনি যদি পুত্র সন্তান প্রসব করেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করব নতুবা বশ্যতা স্বীকার করব, আপনি সাত দিন অপেক্ষা করুণ।" সাত দিন পরে মহিষীর পুত্র হল ; তাঁর নাম রাখা হল অলীনচিত্ত। এবার নগরবাসীরা কোশলরাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু অধিনায়কের অভাবে পরাজয় ঘটতে লাগল। তখন অমাত্যপরিবৃত্ত হয়ে কুমারকে নিয়ে মহিষী হস্তিশালায় গেলেন বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পাদমূলে রেখে বললেন, "প্রভু, আপনার বন্ধু মারা গিয়েছেন এই শিশু তার ছেলে। কোশলরাজ বারাণসী আক্রমণ করেছে। এখন আপনি বন্ধুপুত্র এবং রাজ্য রক্ষা করুন। মঙ্গলহস্তী, "এখনই কোশলরাজকে ধরে আনছি" বলে বৃংহন করতে করতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। তারপর সে শিবির ভেদ করে কোশল পতির কেশ ধরে নিয়ে এসে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে রাখল ও সাবধান ও সতর্কবাণী দিয়ে ছেড়ে দিল। অতঃপর সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য বোধিসত্ত্বের হস্তগত হল। আর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু কেউ রইল না। তখন তাঁর নাম হল "অলীনচিত্তরাগ।" তিনি যথাধর্ম রাজ্যপালন করে জীবনাবসানে স্বর্গলোকে গেলেন। এই পূর্বজন্ম কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন মহামায়া ছিলেন অলীনচিত্তকুমারের জননী, শুদ্ধোদন ছিলেন তার জনক, এই ভিক্ষু ছিল সেই মঙ্গলহস্তী, সারিপুত্র ছিলেন সেই হস্তীর জনক আমি ছিলাম অলীনচিত্ত কুমার'।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with Commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অবারিয় জাতক (অবার্য্য জাতক)—৩৭৬

তথাগত বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন অচিরবতী নদীর খেয়াঘাটে একজন পাটনি ছিল ; তার স্বভাব অতি উগ্র ও রূঢ় ছিল। একদিন জনপদবাসী

এক ভিক্ষু বুদ্ধ বন্দনার জন্য সন্ধ্যাকালে খেয়াঘাটে উপস্থিত হল কিন্তু অসময় বলে অপর পারে পাটনি পৌঁছে দিতে রাজী হল না। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে শেষে রেগে গিয়ে ভিক্ষুকে নৌকোয় তুলল ; কিন্তু ঠিকভাবে না চালিয়ে কিছুদূর গিয়ে ঢেউ তুলে ভিক্ষুর চীবর ভিজাল এবং অন্ধকারে তাঁকে ওপারে নামিয়ে দিল। ভিক্ষু সেদিন বিহারে যেতে পারলেন না। পরদিন বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রণামান্তে একান্ত উপবেশন করলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কখন এসেছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "গতকল্য"। "তবে আজ কেন বুদ্ধোপাসনা করতে এলে?" এর উত্তরে স্থবির পূর্বদিনের বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। শুনে বুদ্ধ বললেন, "এই ব্যক্তি কেবল এই জন্মে নয় পূর্বেও রূঢ় ছিল এবং পণ্ডিতদের কষ্ট দিয়েছে।" অনন্তর ভিক্ষুর প্রার্থনায় সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্বশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পরে সন্ন্যাস নিয়ে দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাস করেন। অতঃপর লবণ ও অম্ল খাওয়ার জন্য বারাণসীতে এসে রাজোদ্যানে অবস্থান করেন। পরদিন ভিক্ষার্থে রাজাঙ্গনে প্রবেশ করলে রাজা তাঁকে দেখে প্রীত হলেন এবং ভোজন করিয়ে রাজোদ্যানে থাকবার অঙ্গীকার আদায় করলেন। বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিলেন, "মহারাজ, রাজাদের যথাধর্ম প্রজাপালন করতে হয় ; তাঁরা অতিলোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়—এই অগতিচতুষ্টয় ত্যাগ করে অপ্রমত্তভাবে ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করবেন।" এইভাবে প্রতিদিন তিনি উপদেশ দিতেন। রাজা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে লক্ষমুদ্রা আয়ের একটি গ্রাম দিতে চাইলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

বোধিসত্ত্ব এইভাবে বার বৎসর বাস করবার পর একদিন জনপদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে খেয়াঘাটে উপস্থিত হলেন। সেখানকার অবার্য্যপিতানামক পাটনি বড় মূর্খ ছিল ; গুণবানদের গুণের মর্য্যাদা দিতে জানত না, নিজের ক্ষতিবৃদ্ধিও বুঝত না। যারা নদী পার হতে আসত, তাদের প্রথমে পার করে দিত, পরে পয়সা চাইত। যারা পয়সা দিত না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করত। এতে তার লাভ অল্পই হত, ভাগ্যে অনেক সময় প্রহারও জুটত। বোধিসত্ত্ব পাটনিকে বললেন, "ভদ্র, আমাকে ওপারে নিয়ে চল।" সে বলল, "শ্রমণ, আমাকে কি পয়সা দেবে?" বোধিসত্ত্ব বললেন, "আমি তোমায় ভোগবৃদ্ধি, অর্থবৃদ্ধি ও ধর্মবৃদ্ধির উপায় বলে দেব।" পাটনি মনে করল শ্রমণ তাকে নিশ্চয় কিছু দেবে। সে বোধিসত্ত্বকে পার করে দিয়ে পয়সা চাইল। বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন, "কাউকে পার করে দেবার আগে পয়সা চাইবে, পরে নয়। আর কখনো কারো উপর ক্রুদ্ধ হবে না, অক্রোধী হলে অর্থ বৃদ্ধি হয়।" পাটনি বলল, "এটা তো উপদেশ ; আমাকে পয়সা দাও।" বোধিসত্ত্ব বললেন, "বাবা, এছাড়া তো আমার আর কিছু নেই।" "তবে আমার নৌকোয় চড়লে কেন?" এই বলে সে বোধিসত্ত্বকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর বসল এবং মুখে প্রহার করতে লাগল। পাটনি যখন বোধিসত্ত্বকে প্রহার করছিল, তখন তার স্ত্রী ভাত নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং তপস্বীকে দেখে বলল, "স্বামিন্, এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী এবং রাজার গুরু ; আপনি এঁকে মারবেন না।" এতে

সে আরো রেগে গিয়ে "তুই এই ভণ্ড তপস্বীকে মারতে দিবি নে" বলে উঠে দাঁড়ল এবং স্ত্রীকে প্রহার করে মাটিতে ফেলে দিল। তার হাতের ভাতের থালা পড়ে ভেঙ্গে গেল, সে পূর্ণগর্ভা ছিল, তার গর্ভপাত হল। তখন চারদিক থেকে লোকজন এসে পাটনিকে ঘিরে ফেলল এবং "নরহত্যাকারী দস্যু" বলে তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা বিচার করে সমুচিত দণ্ড দিলেন। এই পূর্বজন্ম কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'তখন এই পাটনি ছিল সেই পাটনি, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।'

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with Commentary, Vol. III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

দ্বিতীয় খণ্ড

অবিরল দন্ত

ভগবান বুদ্ধ দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। অবিরাম দন্ত এই দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণের অন্তর্গত। দীঘনিকায়ে বলা হয়েছে ভগবান পূর্ব জন্মে, পূর্ব ভাব পূর্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে পিশুন বাক্য পরিহার করনে, এক স্থানে শ্রুত বিষয় ভেদ উৎপাদনের অভিপ্রায়ে তা অন্য স্থানে প্রকাশ করতেন না। যারা ভিন্ন প্রকৃতির তিনি তাদের মধ্যে মিত্রতা এবং ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এজন্য মরণান্তে তিনি সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলন। এই স্থানে দশ বিষয়ে তিনি অন্য দেবগণকে অতিক্রম করেছেন। এই দশটি বিষয় হল—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, আধিপত্য, রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ ইত্যাদি। ঐ স্থান হতে চ্যুত হয়ে ইহলোকে আগমণ করে এই দুই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—চত্বারিংশৎ দন্ত এবং অবিরল দন্ত।

সূত্র : Lakkhaṇa Suttanta, Dīgha-Nikāya Vol III, ed. J. E. Carpenter, 1910

আশা দাশ

অবীচি

বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু নরকের (নিরয়) অস্তিত্বের কল্পনা আছে। কোন কোন মানুষ কায়দুঃশ্চরিত, বাক্‌দুঃশ্চরিত ও মনদুঃশ্চরিত জনিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পরিণামে ইহজন্মে যেমন বিবিধ শাস্তি ভোগ করে, আবার দেহান্তে নরকে জন্মগ্রহণ করে অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে। সংকিচ্চ জাতকে (৫৩০) অষ্ট মহানরকের (মহানিরয়) তালিকা দেওয়া হয়েছে, যথা—সঞ্জীব, কালসুত্ত, সঙ্ঘাত, জালরোরুব, ধূমরোরুব, মহাবীচি, তপন ও পতাপন। দিব্যাবদানেও অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়। সংযুত্তনিকায় (১ম, ১৪৯), অঙ্গুত্তরনিকায় (৫ম, ১৭৩), সুত্তনিপাতের (পৃ. ১২৬) তালিকা অন্যরকম : অব্বুদ, নিরব্বুদ, অনব, অটট, অহহ, কুমুদ, সোগন্ধিক, উপ্পল, পুণ্ডরীক ও পদুম। মজ্‌ঝিমনিকায়ের দেবদূত সুত্তে অন্য একটি তালিকা আছে, যথা—গূথ, কুক্কুড, সিম্বলিবন, অসিপত্তবন ও খারোদকনদী। এছাড়া জাতকে খুরধার (জাতক ৫ম, ২৬৯) কাকোল (জা. ৬ষ্ঠ. ২৪৭) মতপোরিস (জা. ৫ম, ২৬৯) সত্তিসূল (জা. ৫ম, ১৪৩) প্রভৃতি কয়েকটি নরকের নাম পাওয়া যায়।

কয়েকটি নিকায় গ্রন্থে এবং ধম্মপদ অট্ঠকথা, সুত্তনিপাত অট্ঠকথা প্রভৃতি টীকা গন্থে মহানরকের ভয়ঙ্করত্ব ও অপরিসীম যন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে। অষ্টমহানরকের মধ্যে অবীচি বা মহাবীচিই সবচেয়ে ভীষণ। অবীচি শব্দের অর্থ যার ঢেউ নেই অর্থাৎ অনন্ত, যেখানে অনন্তকাল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মহাতাপন নিরয়ের পনের হাজার যোজন নিয়ে শিলা পৃথিবীতেই এই অবীচি মহানরক প্রতিষ্ঠিত। এই নরকই সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাদায়ক।

পাপীগণ এই নরকের অভ্যন্তরে অগ্নিসন্তাপ সহ্য করতে না পেরে যখন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে, তখন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উর্দ্ধ, অধঃ—এই ছয়দিক থেকে অজস্র তালবৃক্ষ প্রমাণ জ্বলন্ত লৌহশূল বৃষ্টি সজোরে বর্ষিত হয়ে পাপীদের দেহ ভেদ করতে থাকে, তথাপি শাস্তিভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয় না। এই নরকবাসীর আয়ু এক অন্তর কল্প। ইহজগতে যারা মাতা-পিতা হত্যা করে, অর্হৎ হত্যা করে, বুদ্ধের পায়ে আঘাত করে রক্তপাত ঘটায়, সাধুসজ্জনের নিন্দা করে, ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ করে, তারাই অবীচি মহানিরয়ে উৎপন্ন হয়ে দুর্বিসহ দুঃখভোগ করে। যেমন, দেবদত্তকে বুদ্ধের চরণে আঘাত করার ও সংঘভেদ করার অপরাধে পৃথিবী উন্মুক্ত হয়ে অবীচি নরকে নিক্ষেপ করেছিল। তদ্রূপ আনন্দমানবের ভিক্ষুণী উপ্পলবণ্ণাকে ধর্ষণ করার অপরাধে, সুপ্পবুদ্ধের বুদ্ধকে অপমানিত করার অপরাধে, চিঞ্চামানবিকার বুদ্ধকে মিথ্যা অপবাদ দেবার জন্য এই চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

[দ্রষ্টব্য : G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I—II]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অব্যাকত

অব্যাকত, ব্যাখ্যাতীত যা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় না। শ্রাবস্তীর মহারাণী মল্লিকা পার্কের বিতর্ক সভাগৃহে প্রোষ্ঠপাদ (পোট্‌ঠপাদ) ভগবান বুদ্ধকে পৃথিবী ও আত্মা সম্পর্কে দশটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নগুলি হল (১) পৃথিবী কি শাশ্বত (সস্‌সত)? (২) পৃথিবী কি অশাশ্বত? (৩) পৃথিবী কি সীমাবদ্ধ (অনতবা)? (৪) পৃথিবী কি অসীম? (শরীর ও আত্মার জীব কি সমান) (৬) শরীর কি আত্মা থেকে ভিন্ন? (৭) তথাগত কি মৃত্যুর পরেও (পরম মরণা) বসবাস করতে পারেন? (৮) মৃত্যুর পর কি তিনি বসবাস করতে পারেন না? (৯) মৃত্যুর পর তিনি কি জীবিত বা অজীবিত উভয় অবস্থায় অবস্থান করতে পারেন? (১০) মৃত্যুর পর কি তিনি অজীবিত বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারেন? (দীঘ-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭-৮ ; মজ্‌ঝিম-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৬, ৪৮৪ ; সংযুক্ত-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭ ; অঙ্গুত্তর-নিকায়, ২য় খণ্ড পৃঃ, ৪১)।

ভগবান বুদ্ধ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যে সমস্ত প্রশ্ন মানবকল্যাণের হিতসাধন (ন ধম্ম-সমহিতম্) করে না, যা মানুষকে নির্বাণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে না, সেরূপ প্রশ্ন করা অবান্তর। তিনি আরও বলেন, যে সমস্ত প্রশ্ন ভুলভাবে সংগঠিত এবং বাহ্যবস্তুর দ্বারা পরিচালিত, হাঁ বা না এই কথা বলে তার উত্তর দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ হয় না (অপ্পবিহারকতম্ ভাসিতম্, দীঘ-নিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫)। কারণ সমস্ত প্রশ্নগুলিই ব্যক্তি সম্বন্ধীয়।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I, P. 464-5]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অশ্বঘোষ

কুষাণরাজ কণিষ্কের (খৃঃ ২য় শতক) সভাকবি। তিব্বতী কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধের নির্বাণের ৪০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অশ্বঘোষ ছিলেন কণিষ্কের ধর্মগুরু। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার, গায়ক, বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ। হিউয়েন-সাঙের মতে অশ্বঘোষ ছিলেন আচার্য নাগার্জুন আর্যদেব এবং কুমারলব্ধের সমসাময়িক, অথবা কিঞ্চিৎ পূর্বকার। তিনি ঋগ্বেদ, রামায়ণ-মহাভারত, উপনিষদ, শতপথব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ দিব্যাবদানের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে তিনি যৌবনে ওড়িবিশ (অর্থাৎ উড়িষ্যা, গৌড়, তিরহতি, কামরূপ এবং পূর্বভারতের অন্যান্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তর্কযুদ্ধে বিপক্ষীদের পরাস্ত করেছিলেন। তিনি জীবনের বেশীরভাগ সময় মধ্যভারতে অবস্থান করে বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অশ্বঘোষের মাতা ছিলেন সুবর্ণাক্ষী এবং তিনি সাকেত নগরের অধিবাসী ছিলেন। তারানাথের মতে অশ্বঘোষের পিতা ছিলেন ধনী ব্রাহ্মণ সঙ্ঘগুহ্য যিনি খোর্তা অঞ্চলের ধনীব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই কন্যারই নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী।

অশ্বঘোষের জন্মস্থান নিয়ে কিংবদন্তীর অন্ত নেই কারও মতে তিনি পূর্বভারতের লোক, মতান্তরে তিনি পশ্চিমভারতের লোক, কেউ কেউ বা তাঁকে দক্ষিণভারতের লোক বলেছেন।

তাঁর রচিত 'সৌন্দরানন্দ কাব্য' Colophon-এ বলা হয়েছে যে অশ্বঘোষ ছিলেন একজন মহান কবি, ভিক্ষু ও আচার্য 'বুদ্ধচরিত' এবং 'শারিপুত্র প্রকরণের' Colophon থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন সাকেত নগরের অধিবাসী এবং তাঁর মাতা ছিলেন সুবর্ণাক্ষী। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবংশে কিন্তু পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন স্থবির পার্শ্ব মতান্তরে স্থবির পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশ। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ হওয়ার ফলে সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের নিদর্শন মেলে তদ্বিরচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যে এবং 'শারিপুত্তপ্রকরণ' নাটকে। রামায়ণ ও মহাভারত যে তাঁকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় মেলে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্যে। তিনি বাল্মীকিকে আদিকবি বলেছেন এবং বুদ্ধচরিতের অষ্টম সর্গের সঙ্গে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতের কিছু কিছু ঘটনার সাদৃশ্য তাঁর 'বুদ্ধচরিতের' একাদশ সর্গে এবং 'সৌন্দরানন্দের নবম সর্গে দেখা যায়। অতএব Classical সংস্কৃত সাহিত্যের সন্ধিক্ষণে যে অশ্বঘোষের আবির্ভাব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি যেমন উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর রচনাও মহাকবি কালিদাসকে প্রভাবিত করেছিল।

বুদ্ধচরিত :— তিব্বতী ও চীনা অনুবাদে এর ২৮টি সর্গ পাওয়া যায়। ডঃ জনসটন ইংরাজীতে ২৮টি সর্গেরই অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃতে মাত্র ১৪টি সর্গ অদ্যাবধি পাওয়া গেছে তাও প্রথম সর্গ এবং চর্তুদশ সর্গের ১০০টি শ্লোক পাওয়া যায় নি। বুদ্ধের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ঘটনা সম্বলিত বুদ্ধচরিত একটি উন্নতমানের মহাকাব্যবিশেষ যাকে উৎকৃষ্টতার দিকে রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সৌন্দরানন্দ :— কাব্যটি ১৮টি কাণ্ডসম্বলিত। উৎকর্ষতায় এই কাব্য বুদ্ধচরিত অপেক্ষা উন্নতমানের। মূল বিষয়বস্তু হল বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষাদান। নন্দ অপ্সরা তুল্যা সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিল এবং তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধীয় কোনও দৃশ্য বা ঘটনা যা বুদ্ধচরিতে সংক্ষিপ্তাকারে আছে বা একেবারে নেই সেগুলি সৌন্দরানন্দে বিস্তৃতভাবে আছে, এই দৃষ্টিতে সৌন্দরানন্দকে বুদ্ধচরিতের পরিপূরক বলা যায়। এই কাব্য রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি নিজেই লিখেছেন : "প্রায়ই জনগণকে বিষয়রত এবং মোক্ষবিমুখ দেখে আমি কাব্যের ছলে সত্যের উপদেশ প্রদান করেছি। মোক্ষই সকলের উপরে। এই গ্রন্থে মোক্ষের যা কিছুর অবতারণা করা হয়েছে তা কেবল গুরুগম্ভীর বিষয়কে সরস করার জন্য যেমন কটু ঔষধকে রুচিকর করার জন্য মধু মিশ্রিত করা হয়ে থাকে"।

শারিপুত্রপ্রকরণ :— অপর নাম শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ। প্রণেতা সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ। ইহা নয় অঙ্ক সমন্বিত একটি নাটক। কি করে শারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন এই দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হয়ে বুদ্ধের সঙ্ঘে প্রধান ভূমিকা লাভ করেছিলেন তাই এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। অন্তভাগে শারিপুত্র এবং বুদ্ধের মধ্যে যে দার্শনিক বার্তালাপ হয়েছিল তার সংযোজনা আছে। বুদ্ধ ও শিষ্যদের বার্তালাপ গদ্যপদ্যমিশ্রিত। বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। শেষ অঙ্কে বিদূষকের প্রস্থান কবির সুরুচির পরিচায়ক কারণ বুদ্ধের উপদেশে দীক্ষিত হয়ে বিদূষকের মত মনোরঞ্জক পাত্রের প্রয়োজন শারিপুত্রের থাকে না।

মধ্য এশিয়ার তুর্ফান অঞ্চলে তিনটি নাটকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হল শারিপুত্রপ্রকরণ। সারিপুত্রপ্রকরণেরও খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে, আরও কয়েকটি গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোর গ্রন্থকারও অশ্বঘোষ বলে অনেকে মনে করেন, যেমন, সূত্রালংকার, মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ, বজ্রসূচী, গণ্ডীস্তোত্রগাথা, রাষ্ট্রপাল। এইজন্য কারও কারও মতে অশ্বঘোষ নামে তিনজন পণ্ডিত ছিলেন। (১) (মহাযান) সূত্রালংকার শাস্ত্রের প্রণেতা, (২) স্থবির অশ্বঘোষ যিনি বুদ্ধচরিতাদি রচনা করেছেন এবং (৩) মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রের প্রণেতা বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ। তিব্বতীতে অশ্বঘোষের নামে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

অষ্টমক ভূমি

বৌদ্ধধর্মে একজন সাধারণ বুদ্ধ শিষ্যকে (শ্রাবকভূমি ; মহাব্যুৎপত্তি, B. B. XIII, p. 18) সাতটি (কখনো ৮টি বা ১০টি) ধাপের মধ্যে প্রাথমিক যে ধাপটি পার করে প্রথম ফলপ্রাপ্তি ঘটে তাকে শ্রোতাপত্তিফল প্রতিপন্নক বলে। মহাব্যুৎপত্তিতে অন্য ৬টি ফলপ্রাপ্তি হল যথাক্রমে শুক্লবিদর্শনা, গোত্র, দর্শন, তনু, বীতরাগ এবং ক্রীতাবী। হীনযান মতে একজন বুদ্ধশ্রাবককে ধর্মীয় উন্নতিকল্পে উপরোক্ত ভূমিগুলি সাধনার মাধ্যমে পার হতে হবে যদিও মূল পালি গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই নিয়মগুলি কিন্তু একজন বোধিসত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। মহাযান গ্রন্থে (শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, পৃঃ ১৫৬২-৩) উপরোক্ত সাতটি ভূমি সম্বন্ধে নেতিবাচক ভূমিকা পালিত হয়েছে। মহাযান সম্প্রদায় এই ভূমিগুলিকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যেহেতু এই ভূমিগুলি আকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় তাই এর সম্বন্ধে মহাযান গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অন্যান্য আটটি ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সিদ্ধপুরুষকে সাধনার মার্গে যথাক্রমে শ্রোতাপত্তি, সকদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব এবং অনুরূপ ফলে উন্নীত করার জন্য একে অষ্টমক-ভূমি হিসাবে অভিহিত করা হয়। অষ্টমক-ভূমিতে যে শ্রাবক বিচরণ করেন তিনি অবশ্যই শ্রোতাপত্তি ফলে উন্নীত হন। (E. Obermiller, The Doctrine of Prajñāpāramitā, pp. 105, 497 ; N. Dutt, Aspects of Mahāyāna Buddhism and its relation to Hīnayāna, p. 241).

তথাপি একটি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করার মত যে শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতায় (পৃঃ ১৪৭২-৩ এবং ১৫২০) সাতটি শ্রাবকভূমির সঙ্গে প্রত্যেকবুদ্ধ-ভূমি, বোধিসত্ত্ব-ভূমি ও বুদ্ধ-ভূমি এই তিনটি ভূমি একত্রিত করে দশটি ভূমি বোধিসত্ত্বের জন্য তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক প্রচলিত অর্থে বোধিসত্ত্ব-ভূমি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, সাতটি হীনযান সম্প্রদায়ের প্রচলিত ভূমিকে পরবর্তীকালে আরও তিনটি ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে বোধিসত্ত্ব-ভূমির রূপদান করা হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ; ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I, P. 244]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অষ্টমহাসিদ্ধি

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির (Circa 150 B.C.) যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ আচার্য অসঙ্গ (Circa 500 A. C.) আটটি গুরুত্বপূর্ণ জাদুশক্তির শিক্ষা প্রদান করেছিলেন এবং এই আটটি জাদুশক্তির প্রচলন খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ্ চীনে প্রবর্তন করেন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের উৎফুল্লজনক সঙ্গম, আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে গভীরভাবে স্বীয় আত্মার সমাধিস্থিত করাকে মহাসংবেশন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। একজন ধ্যানীর কাছ থেকে এটা আশা করা হয় যে, তিনি চারিত্রিক গত দিক থেকে ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন এবং একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিন্দু বা মার্গে নিজেকে সমাধিস্থ করে সমস্ত কুচিন্তাকে নির্মূল করবেন। আত্মার উন্নতিকল্পে অসঙ্গের এই সূত্রকে আরও উৎকর্ষসাধক করার জন্য ধারণি, মন্ত্র, মুদ্রা ও সংগীতের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই পন্থা অনুসরণ করে একজন সিদ্ধ বা ধ্যানী অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং ধীরে ধীরে অষ্টমহাসিদ্ধি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই অষ্টমহাসিদ্ধি একজন সিদ্ধকে শিক্ষা দেয় পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে তার থেকে কিভাবে তিনি শরীরকে (১) হাল্কা করা (লঘিমন) (২) ভারী করে তোলা (গরিমন), (৩) ছোট করা (অণিমন), (৪) বৃহৎ করা (মহিমন), (৫) যে কোন জায়গায় গমন করার জন্য (প্রাপ্তি), (৬) যে কোন রূপ ধারণ করা (প্রাকাম্য), (৭) প্রাকৃতিক সমস্ত নীতিকে দমন করা (ঈশিত্ব) এবং (৮) প্রত্যেকটি বস্তু কেবলমাত্র একজনের উপর নির্ভরশীল হওয়া (বশিত্ব)।

অসঙ্গের এই নিগূঢ় মতবাদ কেবলমাত্র তাঁর অনুবাদ যোগাচারভূমিশাস্ত্রের চৈনিক অনুবাদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাঙ্ এই গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদ করেন এবং এই মতবাদ তিনিই চীনদেশে প্রবর্তন করেন। এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে অমোঘবজ্র খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে চীন দেশে এক শাখা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শৈব, ধ্যানীবুদ্ধ ও মহাযান ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রবোধি পুনঃরায় এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed. ; Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I. P. 242]

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

অষ্টসহস্র পদসমষ্টির দ্বারা রচিত হয়েছে বলে এই প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের উক্ত নামকরণ হয়েছে। ইহা অনেক পরবর্তীকালের রচনা এবং পণ্ডিতমণ্ডলী এই ধারণা পোষণ করেন যে অষ্টসাহস্রিকাতেই প্রজ্ঞাপারমিতা দর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে। নেপালী ঐতিহ্য অনুসারে ইহা নয় প্রকার বৈপুল্য সূত্রের মধ্যে অন্যতম এবং এতে মহাযান বৌদ্ধদর্শনের সারকথা নিহিত আছে।

প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিপাদ্য বিষয় হল : সংসারের সমস্ত ধর্ম (পদার্থ) প্রতিবিম্বমাত্র। এর কোনও বাস্তব সত্তা নেই। এর মতে সর্বধর্ম নিঃস্বভাব এবং শূণ্য। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞেয় (বাহ্যার্থ) কেবল সংবৃত্তি সৎ মাত্র—পারমার্থিক দৃষ্টিতে এদের কোনও অস্তিত্ব নেই। এরা শাশ্বতও

নয়, উচ্ছেদও নয়, কেবল প্রবাহমাত্র। এই দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করেই নাগার্জুন তাঁর শূণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই প্রজ্ঞাপারমিতার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে অষ্টসাহস্রিকাতে বলা হয়েছে :—

"যোহনুপলম্ভঃ সর্বধর্মাণাং সা প্রজ্ঞাপারমিতেত্যুচ্যতে"— অর্থাৎ সর্বধর্মের অনুপলম্ভকেই (non-puceplion) প্রজ্ঞাপারমিতা বলা হয়েছে। প্রজ্ঞাপারমিতার গুরুত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে বলা হয়েছে—"চন্দ্র-সূর্য যেমন চর্তুর্দ্বীপ-সমন্বিত পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে তদ্রূপ প্রজ্ঞাপারমিতার কার্য অন্য পঞ্চপারমিতাতে (দান, শীল, ধৈর্য, বীর্য এবং ধ্যান) দৃষ্টিগোচর হয়। সপ্তরত্ন-সমন্বাগত না হলে যেমন রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করা যায় না, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যতিরেকে পঞ্চপারমিতা 'পারমিতা' নাম ধারণেরই অযোগ্য হয়। প্রজ্ঞাপারমিতা অন্য পঞ্চপারমিতাকে অভিভূত করে, প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যতিরেকে দানাদি পঞ্চপারমিতা বিকল। প্রজ্ঞাচক্ষুর সহায়তা ভিন্ন বোধিমার্গে অবতরণ করা যায় না। যখন প্রজ্ঞাপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা পরিগৃহীত হয় তখনই এরা চক্ষুষ্মান হয়। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি গঙ্গা নামক মহানদীতে অনুগমন করে তার সঙ্গে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে। তদ্রূপ পঞ্চপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে তাকে অনুগমণ করে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি ঘটায়।

পণ্ডিতদের অনুমান অষ্টসাহস্রিকাই মূল প্রজ্ঞাপারমিতা। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ পারমিতা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেগুলো নেপাল, তিব্বত এবং চীনের বৌদ্ধ মঠসমূহে আজও সুরক্ষিত আছে। সংস্কৃতে রচিত পারমিতা গ্রন্থসমূহের মধ্যে যেগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোর নাম হল :—

শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সার্ধদ্বিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সপ্তশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, অধ্যর্ধশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, কৌশিক প্রজ্ঞাপারমিতা, স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা, প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভেদে ২ প্রকার)।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ৩২ পরিবর্ত (অধ্যায়) সম্বলিত এক বৃহদাকার গ্রন্থ। গ্রন্থারম্ভে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব বা ত্রিরত্নকে বন্দনা না করে প্রজ্ঞাপারমিতাকে বন্দনা করা হয়েছে। তারপর গ্রন্থারম্ভ। অধ্যায় অনুসারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(১) সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা বিধেয়। (২) প্রজ্ঞাপারমিতায় প্রদর্শিত উপায়ে বোধিসত্ত্বকর্তৃক দেবরাজ শক্রের দীক্ষা। (৩-৪) মোক্ষলাভের কারণস্বরূপ প্রজ্ঞাপারমিতার গুণাবলী কীর্তন (৫) প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের আবৃত্তি, শ্রবণ, লিখন, ধারণ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের ইহা দান করার ফল। (৬) বোধিজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের উপযোগিতা এবং জ্ঞানলাভের জন্য কর্মবিশুদ্ধি। (৭) জাগতিক কর্মের ফল এবং তদ্ দ্বারা প্রজ্ঞাপারমিতার সাহায্যে মুক্তিলাভ। (৮) পারমার্থিক পরিপূর্ণতা লাভের জন্য বিশুদ্ধির স্তরভেদ (৯-১০) প্রজ্ঞাপারমিতার প্রশস্তি। (১১) বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা উন্মেষের ক্ষেত্রে মায়ের বাধাদান। (১২) প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জীবের কল্যাণসাধন। (১৩) অচিন্ত্যনীয়

গুণাবলী। (১৪) সম্বোধিতে যাঁর আস্থা আছে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ করতে পারেন। (১৫) প্রজ্ঞাপারমিতা সম্বন্ধে উপদেশ। (১৬) তথতা এবং অনুত্তরসম্যকসম্বোধিমভিসম্বুতির উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য। (১৭) বোধিসত্ত্বের রূপের অপরিবর্তনীয়তা। (১৮) শূণ্যতার সংজ্ঞা। (১৯) বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গঙ্গাদেবীর ভবিষ্যদ্বাণী। (২০) প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করলে প্রজ্ঞাপারমিতা আয়ত্ত করা যায়। (২১) মারের দুষ্কর্ম, বোধিজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান এবং সজ্জনদের বিপথগামী করা। (২২) সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করতে হলে পুণ্যকর্ম সম্পাদন অপরিহার্য এবং এরজন্য প্রজ্ঞাপারমিতা অনুশীলনের প্রয়োজন। (২৩) প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র শ্রবণের ফল এবং তদ্দ্বারা শত্রুদের বিরুদ্ধে অজেয় শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। (২৪) মান অহংকার তুচ্ছ। (২৫) বোধিজ্ঞান লাভের উপায়। (২৬) বুদ্ধ সুভূতিকে উপদেশ দিচ্ছেন কিভাবে মোহগ্রস্থ এবং অশান্ত মনকেও বোধিজ্ঞান লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। (২৭) আপৎকালে বোধিসত্ত্বের সাহসিকতা। (২৮) শীল ব্রতাদির প্রয়োজনীয়তা। (২৯) প্রজ্ঞাপারমিতা মতবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া। (৩০-৩১) বোধিসত্ত্ব এবং তার শিক্ষাকে অনুসরণ বিষয়ে নানা প্রশ্নোত্তর। (৩২) প্রজ্ঞাপারমিতা শিক্ষার উপযোগিতা এবং এই সূত্র রক্ষার দায়িত্ব স্থবির আনন্দের উপর ন্যস্ত করা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার মূল শিক্ষা হচ্ছে 'বোধিসত্ত্বচর্যা' যা শ্রাবকযান এবং প্রত্যেকবুদ্ধযান থেকে বোধিসত্ত্বযানকে পৃথক করেছে। প্রজ্ঞার নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োগর দ্বারাই উক্ত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রজ্ঞাকে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা হচ্ছে সর্বজ্ঞতা কারণ বুদ্ধ সম্যকসম্বোধিতে অধিষ্ঠিত যাকে অষ্টসাহস্রিকার্য্য বলা হয়েছে। তথতা, ভূতকোটি, ধর্মধাতু এবং ধর্মতা। সম্বোধি লাভ করতে হলে জগৎকে 'শূন্য' রূপে দেখতে হবে এবং এটাই অষ্টসাহস্রিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যদ্দ্বারা বোধিসত্ত্বচর্যা বা মহাযান দর্শনের সারবস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

অসংকিয় জাতক (অশঙ্ক্য জাতক)—৭৬

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক বুদ্ধভক্ত উপাসক কার্যবশতঃ একটি বণিকদেলর সঙ্গে শকটযানে ভ্রমণ করতে করতে একদিন এক জঙ্গলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে এক জায়গায় লোকেরা শকট থেকে বলদগুলি খুলে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল কিন্তু উপাসক নিকটে একটি বৃক্ষতলে পায়চারি করতে লাগলেন। পাঁচশত দস্যু বণিকদল বা সার্থবাহকে আক্রমণ করে জিনিসপত্র লুঠ করতে এসেছিল কিন্তু উপাসকের সারাক্ষণ পদচারণার ফলে ব্যর্থ হল, বণিকদলও রক্ষা পেল। কিছুদিন পরে এই উপাসক নিজের কাজ সমাধা করে শ্রাবস্তীতে ফিরে জেতবনে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "ভগবান লোকে আত্মরক্ষা করবার সময়েও কি পরের রক্ষক হতে পারে"? বুদ্ধ বললেন, "পারে বৈ

কি, উপাসক, মানুষ যখন আত্মরক্ষায় নিরত থাকে, তখনও সে অপরকে রক্ষা করতে সমর্থ। আবার অপরের রক্ষা দ্বারা নিজের রক্ষাও হয়"। "ভগবান, আমিও নিজের নিরাপত্তার জন্য এক বণিকদলের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম, আবার একদিন আমার দ্বারা তারা রক্ষা পায়"। বুদ্ধ বললেন, "অতীতকালেও লোকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অন্যকে রক্ষা করেছিল"। তারপর তিনি সেই পূর্বজন্ম কথা আরম্ভ করলেন।

প্রচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি 'কামনা বাসনাই দুঃখের মূল কারণ বুঝতে পেরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপস্যা করতে হিমালয় অঞ্চলে চলে গেলেন। কিছুদিন পর লবণ ও অম্ল সংগ্রহের জন্য সমতলে জনপদে নেমে এলেন এবং জনৈক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন ঐ সার্থবাহ লোকজনসহ বনমধ্যে বিশ্রামার্থে অবস্থান করলেন আর বোধিসত্ত্ব নিকটে বৃক্ষতলে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর পাঁচ শত দস্যু লুঠ করবার অভিপ্রায়ে বণিকদের বিশ্রামস্থান ঘিরে ফেলল কিন্তু বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে প্রহরী মনে করে ভাবল, "এ ব্যক্তি আমাদের দেখতে পেলে বণিকদের সাবধান করে দেবে ; সুতরাং এ নিদ্রিত হলেই আমরা আক্রমণ করব", এই ভেবে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। তপস্বী কিন্তু সারা রাত্রি পায়চারি করতে লাগলেন, একবারও থামলেন না, কাজেই দস্যুরা সুযোগ না পেয়ে লাঠি, মুদ্গরাদি ফেলে চলে গেল এবং চিৎকার করে বলে গেল, "ওহে বণিকদল" আজ তপস্বী না থাকলে তোমরা সকলে ধনে প্রাণে মারা যেতে।"

পরদিন সকালে উঠে দস্যুদের ফেলে যাওয়া মুদ্গর, পাথর প্রভৃতি দেখে বণিকদল মহাভীত হল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, আপনি কি দস্যুদের দেখতে পেয়েছিলেন"। "হাঁ, আমি তাদের দেখেছিলাম।"—"আপনি এত দস্যু দেখেও ভয় পান নি"? "না, আমি ভীত হইনি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ধনবানদের মত ভয় হবে কেন"? তারপর তিনি গাথা আবৃত্তি করে তাদের ধর্মোপদেশ দিলেন :—

"লভেছি নির্বাণপথ মৈত্রীকরুণার বলে ;
কি ভয় গ্রামেতে মোর, কি বা ভয় বনস্থলে"?

তখন বণিকদের মন আনন্দে পূর্ণ হল এবং তারা পরম ভক্তি সহকারে তাঁকে পূজা করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন ধ্যানধারণা করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, তখন আমার শিষ্যরা ছিল সেই বণিকদল এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অসংস্কৃতধর্ম

বৌদ্ধশাস্ত্রে (পরবর্তীকালে) ধর্মকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সংস্কৃতধর্ম ও অসংস্কৃতধর্ম। আশ্রবের (দূষিত) সঙ্গে যুক্ত ধর্মগুলিকে সংস্কৃতধর্ম বলে। স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, কারণবিহীন, নিঃশর্ত বা নির্ভরযোগ্য, অত্যুৎকৃষ্ট, অপরিবর্তিত, শাশ্বত, নিষ্ক্রিয়, যা ভাবাবেগ বা উপলব্ধির ও ইন্দ্রয়গ্রাহ্য বস্তুর অতীত যেমন নির্বাণ হচ্ছে অসংস্কৃতধর্ম। অসংস্কৃতধর্ম কোনরূপ কারণ, শর্ত বা কারো উপর নির্ভরশীল নয়। এ হল শাশ্বত, স্বর্গীয়। সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতে অসংস্কৃতধর্ম তিন প্রকারের (১) আকাশ (মহাশূন্য), (২) প্রতিসংখ্যানিরোধ (কলুষিত ভাবাবেগ চেতনার নিবৃত্তি) ও (৩) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (নির্লজ্জ বা উদ্যমবিহীন ভাবনার নিবৃত্তি)। বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু প্রভৃতিকে অসংস্কৃতধর্ম হিসাবে ধরা হয়। শূন্যতা যা তথতালক্ষণযুক্তকেও কেউ কেউ অসংস্কৃতধর্ম হিসাবে গণ্য করেছেন।

[দ্রষ্টব্য : Soothill, W. E & Hodous, L. ; Comp., A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, p. 380 ; Saddhatissa, H., Buddhist Ethics : essence of Buddhism, p. 46 ; Chaudhury, Dr. Sukomal, Analytical study of the Abhidhammakoṣa, p. 71.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অসঙ্গ

বৌদ্ধ যোগাচার দর্শনের প্রধান প্রচারক এবং 'আলয়বিজ্ঞান' দর্শনের স্রষ্টা। খ্রীষ্টিয় ৪র্থ-৫ম শতকে তাঁর আবির্ভাব। গান্ধার রাজ্যের পেশোয়ারে তাঁর জন্ম। পিতা ব্রাহ্মণ কৌশিক এবং মাতা প্রসন্নশীলা (তিব্বতী উৎস থেকে জানা যায়)। তিন ভ্রাতার মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ, অন্য দুইজন হলেন বসুবন্ধু ও বিরিঞ্চিবৎস। অবশ্য লামা তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে অসঙ্গের পিতা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বসুবন্ধুর পিতা ব্রাহ্মণ। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মাতা একই তবে পিতা ভিন্ন। তিন ভ্রাতাই প্রথমে বৌদ্ধ সার্বাস্তিবাদী শাখায় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে প্রথমে অসঙ্গ মহাযানী আচার্য মৈত্রেয়নাথের নিকট দীক্ষা নিয়ে যোগাচার ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। কিংবদন্তী অনুসারে আচার্য মৈত্রেয়নাথ প্রত্যহ রাত্রে অসঙ্গের নিকট যোগাচারশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন আর অসঙ্গ দিনের বেলায় তা জনসাধারণকে শোনাতেন। তারানাথের মতে অসঙ্গ যোগাচারদর্শনে দক্ষতা অর্জন করে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান ঘুরে তা প্রচার করেছিলেন। তিনি মহাযানী ভিক্ষুদের জন্য কমপক্ষে ২৫টি সঙ্ঘারাম তৈরী করিয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁরা অনুজ ভ্রাতা বসুবন্ধুকে যোগাচারধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

অসঙ্গ অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি মৈত্রেয়নাথের ৬টি গ্রন্থের উপর টীকা লিখেছিলেন, যেমন যোগচর্যাভূমিশাস্ত্র যোগবিভঙ্গশাস্ত্র, মহাযান সূত্রালঙ্কার, মধ্যান্তবিভঙ্গ, বজ্রচ্ছেদিকা। প্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র এবং অভিসময়ালংকার। এ ছাড়াও তাঁর অনেক প্রামাণ্যগ্রন্থ

আছে। যেমন অভিধর্মসমুচ্চয়, মহাযানসম্পরিগ্রহ প্রকরণআর্যবাচা, মহাযানউত্তরতন্ত্রব্যাখ্যা। ত্রিংশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, কারিকাসপ্ততি, মধ্যমকানুগমশাস্ত্র। তাঁর গ্রন্থাদির মাধ্যমে অসঙ্গ একথা প্রমাণকবার চেষ্টা করেছেন যে শ্রাবকযানের ন্যায়, মহাযান বা বোধিসত্ত্বযানও বুদ্ধবচন। তাঁর আর একটি প্রধান কীর্তি হচ্ছে আলয়বিজ্ঞান দর্শনের উদ্ভাবন। অসঙ্গের অন্য একটি উদ্ভাবিত দর্শন হচ্ছে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'। তাঁর মতে চিত্তের ন্যায় বস্তুজগৎও বিজ্ঞপ্তিমাত্র বা চিত্তমাত্র। বসুবন্ধু এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা দর্শনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই আচার্য অসঙ্গের প্রায় চারশ বছর পরে একজন তান্ত্রিক অসঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি আচার্য সরহের শিষ্য লুই-পার সমসাময়িক।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

অসঙ্গব্যূহ

গণ্ডব্যূহতে উল্লিখিত তথাগত বুদ্ধের একপ্রকার মুক্তির পথ হচ্ছে অসঙ্গব্যূহ। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মুক্তির পথকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেছেন। এইসব ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলির মধ্যে অসঙ্গব্যূহ একটি। মুক্তক শ্রেষ্ঠী অসঙ্গব্যূহ মুক্তির নিয়ম মেনে একপ্রকার সমাধিতে উত্তীর্ণ হল এবং সুধন নামে কোন এক ব্যক্তিকে বলেন তিনি প্রার্থনা করে বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্মুখীন হয়েছেন। তারপর তিনি বুদ্ধদের নাম ও কোন লোকে তাঁদের অবস্থান তা বর্ণনা করেন। পরক্ষণেই তিনি বলছেন যে কোন বুদ্ধই তাঁর কাছে আসেননি বা তিনি নিজেও বুদ্ধের সংস্পর্শে আসেননি। কিন্তু সকল বুদ্ধই তাঁর সম্মুখে দেখা দিয়েছেন, কারণ তিনি তথাগতবিমোক্ষ ধ্যান অভ্যাস করেছেন।

এই বর্ণনার মূল বৈশিষ্ট্য হল অসঙ্গব্যূহ ধারণাটির সঙ্গে মহাযান বুদ্ধক্ষেত্রের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যখন পারমিতা ও ভূমির মাধ্যমে একজন শিষ্য আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রগতি লাভ করতে থাকেন তখন তিনি এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছান যেখানে অগণিত সমস্ত পূর্ব বুদ্ধদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এই ধীশক্তিকে মনে করা হয় এই ধরণের শিষ্যদের বিশেষ সুবিধা।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed. ; Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I, P. 148]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অসন্ধিমিত্তা

অসন্ধিমিত্তা ছিলেন রাজা ধম্মাশোকের প্রধান মহিষী। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি অশোকের রাজত্বকালের ত্রিশ বর্ষে মারা যান। শ্রীলঙ্কায় বোধিবৃক্ষের শাখা নিয়ে যাবার প্রস্তুতিকালে তিনি বৃক্ষকে সমস্ত প্রকার অলংকার এবং নানাপ্রকার মধুর গন্ধযুক্ত ফুল প্রদান করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁহাকে জ্ঞাত করেছিলেন যে বুদ্ধের কণ্ঠস্বরের মত

করভীক পাখীর কণ্ঠস্বর ছিল। রাজা তাঁহাকে একটি করভীক পাখী দিয়েছিলেন। তিনি তাহার গান শুনিতেন। বুদ্ধের কণ্ঠস্বরের মধুরতম কথা চিন্তায় তিনি রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন এবং ধম্মপথের প্রথম ফল লাভ করেছিলেন। তিনি অসন্ধিমিত্তা বলে পরিচিত ছিলেন কারণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজগুলি কেবলমাত্র তখনই দৃষ্টিগোচর হত যখন তিনি তাদের বাঁকাতেন অথবা প্রসারতি করতেন। পূর্ববর্তী জম্মে যখন অশোক একজন মধু ব্যবসায়ীরূপে জম্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পচ্চেক বুদ্ধকে মধু দিয়েচিলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন পরিচারিকা যিনি পচ্চেক বুদ্ধকে মধু ভাণ্ডার সম্বন্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। তখন তিনি জম্বুদ্বীপের রাজার অগ্রমহিষী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Mahāvamsa, ed., W. Geiger, London, 1908 Tr. Turnour, Ceylon, 1896 ; ed N. K. Bhagwat, Bombay, 1936
2. Sāmantapāsādikā, ed. ; J. Takakusu, 2 Vols., Pali Text Society, London, 1924-27.
3. Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā, Sumangalavilāsini, I-III, ed. T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter, W. Stede, Pali Text Society, London, 1886-1932.
4. Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā, Papañcasudani, I-V, ed., J. H. Woods, D. Kosam ; G. I. B. Horner, P. T. S. London, 1822-1938.
5. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols, London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অসদিস জাতক

অসদিস জাতকে রাজকুমার অসদিসের গল্প বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব বেনারসের রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র হয়ে জম্মেছিলেন। অসদিসের ভ্রাতার নামও ছিল ব্রহ্মদত্ত। পিতার মৃত্যু হলে অসদিসকে রাজ্যভার গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করেছিলেন। নগরে তাঁহার উপস্থিতি তাঁহার ভ্রাতার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পেরে তিনি বেনারসে গিয়েছিলেন এবং তীরন্দাজ হিসেবে অপর এক রাজার রাজকার্যে যোগদান করেছিলেন। এই বিষয়ে বিস্ময়কর কৌশল রপ্ত করার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার জন্য তিনি তাবতিংসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরে, তাঁহার ভ্রাতার রাজ্য সাতজন রাজা অবরোধ করেছেন শুনে অসদিস একটি বার্তা বহনকারী তীর নিক্ষেপ করেছিলেন রাজাদের থালায় যাহাতে তাঁহারা খাদ্য গ্রহণ করছিলেন এবং সকলে তাঁহারা পলায়ন করেন। কিছুদিন পরে তিনি তপস্বী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্ম জগতে জম্মগ্রহণ করেছিলেন।

মহাপরিহার উল্লেখে এই গল্প বলা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে বোধিসত্ব পূর্বের জীবনেও রাজ্য ত্যাগ করিছিলেন। গল্পের শেষোক্ত অংশ মহাবস্তুতে দেওয়া হয়েছে এবং ইহা শরক্ষেপন জাতক নামে পরিচিত হয়েছে। ভারহুত এবং সাঁচীস্তূপে এই গল্প মূর্ত্তির আকারে কল্পিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাজা কিত্তিসিরি এই জাতককে ভিত্তি করে সিংহলী ভাষায় একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed., V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1917.
2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.
3. Malāvaṃsa, ed. W. Geiger, London, 1905. Tr. Turnour, Ceylon, 1896.

কানাইলাল হাজরা

অসম্পদান জাতক

বোধিসত্ব রাজগৃহে শঙ্গসেঠ্ঠি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার পিলিয়সেঠ্ঠি নামে বেনারসে এক ধনী বন্ধু ছিলেন। পিলিয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি তখন শঙ্খের সাহায্য প্রার্থনা করায় শঙ্ক তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পিলিয়কে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শঙ্খ নিজে যখন কপর্দকশূন্য হন, তখন তিনি পিলিয়র কাছে সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে স্ত্রীর সহিত বেনারসে এসেছিলেন। কিন্তু পিলিয় তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফিরিবার পথে এক ব্যক্তি এবং তাঁহার বন্ধুদের সহায়তায় পিলিয়র অকৃতজ্ঞতার কথা রাজা জানতে পারেন। তিনি শঙ্খকে পিলিয়র সমস্ত সম্পত্তি দিতে চান কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির অনুরোধে তাঁহাকে প্রত্যর্পন করেছিলেন সেইটুকুমাত্র যাহা তিনি তাঁহার সাফল্যের দিনে পিলিয়কে দিয়েছিলেন।

এই গল্প বর্ণিত হয়েছে দেবদত্তর অকৃতজ্ঞতার উল্লেখে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.
2. Francis H. T. ed E. J. Thomas, Jātaka Tales, Cambridge, 1916.
3. G. D. De, Significance of the Jātaka, Calcutta, 1925.
4. Jātaka, ed., V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge. 1885-1913.

কানাইলাল হাজরা

অসাতমন্ত বা অসাতমন্ত্র জাতক

একদা বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। বেনারসের একজন তরুণ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এবং পাঠ শেষ করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। তথাপি তাঁহার মাতা চিন্তিত ছিলেন যে তাঁহার সংসারধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত এবং বনে অগ্নিভগবায় যত্ন নেওয়া উচিত। তদনুসারে তিনি তাঁহাকে "অসাতমন্ত" শিক্ষার উদ্দেশে শিক্ষকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষকের ১২০ বৎসর বয়সী মাতা ছিলেন এবং তিনি নিজে তাঁহার দেখাশুনা করতেন। যখন যুবক "অসাতমন্ত" শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট এসেছিলেন, তিনি তাঁহাকে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার দেখাশুনা করতে বলেছিলেন। মাতা তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়ে তাঁহার পুত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন একটি কাঠের মূর্ত্তি নির্মাণ করে তাঁহার নিজের বিছানাতে রেখে ছিলেন। মাতা পুত্রকে হত্যা করবার কথা চিন্তা করে একটি কুঠার দ্বারা আঘাত করেছিলেন এবং যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। যুবক "অসাতমন্ত" জেনে তাঁহার পিতামাতার কাছে ফিরে গেছলেন এবং একজন তপস্বী হয়েছিলেন। কাদীলানী ছিলেন এই গল্পের মাতা। মহাকস্সপ ছিলেন পিতা এবং আনন্দ ছিলেন শিষ্য।

যৌন-ভালবাসায় মগ্ন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে স্ত্রীলোকের অসৎ প্রবৃত্তিসম্বন্ধে সতর্ক করতে উম্মদন্তী জাতক সহ এই গল্প বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed., V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1913.

2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অসাতরূপ জাতক

একদা বোধিসত্ত্ব বেনারসের রাজা ছিলেন। কোসলের রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁহাকে হত্যা করেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজার পুত্র নিম্নস্থ নর্দমা দিয়ে পালিয়ে গেছিলেন। পরে তিনি যুদ্ধ করতে এক বিরাট সৈন্যদলসহ ফিরে এসেছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার কার্যকলাপ শুনে তাঁহাকে নগর অবরোধ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাহা তিনি করেছিলেন এবং অবরোধের সপ্তম দিনে তাঁহার সৈন্যগণ রাজার মস্তকচ্ছেদ করে রাজপুত্রের নিকট এনেছিলেন। বর্তমান কালে এই রাজকুমার সীবলী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। অবরোধের কারণ ছিল যে সাতবর্ষ তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। কোলিয়র রাজার কন্যা সুপ্পবাসা ছিলেন তাঁহার মাতা।

ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট সুপ্পভাসার দীর্ঘ গর্ভাবস্থার কারণ সম্বন্ধে এই গল্প বলেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed., V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1913.
2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অসিত

অসিত ছিলেন একজন তপস্বী এবং সুদ্ধোদনের পিতা সীহহনুর পুরোহিত ছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার শিক্ষক ছিলেন এবং পরে তিনি তাঁহার পুরোহিত হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যাকালে রাজা সুদ্ধোদনকে দেখতে আসতেন এবং রাজাও তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাতেন। তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করেন। যথাসময়ে তিনি বিবিধ ঋদ্ধি শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করে তিনি প্রায়ই প্রত্যহ দেবজগতে অতিবাহিত করতেন। একদা যখন তিনি তাবতিংসে ছিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নগর জাঁকজমকে ভূষিত এবং দেবতাগণকে মহাআনন্দে নিমগ্ন দেখেছিলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলেন যে সিদ্ধার্থ গৌতম, যিনি পূর্ব হইতে নির্ধারিত বুদ্ধ, জন্মেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সুদ্ধোদনের গৃহে গমন করেছিলেন এবং শিশুকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁহার দেহের শুভলক্ষণগুলি দেখে তিনি জেনেছিলেন যে তিনি জ্ঞানবান হবেন এবং গভীরভাবে আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ক্রন্দন করেছিলেন এবং দুঃখিত হয়েছিলেন যখন তিনি অনুধাবণ করেছিলেন যে সেই সময় তিনি নিজে অরূপ জগতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং সেইজন্য তিনি বুদ্ধবচন শ্রবণ করতে সমর্থ হবেন না। শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজাকে আশ্বস্ত এবং নিশ্চয়তা করে তিনি তাঁহার ভগিনীর পুত্র নলককে খোঁজ করেছিলেন এবং তাঁহাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন যে যখন সময় আসবে তখন তিনি বুদ্ধের শিক্ষাদানে উপকৃত হবেন। পরবর্তীকালে অসিত অরূপ জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধ ঘোষের মতে, তাঁহার কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের জন্য তাঁহাকে অসিত বলা হয়। তাঁহার দ্বিতীয় নাম ছিল কৃষ্ণ দেওন। তাঁহার অপর নামগুলি ছিল কৃষ্ণ সিরি (কৃষ্ণ শ্রী, শ্রীকৃষ্ণ), এবং কাল দেভল। ললিতবিস্তর থেকে জানা যায় যে তাঁহার ভ্রাতার পুত্রের নাম ছিল নরদত্ত। অসিত নিজে একজন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন এবং হিমালয়ে বাস করতেন। তাঁহার সুদ্ধোদনের সহিত কোন পরিচয় ছিল না।

মহাবংশে থেকে জানা যায় যে অসিত উজ্জয়িণীর এক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন এবং বিন্ধ্য পর্বতের এক আশ্রমে বসবাস করতেন। জাতকে তাঁহাকে বলা হয় একজন তপস্বী

এবং তপশ্চর্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে যে রাজা যখন যোগীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁহার পুত্রকে যোগীর সম্মুখে এনেছিলেন তখন শিশুর পদযুগল যোগীর মস্তকে স্থাপিত হয়েছিল।

পচ্চেক বুদ্ধের তালিকায় অসিত একজন পচ্চেক বুদ্ধ বলে উল্লেখ আছে। সিখী বুদ্ধের সময় অসিত একজন মালা প্রস্তুতকারক ছিলেন। যখন তিনি একটি মালা নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখেছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি মালা উৎসর্গ করেছিলেন। ইহার ফলে, তিনি পঁচিশ কল্পগুলির পূর্বে ষেভার নামে এক রাজা হয়েছিলেন। বর্তমান কালে তিনি সুকতাভেলিয় থের নামে পরিচিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Apadāna. Ed., Mary E. Liley, Pali Text Society, London, 1925-27. Apadāna Aṭṭhakathā. ed, C. E. Godakumbara, Pali Text Society, London, 1954.
2. Sutta Nipāta, ed., D Anderson ed H. Smith, Pali Text Society, London, 1913. Tr. V. Fausboll, Sacred Books of the East, Oxford, 1898. Text and Tr. R. Chalmers, Hervard Oriental Series, Cambridge, Mass, 1932. Sutta Nipāta commentary, 3 vols., ed. Helmer Smith, Pali Text Society, London, 1965-66.
3. Majjhima Nikāya, ed., Trenckner and. R., Chalmers, 4 vols., Pali Text Society, London 1887-1902. Tr. R. Chalmers, 2 vols., Further Dialogues of the Buddha, Sacred Books of the Buddhists, Pali Text Society, London, 1926-27.
4. Jākaka, ed., V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-1897. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1913.
5. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অসিতাভূ জাতক

একদা বোধিসত্ত্ব একজন ঈশ্বরভক্ত যোগী ছিলেন। তিনি হিমালয়ে বাস করতেন। সেই সময়ে বেনারসের রাজা তাঁহার পুত্র রাজকুমার ব্রহ্মদত্তের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রী অসিতাভূকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। তাঁহারা হিমালয়ে গিয়েছিলেন এবং কুটীরে বাস করছিলেন। একদিন রাজকুমার একজন চণ্ডকিন্নরীর প্রতি মোহিত হয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অসিতাভূ বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়েছিলেন এবং নানাপ্রকার অতিমানুষিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁহার কুটীরে ফিরে এসেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁহার কুটীরে ফিরে এসেছিলেন। সেখানে

তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তাঁর নতুন দেখা মুক্তির আনন্দের গান উচ্চারণ করা অবস্থায় শূণ্যে ঝুলিতে দেখেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করছিলেন। পরে তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুটি প্রধান শিষ্যের এক ভৃত্যের একটি যুবতী কন্যার উল্লেখে এই গল্প বলা হয়েছিল। তিনি বিবাহিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে উপেক্ষা করায় তিনি দুই প্রধান শিষ্যের নিকট গিয়েছিলেন। তাঁহাদের নির্দেশনায় তিনি ধম্মপথের প্রধান ফল লাভ করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং অবশেষে তিনি অরহন্ত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী জন্মে তিনি ছিলেন অসিতাভূ।

বিভঙ্গ টীকায় এই গল্পের উল্লেখ আছে। বেনারসের রাজা তাঁহার স্ত্রীর সহিত ঋলসান রান্না করা মাংস খাবার জন্য বনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক কিন্নরীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। যখন তিনি তাঁহার রাণীর নিকট ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট থেকে শূণ্যে উড়ে যেতে দেখেছিলেন। তিনি ঋদ্ধি শক্তিগুলির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। অসিতাভূর উদাহরণ দিয়ে এক বৃক্ষ-প্রেতী একটি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed., V.Fausboll 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1913.
2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960

কানাইলাল হাজরা

অসিলক্‌খন জাতক

বেনারসে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি তরবারিগুলির গন্ধ শুঁকে বলতে পারতেন যে তরবারিগুলি সৌভাগ্যময় অথবা নহে। একদিন যখন তিনি একটি তরবারি পরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় তিনি হেঁচেছিলেন এবং তাঁহার নাকের অগ্রভাগ কেটে ফেলেছিলেন। রাজা একটি নকল অগ্রভাগ তৈয়ার করেছিলেন, এবং তাঁহার নাকেতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাহাতে কেহ পার্থক্য বলতে পারত না। রাজার একটি মেয়ে এবং একটা দত্তক ভায়ের ছেলে ছিল। তাঁহারা পরস্পরকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু রাজার অপর অভিসন্ধি থাকায় তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক করে রেখেছিলেন। রাজকুমার তাঁহার প্রিয়তমাকে পাবার জন্য একজন বৃদ্ধাকে ঘুষ দিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধা রাজাকে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁহার মেয়ে ডাইনির প্রভাবে পড়েছে এবং তাহা হইতে মুক্তির একমাত্র পথ ছিল প্রহরীদের সাহায্যে তাঁহাকে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া। সেখানে তাঁহাকে একটি শবদেহের শয্যার উপর শোয়ান হবে এবং ভূত ঝাড়ার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্নান করানো হবে। রাজকুমারকে শব সাজানো

হয়েছিল এবং তাঁহাকে লংকা অথবা গোলমরিচ দেওয়া হয়েছিল যাহাতে ঠিক মুহূর্তে তিনি হাঁচতে পারেন। প্রহরীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে যদি ভূত ঝাড়া সফল হয় তাহলে মৃত ব্যক্তি হাঁচবেন, দাঁড়াবেন এবং যে দ্রব্য প্রথম ধরিবেন তাহা মারিবেন। চক্রান্ত সফল হয়েছিল এবং যখন রাজকুমার হেঁচেছিলেন তখন প্রহরীগণ পালিয়েগিয়েছিল। দুই প্রেমিক এবং প্রেমিকা বিবাহ করেছিলেন এবং রাজা তাঁহাদের ক্ষমা করেছিলেন। পরে তাঁহারা রাজা এবং রাণী হয়েছিলেন।

একদিন তরবারি পরীক্ষক ব্রাহ্মণ রৌদ্রতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁহার নাকের নকল অগ্রভাগ গলে গেছিল এবং পড়ে গেছিল। তিনি খুব লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজা হেসে বলেছিলেন, "কিছু মনে করবেন না, হাঁচি কাহারও কাছে খারাপ, আবার অপরলোকেদের কাছে ভালো। একটি হাঁচির ফলে আপনি আপনার নাক হারিয়ে ফেলেছেন কিন্তু একটি হাঁচির জন্য আমি আমার সিংহাসন এবং আমার রাণীকে লাভ করেছি।

এই গল্প বর্ণিত হয়েছিল কোশল রাজ্যের এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে যিনি তরবারিগুলি পরীক্ষা করতেন গন্ধশুঁকে। তিনি ঘুষ নিতেন এবং যাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করতেন তাঁহাদের তরবারিগুলি তিনি উত্তীর্ণ করে দিতেন। একদিন একজন অতিশয় কুপিত ব্যবসায়ী তাঁর তরবারীতে লঙ্কা অথবা গোলমরিচ রেখে দিয়েছিলেন যাহাতে যখন এই ব্রাহ্মণ তরবারির গন্ধ শুঁকেছিলেন তখন হেঁচেছিলেন এবং তাঁহার নাক কেটেছিলেন। একদা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহার সম্বন্ধে বলেছিলেন যখন বুদ্ধ প্রবেশ করেছিলেন এবং অতীতের গল্প তাঁহাদিগকে বলেছিলেন। পৃথক জন্মগুলিতে দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন একই ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed., V.Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1913.
2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অসুভ-ভাবনা (অশুভ-ভাবনা)

(অসুভ-ভাবনা) ঃ— বৌদ্ধ দর্শনে একপ্রকার সাধনা-মার্গ। অসুভ-ভাবনা সাধন-মার্গের আধার একটি শবদেহ। হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে আমাদের শরীরে যে দশপ্রকার অপবিত্র অনুভূতির (দস-অসুভ সঞ্‌ঞা) সূচনা হয় তা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে মানসিক একাগ্রতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে শ্মশানে শায়িত শবদেহের দশপ্রকার অবস্থানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শবদেহের দশপ্রকার কুঅবস্থানকে অবলোকন করার ফলে সাধকের মনে হবে, যে এই শরীর নশ্বর এবং স্বীয় শরীরও মৃত্যুর পর শবদেহের আকার ধারণ করবে এবং এর থেকে কোনপ্রকারে নিষ্কৃতি নাই। (অয়ম্ পি খো কায়ো এবম্-ধম্মো এবম্-ভাবী এতম্ অনতীতো তি, দীঘ-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫)

দীর্ঘ-নিকায় এর সতিপট্‌ঠান সুত্তন্তে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০-৩১৫) এবং বিসুদ্ধিমগ্গের আলোচনায় দেখা যায় একজন সাধক যখন শ্মশানে পরিত্যক্ত একদিনের মৃত, দুদিনের অথবা তিনদিনের মৃত, স্ফীত, বিনীল, পূযপূর্ণ দেহ দেখেন অথবা কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণী ভক্ষণ করছে, অথবা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ ধূলোয় মিশে একাকার হচ্ছে, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সঙ্গে তুলনা করে চিন্তা করেন ' এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত'। এইরূপ অনুভূতি হলে সাধকের সাধনা বিফল হয় না এবং শয়নে বসনে কায়িক দশপ্রকার অপবিত্র সাধনার (অসুভ-ভাবনা) চিন্তা করতে থাকেন ও মানসিক উন্নিতমার্গে উন্নীত হন তখন নির্বাণলাভের পথে যে পাঁচপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা দূরীভূত হয়।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed. ; Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I, P. 280]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অসোক (অশোক)

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব আরও চারি বৎসর পর অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ ও রাজ্যাভিষেকের মধ্যে এই ব্যবধানের কারণ ব্যাখ্যা করে শ্রীলঙ্কার ইতিকথায় সিংহাসন নিয়ে বিন্দুসারের পুত্রদের মধ্যে কলহের কথা বলা হয়েছে। বিন্দুসারের ১৬ জন স্ত্রী ছিলেন এবং ১০১ জন পুত্র ছিলেন। কিন্তু পালি প্রাচীন ইতিহসে তিনজন পুত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁহারা হচ্চেন সুমন (সুসীম), অশোক (অসোক) এবং তিস্স। অশোকের মাতার নাম ধর্ম্মা এবং তিনি ছিলেন বিন্দুরসারের প্রধান মহিষী। তিনি মোরিয়বংসের ছিলেন। অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অবন্তী রাজ্যে রাজ্যপাল ছিলেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় জেনে অশোক উর্জ্জয়িনী ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে এসেছিলেন এবং নিজেকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন। মহাবংশে বলা হয়েছে যে তিনি তিস্স ব্যতীত তাঁহার সকল ভ্রাতাদের হত্যা করেছিলেন। এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করেছিলেন। তাঁহার এই বর্বরোচিত কার্যের জন্য তিনি চণ্ডাশোক নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি তিস্সকে উপরাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন এবং অরহন্ত হয়েছিলেন। থেরগাথা টীকায় বীতাসোক নামে অশোকের আর এক ভ্রাতার নাম উল্লেখ আছে। তিনিও অরহন্ত হয়েছিলেন। অশোকের অনেক স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন বেদিসগিরির ব্যবসায়ীর কন্যা। তাঁহার নাম ছিল দেবী। তাঁহাকে আবার বেদিস-মহাদেবী বলা হত। তিনি শাক্য ছিলেন। বিদুদভের থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য তাঁহার পরিবার বেদিসতে বসবাস করেছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন মহিন্দ এবং কন্যা সংঘমিত্তা (সঙ্ঘমিত্রা)। তিনি অশোককে অনুসরণ করে পাটলিপুত্র যান নাই। সেখানে তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন অসন্ধমিত্তা। তিনি অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে মারা যান এবং চার বৎসর পর অশোক তিস্সরক্ষাকে রাণীর মর্য্যাদা দিয়েছিলেন।

অশোকের রাজত্বকালের প্রথম চার বৎসর সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ভারতীয় ইতিহাসের বর্ণ সমারোহের মধ্যে এই বৎসরগুলি ছিল "অন্ধকার যবনিকাতুল্য"। অশোক তাঁহার পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গরাজ ছিলেন এক বিশাল বাহিনীর অধিপতি। তাঁহাকে পরাজিত করতে অশোককে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। "দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী, এক লক্ষ নিহত ও উহার বহুগুণ সংখ্যক মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল"। তিনি কলিঙ্গ রাজ্যকে একটি প্রাদেশিক শাসন এলাকায় পরিণত করেন এবং তোশালী ইহার রাজধানী হয়। প্রকৃতপক্ষে বিম্বিসারের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের যে সামরিক সম্প্রসারণের এবং বিজয় অভিযানের সূত্রপাত ঘটেছিল, কলিঙ্গজয়ে কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তি হয়েছিল। অশোকের শাসনে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঠিক বিবরণ আমরা তাঁহার শিলালিপি থেকে অনুমান করতে পারি। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিমে সীরিয়ার প্রথম অ্যান্টিওকোসের সাম্রাজ্যের সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আধুনিক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশ যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই সকল অঞ্চল তথা উহাদের সন্নিহিত উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ উহার অন্তর্গত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার যোন, কম্বোজ ও গান্ধার অশোকের অধীনে উপজাতি রূপে বর্ণিত হয়েছে। কাশ্মীরও তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল বলে ধরা হয়। নেপালের তরাই অঞ্চলও তাঁহার সম্রাজ্যের অধীনে ছিল। রুম্মিনদেইয়ে প্রাপ্ত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি উহার প্রমাণ। অশোকের শাসনাধীনে মৌর্য সাম্রাজ্য পূর্ব-দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ দক্ষিণ বঙ্গের তাম্রলিপ্তিতে ও উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধনে অশোকের স্থাপিত স্তূপ দেখেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্য দক্ষিণ দিকে পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে সুদূর দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলিকে যথা চের, চোল, পাণ্ড্য ও পল্লব সীমান্ত রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি করদ উপজাতি ছিল-অন্ধ, ভোজ, পুলিন্দ ইত্যাদি। অশোকের সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সৌরাষ্ট্র অশোকের সামন্ত নৃপতির অধীনে ছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই 'দেবানম পিয়' এবং 'দেবামন পিয় পিয়দসি' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার শিলালিপিসমূহে আপনাকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বলে বর্ণনা করেছেন।

কলিঙ্গ অভিযানের অপরিমেয় দুঃখ কষ্ট ও লোকক্ষয় অশোকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি তাঁহার অন্যতম শিলালিপিতে বলেছেন, "এইরূপে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য সম্রাটের মনে অনুশোচনার উদয় হল। কারণ যেই দেশ পূর্বে জিত হয়নি সেই দেশ জয়ের অর্থ ত্রস্ত জনগণের প্রভূত হত্যা, মৃত্যু ও অসহায় বন্দিদশা। সম্রাটের নিকট উহা প্রবল দুঃখ এবং অনুতাপের কারণ হয়েছে। কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক নিহত, নিশ্চিহ্ন ও বন্দিরূপে অন্যত্র নীত হয়েছে, উহার শতাংশের একাংশ অথবা সহস্রাংশের একাংশে মানুষও যদি এখন অনুরূপ দুর্ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয় তাহা সম্রাটের নিকট সবিশেষ বেদনাদায়ক বলে মন হবে।" কিংবদন্তী মতে, অশোক তাঁহার ভাগিনেয় নিগ্রোধ শ্রামণের বা সামণের দ্বারা অপ্রমাদ বগ্গ ভাষিত হলে উহা শ্রবণ করে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একজন অনুগামী হন। তিনি তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। যদিও তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু

সকল সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি আপনাকে সর্বদা দেবতাগণের প্রিয় বলে অভিহিত করেছেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তিনি উদার মনোভাব ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের ব্যবহারের জন্য তিনি বহু মূল্যবান সম্পত্তি দান করেছেন। তাঁহার শিলালিপিগুলি সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছে। তিনি 'ধম্ম' বা মৈত্রীর একনিষ্ঠ আচরণের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি 'ধর্ম্মের' ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন—"পিতামাতাকে মান্য করতে হবে। প্রাণীসমূহের প্রতি সম্যক্ বিবেচনাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে, সত্য বলতে হবে,—এইগুলি হল মূল কর্তব্যবিধি"। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন—"পিতামাতার উপদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পুণ্যকার্য। বন্ধুজনের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা পুণ্যকার্য। মিতব্যয়িতা এবং স্বল্প সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা পুণ্যকার্য"। এইগুলি হইতে প্রমাণ হয় যে অশোক প্রচলিত ধর্মীয় তত্ত্বকথার পরিবর্তে কতকগুলি সহজ বিধি-নিয়মের কথা বলেছেন। তাঁহার প্রচারিত নীতিগুলি ছিল ভারতবর্ষের সকল ধর্মেরই মূলীভূত বিষয়বস্তু। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য সীমার অভ্যন্তরে ও বাহিরে ধর্মশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁহার সকল শিক্ষানীতি শিলা এবং প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে খোদাই করে গেছেন। যে সকল স্থানে তিনি এই বাণীগুলি উৎকীর্ণ করেছেন সেই সকল স্থানগুলি তিনি বিচার-বিবেচনা করে নির্বাচিত করেছিলেন এবং প্রাকৃত ভাষায় বাণীগুলি রচিত হয়েছিল। তিনি 'ধর্ম-মহামাত্র' নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁহাদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল ধর্মবিধির প্রতি মনোযোগ, ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা দান। অশোক পুরাতন প্রমোদ-ভ্রমণ এবং রাজকীয় শিকার-যাত্রা পরিত্যাগ করে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর তিনি 'দিগ্বিজয়ের' নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে তিনি 'ধর্মবিজয়ের' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিলালিপিতে বলেছেন যে যুদ্ধের দুন্দুভিনাদ ধর্মের দুন্দুভিনাদে পরিণত হয়েছে। দিগ্বিজয়ের পর্ব শেষ করে ধর্মবিজয়ের পর্ব তিনি শুরু করেছিলেন। এই নূতন আদর্শ গ্রহণের ফলে তিনি ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে সীমান্ত রাজ্য দখলের আর কোন চেষ্টাই করেন নাই। সৈন্যদল না পাঠিয়ে তিনি অহিংসার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকগণকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ধর্মবিজয়ের আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি শুধু তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যেই ধর্মবিজয় করেন নাই, পরন্তু সংলগ্ন সিরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিওকোস থীওস মিশরের অধিপতি টলেমী ফিলাডেলফস্, উত্তর আফ্রিকার মহিরিনের রাজা মগস্ এবং গ্রীসের এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসমূহের মধ্যেও তাঁহার ধর্মবিজয়ের রথযাত্রার অভিযান ঠিকমত পরিচালিত হয়েছিল। তাঁহার উক্ত শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে সম্রাটের ধর্মপ্রচারকগণ যে সকল অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সেই সকল স্থানগুলির জনসাধারণগণও তাঁহার মৈত্রীভাবনাযুক্ত অনুশাসন এবং নির্দেশ সমূহের কথা শ্রবণ করে ধর্মাচরণে একনিষ্ঠ ভাবে পালনে ব্রতী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা নিজেদের নিয়োজিত করতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি শ্রীলংকায় এবং সুবর্ণভূমিতে যে সকল ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন তাহার উল্লেখ আছে মহাবংশে এবং দ্বীপবংশে।

সম্রাট অশোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের পরিচালনার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তাঁহার শিলালিপিতে তিনি বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে মতসংঘর্ষ রূপ ঘোরতর পাপের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের সংহতি অক্ষুন্ন রাখবার জন্য এবং মতবিরোধ দুরীভূত করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ-সঙ্গীতি বা ধর্মসভার আহ্বানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ইহা তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি নামে পরিচিত আছে। এই সঙ্গীতিটির সভাপতি ছিলেন মোগ্গলিপুত্ত তিস্স। তিনি এই উপলক্ষ্যে অভিধম্ম পিটকের 'কথাবত্থু' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মোগ্গলিপুত্ত তিস্সের সহায়তায় ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকগণ তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনের শেষে নয়টি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। এই বৌদ্ধ অধিবেশনের লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধসংঘের মধ্যে মতবিরোধ বন্ধ করা এবং বৌদ্ধনীতিগুলির যথার্থ সংকলন হওয়া। ভিন্ন মতবাদী ভিক্ষুগন দ্বারা যাহাতে বৌদ্ধসংঘের শৃঙ্খলা নষ্ট না হয় সেইজন্য অশোক এই ধর্মসভা ডেকেছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মহ্যনতীককে কাশ্মীরের এবং গন্ধারে, মহাদেবকে মহিষমণ্ডলে, রক্ষিতকে বনবাসে, যোনে ধম্মরক্ষিতকে অপরন্তে, মহারক্ষিতকে যোনতে, মহ্যিমকে হিমালয় দেশে এবং সোন এবং উত্তরকে সুবন্নভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন ইত্তিয়, উত্তিয়, সম্বল এবং ভদ্দসালগণের সহিত মহিন্দকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অশোকের শিলাপিলিগুলি সঙ্গীতিটির কথা একবারেও উল্লেখ করে নাই। এই কারণে সঙ্গীতিটি যে আদৌ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাহা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। স্থানগুলির নাম এবং ধর্মপ্রচারকদের নামের সামঞ্জস্যের অভাব থাকা সত্বেও শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত সম্রাট অশোকের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত ধর্মপ্রাচরকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাহিনী সকলে মেনে নিয়েছেন। ইহা একবাক্যে সকলে স্বীকার করেছেন যে তাঁহার ধর্মপ্রচারের কার্যকলাপ কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্নস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশেও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার রাজা দেবানমপিয়তিস্সের অনুরোধে তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের শাখাসহ সংঘমিত্তাকে শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম দেশে এবং বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং বিশ্বের দরবারে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি নিজেকে বৌদ্ধধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবকরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজেকে বৌদ্ধসঙ্ঘের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং সম্রাটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁহার বৌদ্ধসঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর এবং বন্ধুত্বভাবাপন্ন। ধর্মের কারণে তিনি তিনবার জম্বুদ্বীপ দান করে পুনরায় উহা তিনবারই ক্রয় করেছিলেন। ইহা কথিত আছে। ধর্মের কারণে তাঁহার অর্থব্যয়ের কাহিনীর কথা বিভিন্ন জায়গাতেই উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধধর্মে অশোকের দীক্ষা তাঁহার বৈদেশিক নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন এনেছিল। সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র এবং কেরলপুত্র প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যগুলিকে স্বীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে তিনি তাহাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। সিরিয়ার সহিত তাঁহার পুরাতন বন্ধুত্বের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি আভ্যন্তরীণ নীতিতে

পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। যজ্ঞার্থে প্রাণীবধ, জীবহিংসা, অসংযত যৌথ উল্লাস এবং অশোভন আচরণাদির প্রতি তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। অহিংসা এবং মৈত্রীর আদর্শের প্রতি তিনি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার এবং তাঁহার সহজ ধর্মোপদেশের দ্বারা তিনি তাঁহার প্রজাগণের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দূরবর্তী প্রদেশসমূহে তিনি কুশাসনের অবশান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি 'যুত' বা যুক্ত', 'রাজুক', 'প্রাদেশিক' ও মহামাত্র উপাধিকারী রাজকর্মচারীদের তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করিয়ে শাসনকার্যের পরিচালনার ব্যবস্থায় এক নতুন রূপ আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মহামাত্রদিগের বিশেষ কাজ ছিল বিচারকার্যের ত্রুটি ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার দেখা এবং তাহার সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করা। ধর্মমহামাত্র নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী 'অহিংসা ও মৈত্রী' ধর্মের প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। বিচারকদের প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা ও দণ্ড হ্রাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক কার্যের ভার তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। অশোক মনুষ্য ও জীবজন্তু সকলেরই মঙ্গলের প্রতি যত্নবান ছিলেন। পশুহত্যা এবং পশুক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়মবিধির প্রচলন করেছিলেন। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ পঞ্চমসংখ্যক শিলালিপিতে পশুবধের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিধানের উল্লেখ আছে। তিনি মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই জন্য আরোগ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করেছিলেন। পথের পাশে কূপ খনন, বটবৃক্ষের চারা রোপন, আম্রকুঞ্জন নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ভিক্ষা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নূতন শাসন-ব্যবস্থায় সকল প্রকার বদান্যতার দিকে খুবই লক্ষ্য ছিল। তিনি তাঁহার নিজ আদর্শবাদ এবং কর্মপ্রেরণার দ্বারা রাজ্যের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁহারা তাঁরার কার্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি গোঁড়া কিংবা অসহিষ্ণু কখনই ছিলেন না। তিনি একটি স্থানীয় ধর্মমতকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁহার উদার মানবিক দৃষ্টিতে সকল প্রশ্ন এবং সমস্যা বিচার করতেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে তাঁহার ধর্মবিজয়ের পথ অনুসরণ করতে বলে গিয়েছেন। জনসাধারণ যাহাতে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচর্চায় দীক্ষিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্য তিনি তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হতে বলেছিলেন। সমাজজীবনের নিরাপত্তার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষায় তিনি সর্বদা যত্ন নিয়েছিলেন। তাঁহাকে একজন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ বলা হয়।

অশোকের শিলালিপিগুলি ক্রমানুযায়ী আট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ভারতের সর্বত্র উহারা ছড়িয়ে আছে। অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি তাঁহার শিলালিপিগুলির আঞ্চলিক অবস্থিতি থেকে বোঝা যায়। সাধারণতঃ ব্রাহ্মী লিপিতে বাণীগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে, তবে চতুর্দশ শিলালিপির দুইটি অংশে খরোষ্ঠি লিপির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তাঁহার প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত শিলালিপির উল্লেখ করা হল।

(১) ক্ষুদ্র শিলালিপিদ্বয়—এই দুই শিলালিপির মধ্যে প্রথম শিলালিপিটি থেকে অশোকের ব্যক্তিগত জীবন জানার জন্য কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টিতে 'ধম্ম' বলতে কি বোঝায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। নিম্নলিখিত স্থানে এই দুই শিলালিপিগুলি পাওয়া গেছে। তাহা হচ্ছে—সাসারাম (বিহারের সাহাবাদ জিলা), রূপনাথ (মধ্যপ্রদেশের

জব্বলপুর জিলা), বৈরাট (জয়পুর, রাজস্থান), সিদ্ধপুর, জটিঙ্গা-রামেশ্বর ও ব্রহ্মগিরি (ইহারা-মহীশূরের চিতলদ্রুগ জিলায় অবস্থিত), মাস্কি (অন্ধ্র রাজ্যের রায়চূড় জিলা), ইয়েরাগুডি (অন্ধ্র রাজ্যের কুর্ণুল জিলা) এবং কোপাবন (অন্ধ্ররাজ্য)। মাস্কি লিপিতে সম্রাটের ব্যক্তিগত নামের (অশোকের) উল্লেখ আছে। অন্যান্য লিপিগুলিতে তাঁহার উপাধি 'প্রিয়দর্শীর' উল্লেখ রয়েছে।

(২) ভাবরু শিলালিপি—এই শিলালিপিতে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি হইতে কতকগুলি মূল্যবান উক্তি সংকলিত রয়েছে। এই শিলালিপি প্রমাণ করে যে অশোক সত্যসত্যই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইহা ক্ষুদ্র শিলালিপিদ্বয়ের সময়ে রচিত হয়েছিল।

(৩) চতুর্দশ শিলালিপি—এই শিলালিপিগুলিতে অশোকের রাজ্যশাসন এবং নৈতিক সংগঠনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এইগুলি রচিত হয়েছে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৭ অব্দের কাছাকাছি। ইহাদের পাওয়া গেছে সবাজগড়হি (পেশোয়ার জিলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্থান), মানসেরা (হাজারা জিলা, পাকিস্তান), কলমি (উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জিলা), গীর্ণার (বোম্বাই রাজ্যের অন্তঃপাতী-জুনাগড়ের সন্নিকটে), সাপারা (বোম্বাই রাজ্যের থানা জিলা), ধৌলি (উড়িষ্যার পুরী জিলা), জওগড়া (উড়িষ্যার অন্তর্গত গঞ্জামের সন্নিকটে) এবং ইয়েরাগুডি (অন্ধ্র রাজ্যের কুর্ণুল জিলা)।

(৪) কলিঙ্গ শিলালিপি সমূহ—কলিঙ্গবিজয়ের পরবর্তী অশোকের নূতন রাজ্যশাসন নীতি আলোচিত হয়েছে এই শিলালিপিগুলিতে। এইগুলিতে বর্ণিত হয়েছে সেইসকল আচরণবিধি যাহা আচরিত হয়েছে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিগুলির প্রতি।

(৫) বিহারের গয়া জিলার অন্তঃপাতী বরাবর পাহাড়ে প্রাপ্ত গুহালিপি—এই সকল গুহালিপিগুলির মধ্যে আজীবিক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত তিনটি গুহালিপি আছে। এইগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে খুব সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ২৫৭-২৫০ অব্দের মধ্যে।

(৬) তরাই অঞ্চলের স্তম্ভগাত্রে স্থাপিত উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়—এই শিলালিপি দুইটি নেপালের তরাই অঞ্চলের দুইটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে একটি আছে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান রুম্মিনদেইয়ে এবং অন্যটি অবস্থিত আছে নিগ্‌লিভায়। দুইটি স্তম্ভই খুব সম্ভবত স্থাপিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে। এই দুইটি শিলালিপিতে অশোক তাঁহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যাঁহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন।

(৭) সপ্ত স্তম্ভলিপি—এই স্তম্ভলিপিগুলিকে চতুর্দশ শিলালিপির পরিপূরক বলা হয়। ইহারা খুব সম্ভবতঃ উৎকীর্ণ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ২৪৩-২৪২ অব্দে।

(৮) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপিচতুষ্টয়—এই লিপিগুলির প্রতিলিপি এলাহবাদ, সাঁচী (মধ্যপ্রদেশ) এবং কাঁশীর নিকটবর্তী সারনাথে পাওয়া গেছে।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাহার জন্য কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নহে, পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বৌদ্ধধর্মকে যশ ও খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাহার জন্য তাঁহার স্থান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে

অন্যতম। তিনি বৌদ্ধধর্মকে দেশে এবং বিদেশে প্রসারিত করেছিলেন এবং বিশ্বের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত করেছিলেন। ধর্মের জন্য মুক্ত হস্তে তিনি যে অর্থব্যয় করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই তাহা বিরল। কথিত আছে যে তিনি ধর্মীয় কার্যে প্রত্যহ ৫০০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও, শত রাজকার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, বৌদ্ধধর্মে উৎসর্গীকৃত তাঁহার মন বৌদ্ধধর্মের জন্য সময় ব্যয় করতে তিনি সদা ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার রাজত্বকালে ভগবান বুদ্ধের দেহভস্মের উপর ৮০,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশেই এই ধর্মীয় কার্য তিনি সম্পাদন করেছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অথবা উহার কাছাকাছি সময়ে অশোকের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কুণাল, অলৌক এবং তিবরের নাম জানা যায়। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র কুণাল যিনি জন্মান্ধ ছিলেন তিনি পাটলিপুত্রে আট বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Mahāvaṃsa, ed. W. geiger, London 1908. Tr. Turnour, Ceylon, 1896.
2. Dīpavaṃsa, ed., & Tr. H. Oldenberg, London 1879.
3. Sāmantapāsādikā, ed., J. Takakusu, 2 vols., Pali Text Society, London, 1924-27.
4. Divyāvadāna, ed. E. B. Cowell ed R. A. Neil, Cambridge, 1886.
5. Aśokāvadāna, ed., Sujit Mukhopadhyay, New Delhi, 1963.
6. Przyluski, J., La Legende de l' Eupereur Aśoka, Paris, 1923.
7. Avadānaśataka, ed., J. S. Speyer, 2 vols., St. Petersburg, 1906-9.
8. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., 1960.
9. Ṣ Chattopadhyay, Bimbisāra to Aśoka, Calcutta, 1977.
10. B. G. Gokhale, Buddhism and Aśoka, Bombay, 1949
11. R. K. Mookherji, Asoka, Delhi, 1961.
12. E. Hardy, Konig Asoka, Mainz, 1913.
13. V. A. Smith, Asoka, Oxford, 1920.
14. R. G. Basak, Aśokan Inscription, Calcutta, 1959.
15. K. L. Hazra, Royal Patronage of Buddhism in Ancient India, New Delhi, 1984.
16. Manikuntala Halder (De), Bauddhadhermer Itihās, Calcutta, 1996.

কানাইলাল হাজরা

অসোকারাম

অসোকারাম একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। মৌর্যসম্রাট অশোক পাটলিপুত্রে ইহা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তিন বৎসরের মধ্যে ইহার নির্মাণকার্য শেষ করেছিলেন। এইখানে তাঁহার ভ্রাতা তিস্স দীক্ষিত হয়েছিলেন। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উপোসথ অনুষ্ঠান পালন করতে সাত বৎসর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তখন অশোক তাঁহাদিগকে অসোকারামে তলব করে তাঁহার মন্ত্রী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভুলপথে চালিত মন্ত্রী অনেক থেরগণের মস্তকচ্ছেদ করেছিলেন যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই বৌদ্ধবিহারে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং ধম্মের সংকলন করেছিলেন। অশোক অসোকারামে প্রত্যহ ৬০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে খাওয়াতেন। শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে মহাথূপের ভিত্তিস্থাপনের দিনে অসোকারাম থেকে ৬০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন এবং তাঁহাদের দলপতি ছিলেন মিত্তিন্ন। ধম্মরক্ষিত যিনি নাগসেনের শিক্ষক ছিলেন, অশোকারামে বাস করতেন। অশোক কর্তৃক নিযুক্ত ইন্দগুত্ত থের এই বিহার নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এই অসোকারাম থেকে মহিন্দ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কাযাত্রা করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Pali Text Society, 2 vols., London, 1960.
2. Mahāvamsa, ed., W. Geiger, London, 1908. Tr. Turnour, Ceylon, 1896.
3. Samantapāsādika, ed. J. Takakusu, 2 vols., Pali Text Society, London, 1924-27.
4. Milindapañha, ed., V. Trenckner, London, 1928.

কানাইলাল হাজরা

অস্সক

নিমি জাতকে দুদীপ, মগের, সেল প্রভৃতি রাজগণের তালিকায় অস্সক রাজার নাম উল্লেখ আছে। তাঁহাদের মহান ত্যাগ সত্ত্বেও তাঁহারা প্রেত জগত অতিক্রম করে যেতে পারেন নাই। অস্সক কাশী রাজ্যের পোতলীর রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজমহিষী ছিলেন উব্বরী। এই রাণী তাঁহার খুবই প্রিয়তমা ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁহার শবদেহ শবাধারে রেখে তাঁহার বিছানার তলায় রেখেছিলেন এবং তাহার উপর শায়িত ছিলেন। তিনি সাতদিন অনাহারে ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব একজন যোগী ছিলেন হিমালয়ে এবং ঠিক এই সময়ে তিনি পোতলী ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে, রাজ উদ্যানে রাজা তাঁহাকে দেখতে এসেছিলেন কারণ তাঁহাকে বলা হয়েছিল যে যোগী তাঁহাকে উব্বরীকে দেখাবেন। বোধিসত্ত্ব উব্বরীকে তাঁহাকে দেখিয়েছিলেন। তখন তাহার জন্ম হয়েছিল উদ্যানে গোবর পোকারূপে কারণ তাঁহার নিজ সৌন্দর্যে এত বেশী মগ্ন ছিলেন যে কোন কিছু ভাল কাজ তিনি সম্পাদন করেন নাই। রাজাকে অবিশ্বাস্য দেখিয়া যোগী তাঁহাকে (উব্বরীকে)

কথা বলিয়েছিলেন এবং তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এখন তাঁহার সাথী গোবর-পোকার প্রতি অধিক যত্নবতী অস্সকের চেয়ে যিনি তাঁহার পূর্বজীবনের স্বামী ছিলেন। অস্সক তাঁহার প্রাসাদে ফিরে গেছলেন, শবদেহ দাহ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আবার বিবাহ করেছিলেন এবং ধর্মীয় জীবন যাপন করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুদিন পরে অস্সক অস্সক দেশের পোতনগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি সুজাতের পিতা ছিলেন। তিনি তাঁহার কণিষ্ঠ স্ত্রীর পুত্রকে তাঁহার রাজ্য উইল করে দিয়েছিলেন।

অস্সক জাতকে রাজা অস্সকের রাজ্য কাশীরাজ্যে উল্লেখ আছে। চুল্ল কালিঙ্গ জাতক মতে একদা দন্তপুরের কলিঙ্গ রাজার যুদ্ধের আহ্বান অস্সকের রাজা গ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেছিলেন। পরে অস্সক কলিঙ্গ রাজার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছিল। অঙ্গুত্তরনিকায়ের উল্লিখিত ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে অস্সক একটি মহাজনপদ ছিল। জনবসভ সুত্তে বর্ণিত বারটি দেশের তালিকায় এর নাম নেই। খারভেলর হাথিগুম্পা উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ আছে যে খারভেল একদা অস্সক নগরে ভয় দেখাবার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। বি. সি. লর মতে চুল্ল কালিঙ্গ জাতকের অস্মক, হাথিগুম্পা উৎকীর্ণ লিপির অসিকনগর বা অস্মকনগর এবং সুত্ত নিপাতের অস্সক ছিল একটি এবং একই জায়গা বা রাজ্য। সংস্কৃত পণ্ডিআন অশ্মকা এবং অশ্বকা দুই উল্লেখ করেছে। অসংঙ্গ তাঁহার সূত্রালংকারে অস্সকের কথা বলেছেন। মারকণ্ডেয় পুরাণে এবং বৃহৎ সংহিতায় অস্সক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বলা হয়েছে। অস্সক রাজ্যের রাজধানী পোতনকে মহাভারতের পৌদন্য বলে অনুমান করা হয়। কৌটিল্যার অর্থশাস্ত্রের টীকায় ভট্টস্বামী অস্মককে মহারাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুদিন পরে রাজা অস্সক যিনি পোতলীর অধিপতি হয়েছিলেন, তিনি এবং তাঁবার পুত্র সুজাত মহাকচ্চায়নের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলে। ভগবান বুদ্ধের সময় অস্মক রাজকে অন্ধকরাজা বলা হত।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed. V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1917.
2. Vimānavatthu with commentary, ed. H. Hardy, Pali Text Society, London, 1901.
3. Aṅguttara Nikāya, 6 vols., R., Morris, E. Hardy, C. A. F. Rhys Davids, Pali Text Society, London, 1885-1910.
4. B. C. Law, Historical Geography of Ancient India, Paris, 1954.
5. Suttanipāta, ed D Anderson and Helmer Smith, Pali Text Society, London, 1965.

6. Dīgha Nikāya, ed. T. W. Rhys, Davids, and J. E. Carpenter, 3 vols., London, 1889-1910. Tr. T. W. Rhys Davids, and Mrs. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Sacred Book of the Buddhists, London, 1899-1921.

7. Suttanipāta Aṭṭhakathā, Paramatthajotikā, ed. H. Smith, Pali Text Society, London, 1915-1918.

কানাইলাল হাজরা

অস্সক জাতক

অস্সক জাতকে রাজা অস্মকের গল্প বর্ণিত হয়েছে। ইহা একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বলা হয়েছিল যাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর স্মরণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন অস্মক।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jātaka, ed. V. Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1917.

কানাইলাল হাজরা

অস্সজি থের

অস্সজি থের ছিলেন পঞ্চবর্গিয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে পঞ্চম। যখন ভগবান বুদ্ধ ধম্মচক্কপ্পবত্তন সুত্ত ভাষণ দিচ্ছিলেন সেই সময় তিনিই ছিলেন শেষ যাঁর চক্ষুতে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং ভগবান তাঁহাকে এবং মহানামকে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সেই সময় তাঁহাদের তিনজন সহকর্মী ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি এবং অপর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অনত্তলক্খণ সুত্ত প্রচারে অরহত্ত হয়েছিলেন। তাঁহারই জন্য শারিপুত্ত এবং মোগ্গলান দীক্ষিত হয়েছিলেন। শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানে সারিপুত্ত যখন ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় অস্সজিকে রাজগৃহে ভিক্ষা করতে দেখেছিলেন এবং তাঁহার আচরণে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে তাঁহার ভিক্ষা সমাপ্ত পর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করেছিলেন। যথোপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া সারিপুত্ত অস্সজিকে তাঁহার গুরু ও তাঁহার অনুসৃত মতবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। অস্সজি প্রথমে তাঁহাকে ভাষণ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ তিনি বলেছিলেন যে বৌদ্ধসঙ্ঘে তিনি তরুণ ছিলেন। সারিপুত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেছিলেন কিছু বলবার জন্য যাহা তিনি জেনেছিলেন। অস্সজি তখন ভাষণ দিয়েছিলেন।

"যে ধম্মা-হেতুপ্পভবা তেসং-হেতুং তথাগত আহ
তেসং-চ-যো-নিরোধো এবং-বাদি-মহাসমনো-ত্তি।"

"সকল ধর্ম যাহা করাণ হইতে উদ্ভূত, তথাগত তাহা দেসনা করেন এবং এগুলির নিরোধের কথাও তিনি প্রচার করেন। মহাশ্রমণ এইরূপ ধর্মকেই ধরিয়া আছেন।"

সারিপুত্ত তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন এবং খুশী মনে মোগ্গল্লানের কাছে গিয়ে বলেছিলেন তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। সারিপুত্ত অস্সজিকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি সব সময় তাঁহাকে নতমস্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি জানাতেন। একদিন অস্সজি ভিক্ষার জন্য বৈশালী যাচ্ছিলেন তখন নিগন্থ সচ্চক তাঁহাকে দেখেছিলেন এবং ভগবান বুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত শিষ্য। অস্সজি তাঁহাকে অনত্তলক্খণ সুত্তে অর্ন্তভুক্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত অংশে তাঁহাকে দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধকে আরোপিত মতবাদগুলি সহজেই খণ্ডন করতে সমর্থ হবেন নিশ্চিত হয়ে সচ্চেক লিচ্ছবীদের এক বিরাট দল নিয়ে ভগবানের কাছে গেছলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করেছিলেন। এটা চুল সচ্চক সুত্ত প্রচারের উলপক্ষ ছিল। সংযুক্ত নিকায়ে বর্ণনা আছে যে যখন অস্সজি রাজগৃহে গুরুতরভাবে পীড়িত ছিলেন সেইসময় ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে দেখতে গেছলেন। তিনি ভগাবনকে বলেছিলেন যে তাঁহার শ্বাস গ্রহণে এবং ত্যাগে অসুবিধার জন্য তিনি ধ্যানেতে প্রবেশ করতে পারছিলেন না এবং মনের ভারসাম্য লাভ করতে পারেন নাই। ভগাবন বুদ্ধ তাঁহাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন অনিত্ত এবং অনাত্মা চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Vinaya Piṭaka, ed. H. Oldenberg. Pali Text Society, London, 1879. Tr. T. W. Rhys Davids, and H. Odenberg, Sacred Book of the East, Oxford, 1881-85. Tr. I. B. Horner, The Books of Discipline, vol. IV, London, 1951.
2. Dhammapada Aṭṭhakathā, I-V, ed. H. Smith, H. C. Norman, L. S. Talaing, Pali Text Society, London, 1906-1915. Tr. Buddhist Legends, by E. Watson Burlingame, Harvard Oriented Series, vol. 28-30. Cambridge Mass. 1921.
3. Papañcasūdani, ed. J. H. woods and D. Kosambi, Pali Text Society, London, 1922-38.
4. Majjhima Nikāya, I-VI, ed. V. Tranckner, R. Chalmers, Mrs. Rhys Davids, London, 1888-1925.
5. Saṁyutta Nikāya, I-VI, ed., L. Fee and Mrs. Rhys Davids, Pali Text Society, London, 1884-1904.
6. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অস্সগুত্ত থের

অস্সগুত্ত থের ভত্তনিয় আশ্রমে বাস করতেন। নাগসেনের শিক্ষক বর্ষা কালে অস্সগুত্তর সহিত বাস করবার জন্য নাগসেনকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বৌদ্ধধর্মের পূজারিণী একজন বৃদ্ধা ছিলেন তিনি ত্রিশ বৎসর অস্সগুত্তের দেখাশুনা করতেন। যখন তাঁহাকে ধর্মোপদেশ

দিচ্ছিলেন সেই সময় নাগসেন সোতাপন্ন হয়েছিলেন। যখন নাগসেন তাঁহার পড়াশুনা সমাপ্ত করেছিলেন, অস্সগুত্ত তখন তাঁহাকে পাঠিয়েছিলেন পাটলিপুত্রে ধম্মরক্ষিতের কাছে। অস্সগুত্ত মহাসেনকে দেবলোক পরিত্যাগ করে মনুষ্য জগতে নাগসেনরূপে জন্মগ্রহণ করতে শক্রর সহিত মধ্যস্থতা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় বৌদ্ধসঙ্ঘের তিনি দলপতি ছিলেন কারণ তিনি মিলিন্দর বিতর্কগুলি দ্বারা উত্থাপিত বিপদের আলোচনার জন্য যুগন্ধরে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। দীঘনিকায়ের টীকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়ের টীকায় এবং বিভঙ্গের টীকায় তাঁহাকে একজন কল্যাণমিত্তের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন করুণার পাত্র এবং তাঁহার সঙ্গ সমস্ত কু-প্রকৃতিগুলিকে ধ্বংস করে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Milinda Pañha, ed. V. Trenckner, Pali Text Society, London, 1880. Tr. T. W. Rhys Davids, Sacred Books of the East. Oxford, 1890-1994.
2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.
3. Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā, I-III, ed. T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter, W. Stede, Pali Text Society, London, 1886-1932.
4. Aṅguttara Nikāya Aṭṭhakathā, I-V. ed., M. Walleser, H. Kopp. Pali Text Society, London, 1924-56.
5. Vibhaṅga Aṭṭhakathā, A.P. Buddhadatta, Pali Text Society, London, 1923.

কানাইলাল হাজরা

অস্সলায়ন সুত্ত

অস্মলায়ন যখন ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেই সময় তাঁহার সহিত ভগবান বুদ্ধের আলোচনা অস্সলায়ন সুত্তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অস্সলায়ন ছিলেন সাবত্থির ষোল বৎসর বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ। তিনি বেদ এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। শহরে বসবাসকারী ৫০০ শত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে আলোচনা করতে এবং তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করতে বলেছিলেন। বারবার অনুরোধ করার পর তিনি সম্মত হয়েছিলেন কারণ তিনি বলেছিএলন যে গৌতম একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছে গেছলেন এবং ব্রহ্মার বৈধ সন্তানগণ হচ্ছেন ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলে দাবী করেন তাহা সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের মতবাদ জানতে চেয়েছিলেন। ভগবান তাঁহাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন যে এইরূপ যথার্থতাগুলি হচ্ছে ভিত্তিহীন এবং যে ধর্ম পবিত্রতা আনয়ন করে তাহা চারটি শ্রেণীর যে কোন একটি শ্রেণী দ্বারা অনুশীলন করা যেতে পারে। অস্সলায়ন চুপচাপ বসেছিলেন এবং ধর্মোপদেশের শেষে তিনি বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন ভগবান বুদ্ধ অতীতের এক গল্প বলেছিলেন যেখানে অসিত দেবল একই মতবাদী ব্রাহ্মণদের পরাজিত

করেছিলেন, তখন অস্সলায়ন শান্তি লাভ করেছিলেন এবং ভগবান বুদ্ধের ধর্মমতের ব্যাখ্যার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের অনুগামী বলে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। বুদ্ধঘোষ বলেছেন যে তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন গোঁড়া ভক্ত হয়েছিলেন এবং নিজের বাসস্থানে একটি চৈত্য নির্মান করে পূজা করতেন। তাঁহার বংশধরগণও তাঁহাদের বাড়ীতে চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। অস্সলায়নকে মহাকোট্টিতের পিতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁহার স্ত্রী ছিলেন চন্দবতী। সুত্ত নিপাতের টীকায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণের তালিকায় অস্সলায়নের নাম পাওয়া যায়।

মজ্ঝিম নিকায়ের অস্সলায়ন সুত্তে বর্ণনা আছে যে ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের মতবাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা সকল অপর শ্রেণীগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সুত্ত যোন-কম্বোজ অঞ্চল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে কারণ এখানে বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ অস্সলায়নকে জাতি-প্রথা সম্বন্ধীয় এবং বর্ণ বা জাতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করছিলেন যে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দাবীর কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Majjhima Nikāya, ed., R. Chalmers and V. Trenckner, 4 vols., Pali Text Society, London, 1887-1902.
2. Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā, Papañcasūdanī, vols. I-V, ed., J. H. Woods, D. Kosambi, I. B. Horner, Pali Text Society, London, 1922-1938.
3. Theragāthā commentary, ed., Suriyagoda sumangala Thera and Mabada Saṅgharatana Thera and finally revised by Mabagoda Siri Narissara Thera, Hewavitarama Bequest Series, Colombo 1918.
4. Apadāna, ed., Mary E. Lilley, Pali Text Society, London, 1925-27.
5. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., Pali Text Society, London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অহিংসক

অঙ্গুলিমালের পূর্বের নাম ছিল অহিংসক। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুত্ব জীবনের বিংশতিতম বর্ষকালে এই দস্যুকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে তিনি অরহন্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগ্গব এবং কোসলের রাজার পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন মন্তানী। তিনি চোরদের নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁহার জন্মের রাত্রিতে শহরের সকল বর্ম-কিরণ দিয়েছিল। রাজার বর্মও কিরণ দিয়েছিল। পূর্বলক্ষণ কাহাকেও ক্ষতি করেছিল না বলে এই বালকের নাম হয়েছিল অহিংসক। তক্ষশিলায় (তক্কসিলায়) তিনি তাঁহার শিক্ষকের বাড়ীতে খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহপাঠীগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে শিক্ষকের মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছিলেন এবং শিক্ষক তখন তাঁহাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণা হিসাবে মানুষের ডান

হাতের এক হাজার আঙ্গুল দাবী করেছিলেন। উহার ফলে, অহিংসক কোসলের জালিনী জঙ্গলে ভ্রমণকারীদের খোঁজে পথে ওত পেতেছিলেন এবং তাহাদের হত্যা করেছিলেন এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে একটি আঙ্গুল নিয়েছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাপ্ত আঙ্গুলের হাড় দিয়ে একটি মালা করেছিলেন গলায় ঝুলিয়ে রাখবার জন্য এবং এই কারণে নাম হয়েছিল অঙ্গুলিমাল।

গ্রন্থপঞ্জি

2. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

অহিগুণ্ডিক জাতক

অহিগুণ্ডিক জাতক বর্ণিত হয়েছে বেনারসের এক সাপ-বশীভূতকারী এক ব্যক্তির গল্প। তাহার একটি পোষা বাঁদর ছিল। একদা উৎসবের সময় বাঁদরটিকে এক শস্য-উৎপাদকের (বোধিসত্ত্ব) সহিত ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সাপের খেলায় অর্থ উপার্জনের জন্য যাত্রা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব বাঁদরকে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। সাত দিন বাদে সাপ-বশীভূতকারী ব্যক্তি মাতাল হয়ে ফিরে এসেছিলে এবং বাঁদরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল। যখন ঐব্যক্তি ঘুমিয়েছিল তখন বাঁদর পালিয়ে গেছিল এবং ফিরে আসতে অস্বীকার করেছিল। একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধভিক্ষুদ্বারা দীক্ষিত এক নবীন শিষ্যকে উল্লেখ করে এই গল্প বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু বালকের সহিত খারাপ ব্যবহার করেছিলেন এবং বালক ক্রোধে ভিক্ষু সঙ্ঘ ত্যাগ করেছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু তাহাকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এইরূপ ঘটনা দুইবার ঘটেছিল। বালক ফিরে আসতে অস্বীকার করেছিল। নবীন শিষ্যকে গল্পের বাঁদরের সহিত চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.
2. Jātaka, Fausboll, 6 vols., London, 1877-97. Tr. E. B. Cowell, 6 vols., Cambridge, 1895-1917.

কানাইলাল হাজরা

অহিরিক

অহিরিক অকুশল চেতনার একটি অংশ। লাভহীন মানসিক বিষয় উৎপাদক (অকুশল-চেতসিক), নীতিজ্ঞানশূন্য, অপরিণামদর্শী, নির্লজ্জ, অনভিজ্ঞ কাজের উৎপাদক অহিরিক। মন কখনো কোন খারাপ কর্মের কথা চিন্তা করতে পারে না যদি না অহিরিক ভাবনা উপস্থিত

থাকে। অনোত্তপ্প (চিন্তাহীন দোষারোপ), উদ্‌ধচ্চ (উদ্বেগ) এবং মোহ (বিভ্রান্তি) প্রভৃতি অকুশল কর্মের চিন্তাধারা অহিরিক ভাবনার সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হয়ে মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এদের সংযুক্ত মানসিক মিশ্রণকে সব্বাকুশল সাধারণ-চেতসিক বলে।

অহিরিক মানসিক অবস্থায় ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি, বিবেকের দংশন, অপছন্দ বা ঘৃণা করা, মন্দের ভাল বিচার করার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই অবস্থায় মনে কোন ভয় থাকে না বা ব্যভিচার থেকে মুক্তির চিন্তাও (কায়দুচ্চরিতাদীহি অজিগুচ্ছন, বিসুদ্ধিমগ্গ, পৃঃ ৩৯৬) থাকে না। এর উদ্ধততার বা নির্লজ্জতার জন্য একে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol. 2, Fascicle I, P. 293 ; Brahmachari, S. An Introduction to Abhidhamma, p. 54.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

অহোগংগা

অহোগংগা ছিল উচ্চতর গংগায় অবিস্থত উত্তর ভারতের একটি পর্বত। যেখানে সমভূত সাণবাসী নামে থের কিছুদিন বাস করেছিলেন এবং যেখানে যশ কাকণ্ডপুত্ত তাঁহাকে দেখেছিলেন। বেসালীর বৌদ্ধভিক্ষুদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহা আলোচনা করতে অরহত্তগণ ঐখানে মিলিত হয়েছিলেন। এবং এই আলোচনায় পশ্চিম দেশ এবং অবন্তি-দক্ষিণাপথ হইতে আগত বৌদ্ধভিক্ষুগণ উপস্থিত ছিলেন। মোগ্গলিপুত্র তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির পূর্বে সাত বৎসর একাকি অহোগংগায় অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি একটি ভেলায় করে অহোগংগা থেকে পাটলিপুত্র এসেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.
2. Vinaya Piṭaka, ed., H. Oldenberg, 5 vols., Pali Text Society, London, 1964.
3. Mahāvamsa ; ed., W. Geiger, London, 1908, Tr Turmour, Ceylon, 1806.

কানাইলাল হাজরা

আকংখেয্য সুত্ত

মজ্ঝিম নিকায়ের আকংখেয্য সুত্তটি জেতবনে প্রচারিত হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণদের সীল, পাতিমোক্ষ এবং সিক্ষাপদের নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালন করতে বলেছিলেন। সাধারণতঃ বৈষয়িক লোগগণ যশ, খ্যাতি এবং ক্ষমতার কথা সর্বদা চিন্তা করেন কিন্তু এগুলি কখনই মঙ্গলময় নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সৎ আচরণের নিয়মগুলি ভালভাবে

পালন এবং অভ্যাস করা উচিত এবং ধীর এবং সংযতভাবে জীবনযাপন করা উচিত। এই সুত্ত উল্লেখ করেছে অরূপ বিমোক্ষ, তিনটি সংযোজন, সমাধি, বিপশ্যনা ইত্যাদি। স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত এবং প্রচারিত এই ধর্মভাষণ উদাহরণ হিসেবে এই সুত্তে উল্লেখ হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Majjhima Nikāya, ed., R. Chalmers and V. Trenckner, 4 vols., Pali Text Society, London, 1887-1902.
2. Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā, vols. I-V, ed., J. H. Wood, D. Kosambi, I. B. Horner, Pali Text Society, London, 1922-1938.
3. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.

কানাইলাল হাজরা

আকাসগংগা

আকাসগংগা নদী অনোতত্ত হ্রদ হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ধাপে নানাবিধ নামে পরিচিত হয়েছিল। এই নদীর যে অংশ ৬০ লিগ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল তাহাই আকাসগংগা নামে পরিচিত হয়েছিল। আকাসগংগার নিম্নমুখী প্রবাহের মতন ছিল ভগবান বুদ্ধের ধর্মভাষণের বিবিধ বিষয়। চতুর ধর্মপ্রচারকদের বাগ্মিতাও এইরূপ ছিল। আকাশগংগা যে স্থানে পৃথিবীতে পতিত হয়েছিল সেই স্থানের মাটি খুব সুন্দর ছিল। ইহার বিস্তৃতি ছিল প্রায় ত্রিশ যোজন এবং এই সুন্দর মাটিকে বলা হয় 'মাখন মাটি'। শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুরের মহাথূপের ভিত্তি স্থাপনের উপর মাটি ছড়িয়ে দেবার জন্য অরহন্ত সামনেরগণ এই মাটি এনেছিলেন। যে স্থানে ইহা পাওয়া গেছে সেইগুলোকে বলা হয় তিন্তসিসকোল।

গ্রন্থপঞ্জি

1. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols, Pali Text Society, London, 1960.
2. Aṅguttara Nikāya Aṭṭhakathā, Manorathapūranī, vols., I-V, ed., M Walleser, H. Kopp. Pali Text Society, London, 192456.
3. Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā, Papañcasūdanī, vols. I-V, ed., J. H. Woods, D. Kosambi, I. B. Horner, Pali Text Society, London, 1922-1938.
4. Suttanipāta commentary, 3 vols., ed., Helmer Smith, Pali Text Society, London, 1965-1966.

5. Mahāvamsa, ed., W. Geiger, London, 1908, Tr. Turnour, Ceylon, 1896.

6. Mahāvamsa Aṭṭhakathā. Vols. I-II, ed. G. P. Malalasekera, Pali Text Society, London, 1935.

7. Dhammapadaṭṭhakathā, Eng. Tr. Buddhist Legends by Engene watson Burlingame, Harverd Oriental Series, vols. 28-30, Cambridge Mass. 1921. C Dursiselle, Tr. in the periodical Buddhism vol. II. Rangoon, 1905-1908.

8. Dhammapada Aṭṭhakathā, vols. I-V, ed., H. Smith, H. C. Norman, L. S. Talaing, Pali Text Society, London, 1906-1915.

কানাইলাল হাজরা

আগম

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। সিংহল, ব্রহ্ম্য, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ভাষায় তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিব্বতী, চীনা, জাপানী ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি ভাষাতেও বৌদ্ধ সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ আগম শাস্ত্রসমূহ যা পালিতে 'নিকায়' হিসাবে পরিচিত। পালি নিকায় অর্থে আমরা বুঝি সংগ্রহ বা সংকলন, শ্রেণী, রাশি, সমষ্টি প্রভৃতি। 'আগম' শব্দটির অর্থ 'পরম্পরাগত' মতবাদ বা প্রথা', 'পরম্পরাগত ধর্ম', বা 'ধর্মীয় শাস্ত্র'।

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে সমস্ত বাণী দেশনা করেছিলেন হীনযান সম্প্রদায় পরবর্তীকালে শাস্ত্রাকারে দীঘ (দীর্ঘ প্রমাণের সুত্ত), মজ্‌ঝিম (মধ্যম আকারের সুত্ত), সংযুক্ত (গুচ্ছ আকারের সুত্ত), অঙ্গুত্তর (সংখ্যাদ্যোতক শাস্ত্র) ও খুদ্দক (ছোট ছোট সুত্ত) এই পাঁচটি নিকায় এ সংকলন করে রেখেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত ও চীনা ভাষায় অনূদিত 'নিকায়' শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত 'আগম' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—দীর্ঘাগম (দীর্ঘাকার সূত্র), মধ্যমাগম (মধ্যমাকার সূত্র), সংযুক্তাগম (সংমিশ্রিত শাস্ত্র) ও একোত্তরাগম (সংখ্যাক্রম শাস্ত্র)। পঞ্চম নিকায়টি চীনা বা তিব্বতী ত্রিপিটকের মধ্যে পাওয়া যায় না। মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত দীর্ঘাগমের (সংগীতিসূত্র, আটানাটীয়সূত্র), মধ্যমাগমের (উপালিসূত্র, শুকসূত্র) এবং একোত্তরাগমের খণ্ডিত বিভিন্ন সূত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাই দিব্যাবদানে আমরা 'আগমচতুষ্টয়ম' শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখতে পাই।

পালি 'নিকায়' ও চীনা ভাষায় অনূদিত 'আগম' শাস্ত্রের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে অনেকসি বলেছেন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে এক, কিন্তু উভয়ের বিন্যাসগত পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত (JRAS 1901, p. 895)।

দীর্ঘ নিকায়-এ মোট ৩৪টি সুত্তকে ৩টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘাগমে ৩০টি সূত্র আছে এবং একে ৪টি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত একটি খণ্ড

সংযোজিত হয়েছে। ৪টি খণ্ডের প্রথমে ভাগটি চারটি দীর্ঘ-নিদান, ২য় খণ্ডটি ১৫টি নাতিদীর্ঘ নিদান, ৩য় খণ্ডটি ১০টি সূত্র ও ৪র্থ খণ্ডটিতে ১টি সূত্র যা জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি বিষয়ক ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মজ্‌ঝিম নিকায় মোট ১৫২টি মধ্যম আকারের সুত্ত নিয়ে সংকলিত হয়েছে। সাধারণভাবে বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে সুত্তগুলিকে ১৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। সমগ্র নিকায়টি ৫০টি করে সুত্ত নিয়ে মোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। মধ্যমাগম অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত, এর ৪টি খণ্ড, ১৮টি অধ্যায় ও ২২২টি সূত্র আছে। ২২২টি সূত্রের মধ্যে কেবলমাত্র ৯৬টি মজ্‌ঝিমনিকায় এর সঙ্গে মিল দেখতে পাওয়া যায়। সংযুক্ত বা গুচ্ছ আকারে সংযুক্ত-নিকায় এর সুত্তগুলি গ্রথিত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত ২৮৮৯টি সুত্ত ৫৬টি 'সংযুক্তে' বিভক্ত এবং সংযুক্তগুলি আবার পাঁচটি 'বর্গে' বিভক্ত। সংযুক্তাগম ১০টি সংযুক্তে ও ৪টি খণ্ডে বিভক্ত যার বহুসংখ্যক সূত্র সংযুক্ত-নিকায় ও অন্যান্য পালি সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সগাথবগ্‌গ মোটামুটিভাবে অভিন্ন কিন্তু নিদানবগ্‌গ সম্পূর্ণ বিপরীত। অঙ্গুত্তর-নিকায় ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে আবার কতকগুলি বর্গ আছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'নিপাত'। এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে বিষয়বস্তুগুলিকে এক একটি নিপাতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মোট ২৩০৮টি সুত্ত আছে। একোত্তরাগমে মোট চারটি খণ্ড এবং ৫২টি অধ্যায় এবং মাত্র ৪৭২টি সূত্র আছে। একোত্তরাগম ও অঙ্গুত্তর-নিকায় এর মধ্যে খুব অল্প সামঞ্জস্য দেখা যায়। এর মূল কারণ সম্ভবতঃ বেশীরভাগ অঙ্গুত্তর-নিকায় এর সুত্তগুলি মধ্যমাগম ও সংযুক্তাগমে স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিষয়গত ও সংকলনগত দিক দিয়ে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় (C. Akanuma, The Comparative Catalogue of Chinese Āgamas and Pāli Nikāyas).

অঙ্গুত্তর-নিকায়টি আগম সাহিত্যে অনুপস্থিত। কেবলমাত্র কিছু কিছু অংশ আগমশাস্ত্রে অনূদিত হয়েছে। পরবর্তীকালে হিউয়েন-সাঙ্ অনূদিত নন্দিমিত্রাবদানকে চীনাভাষায় ক্ষুদ্রাগম হিসাবে গণ্য করা হয়।

[দ্রষ্টব্য : Soothill, W. E. and Hodous, L. ; comp. , A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, p. 286 ; Malalasekera, G. P. ed., Encyclopaedia of Buddhism, vol. I, Fascicle I, pp. 241-8.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

আজঞ্‌ঞ জাতক (আজন্য জাতক—২৪)

শাস্তা জেতবনে কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেন। শাস্তা তাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক বললেন, "পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা আহত হয়ে বীর্য ত্যাগ করেন নি।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

Ājañña is the contracted form of ājāniya.
Ājānīya (ājāniya) ājāti - birth, good birth.

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর অধিপতি ছিলেন তখন সাতজন রাজা তাঁর রাজ্য অবরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মদত্তের একজন রথী নিজের রথে একই অশ্বীর গর্ভজাত দুইটি সৈন্ধব ঘোটক

সংযোজিত করে নগর হতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক একে একে বিপক্ষদিনের ছয়টি বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে জ্যেষ্ঠ রথ ঘোটকটী আহত হয়েছিলেন। তখন রথী তাকে রথ হতে মুক্ত করে, এবং তার সাজসজ্জা খুলে দেয়। সে এক পার্শ্বে ভর দিয়ে শয়ন করলে তার শরীর হতে বর্ম্মাদি উন্মোচনপূর্ব্বক অপর একটি অশ্বকে সজ্জিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। তা দেখে অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব, ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সেরূপ চিন্তা করে রথীকে আহ্বান পূর্ব্বক একটি গাথা পাঠ করেছিলেন। এ কথা শুনে রথী বোধিসত্ত্বকে ধরে তুলেছিলেন। তাঁকে পুনরায় রথে সংযোজন পূর্ব্বক সপ্তক বল প্রকোষ্ঠ ভেদ করলেন, সপ্তম রাজাকে বন্দী করে রাজদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এবং সেখানে বোধিসত্ত্বকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব এক পার্শ্বে ভর দিয়ে শয়ন করলেন এবং ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সেই ভাবে রাজাকে উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করলেন। তার মৃতদেহ যথাযথ সম্মান প্রদর্শনসহ দাহ করা হয়। রাজা রথীকে নানা সম্মানে ভূষিত করলেন এবং যথাধর্ম প্রজাপালন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে চলে গেলেন। তখন স্থবির আনন্দ ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং সেই জ্যেষ্ঠ অশ্ব ছিল সম্যকসম্বুদ্ধ।

বেলা ভট্টাচার্য

আটানাটিয় সুত্ত

এটি দীর্ঘনিকায়ের বত্রিশ নম্বর সূত্র। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় চারজন মহারাজা সুবৃহৎ যক্ষসেনা, গন্ধর্ব্ব সেনা, কুম্ভণ্ড সেনা এবং নাগ সেনা দ্বারা চারদিক রক্ষিদল, সেনাব্যূহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করে রাত্রি অবসানে উজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্ব্বত উদ্ভাসিত করে ভগবান তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানকে বললেন, যক্ষগণ ভগবানের প্রতি প্রসন্ন এবং অপ্রসন্ন উভয়রূপ যক্ষই আছে তন্মধ্যে অপ্রসন্নের সংখ্যাই অধিক। ভগবান পঞ্চশীল সম্পর্কে উপদেশ দেন কিন্তু সংখ্যাধিক যক্ষ ঐ সকল শীল পালন করে না। ভগবানের শিষ্যগণ দূর অরণ্যে বাস করেন তথায় যক্ষগণও বসবাস করে ফলে ভগবানের উপদেশে তারা শ্রদ্ধাহীন। যাতে সেই যক্ষগণ শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য ভগবান যেন আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্র ঘোষণা করেন। অনন্তর মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানের সম্মতি অবগত হয়ে সেই সময় আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। এই সূত্রে দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দেবতাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সূত্রটির প্রারম্ভে সাতজন বুদ্ধের নাম উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম হলেন বিপস্‌সি। এইরূপে সিখি, বেস্‌সভূ, ককুসন্ধ, কোনাগমন, কস্‌সপ ও অঙ্গীরস-এর নাম পাওয়া যায়। প্রায় একচল্লিশটি দেবতাদের নাম এখানে পাওয়া যায়। আটানাটিয় সূত্রে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাদের অনিষ্ট দূর করার জন্য ও সাচ্ছন্দ্য বিহারের জন্য এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্রটি খুবই অর্থপূর্ণ। এতে দেবতাদের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করবার জন্য শিষ্যদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রটি পরিত্রাণ সূত্ররূপে বৌদ্ধরা পাঠ করে থাকে। এই সূত্রটিকে বর্ত্তমানে পরিত্ত বলা হয়। সিংহলে পরিত্ত

উৎসবের উপসংহারে এই সূত্রটি আবৃত্তি করা হয় বিশেষ করে কেউ অসুস্থ হলে এই সূত্রটি পাঠ করা হয়। মিলিন্দ প্রশ্নে পরিত্তর মধ্যে এই নামটি পাওয়া যায়।

[দ্রষ্টব্য : (১) গৌতমবুদ্ধকে বলা হয় "অন্দীরস" শব্দ জ্যোতির অধিবচন। দীঘনিকায়, ভিক্ষুশীলভদ্র, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৭১-১৮১]

আতুম থের (আতুম স্থবির—৭২)

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে ৯১ কল্প পূর্ব্বে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বিপশ্বী ভগবানের সময় তিনি একজন গৃহী ছিলেন। একদা বিপশ্বী ভগবানকে গমন করতে দেখে সুগন্ধ জল ও সুগন্ধ চূর্ণ দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল আতুম। সাবালক হলে তাঁর মা স্থির করে তার বিবাহ দেবেন। তিনি পূর্বকৃত কুশল প্রভাবে ভিক্ষুদের নিকট গমন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর মা তাঁকে গৃহে ফেরানোর জন্য প্রলোভিত করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি মাতাকে অবকাশ না দিয়ে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। এইরূপে গাথা বলতে বলতে ষড়াভিজ্ঞ হলেন। তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। অর্হত্ত্ব লাভ করেও তিনি গাথা ভাষণ করতেন। বাঁশঝাড়ে তরুণ বংশাঙ্কুর শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হয়ে উঠলে বাঁশঝাড় হতে বের করা যেমন দুষ্কর হয়, তেমন তাঁর জন্য ভার্য্যা আনয়ণ করলে শাখাস্বরূপ পুত্রকন্যাদির কারণে গৃহবাস হতে নিষ্ক্রমণ করা দুষ্কর হত।

একত্রিংশ কল্প পূর্বে তিনি সুগন্ধ নামে রাজা রূপে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ আতুম থের এবং অপদানে উল্লিখিত গন্ধোদকিয় থের একই ব্যক্তি। (অপদান i পৃষ্ঠা, ১৫৭-১৫৮)

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, vol. I. page, 243, থেরগাথা, পৃষ্ঠা, ৯৩-৯৪]

বেলা ভট্টাচার্য

আদিচ্চোপট্ঠান জাতক (আদিত্যোপস্থান জাতক—১৭৫)

এক দুষ্ট মর্কট গ্রামবাসীদিগকে ভুলাবার জন্য তপস্বী সাজিয়া সূর্য পূজা করলো। বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীদিগকে তার দুষ্ট প্রকৃতির কথা বললেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর বহু শিষ্য ছিল। তিনি এদের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বসবাসের পর একবার লবন ও অম্ল সেবনের জন্য পর্ব্বত হতে অবতরণ করে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে এক পর্ণশালায় বাস করতে লাগলেন। ঋষিগণ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বের হয়ে যেতেন, তখন এক দুষ্ট মর্কট আশ্রমে প্রবেশ করে পর্ণশালায় তৃণ

তুলে ফেলত, কলসীগুলো হতে জল ফেলে দিত, কমণ্ডলগুলো ভেঙ্গে ফেলত এবং অগ্নিশালায় মলত্যাগ করতো।

বর্ষান্তে ঋষিগণ হিমালয়ে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। এই সংবাদে গ্রামবাসীগণ তাঁদের অনুরোধ জানায় পরদিন তাঁরা যেন তাদের প্রদত্ত ভিক্ষাগ্রহণ করেন। পরদিন পর্যাপ্ত ভোজ্যবস্তু নিয়ে গ্রামবাসীগণ উপস্থিত হলে ঐ মর্কট চিন্তা করে দেখল সে যদি কপটতার আশ্রয় নিয়ে গ্রামবাসীদের প্রসন্ন করতে পারে তাহলে সেও খাদ্য সামগ্রীর অংশ পাবে। এই ভেবে সে পূত তপস্বীর বেশ ধারণ করে সূর্যপ্রণতঃ অবস্থায় রইল। তাকে দেখে গ্রামবাসীগণ প্রতারিত হয়ে ভাবল পুণ্যাত্মাগণের সংস্পর্শে সকলেই পুর্ণলাভ করে এবং এই ভাবনার ফলে তারা মর্কটের উদ্দেশ্যে একটি প্রশস্তি গাথা গাইল। এই দেখে বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীগণের কাছে মর্কটের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করলেন এবং দুষ্ট মর্কটের অপকীর্ত্তির কথা প্রকাশ করলেন। এসব শুনে গ্রামবাসীগণ মর্কটকে লাঠি ও পাথর দ্বারা প্রহার করল এবং ঋষিদের ভিক্ষা দিয়ে চলে গেল। ঋষিরাও অতঃপর হিমালয়ে প্রস্থান করলেন ব্রহ্মলোকপরায়ণ হলেন।

সমাধানে বুদ্ধ বলেছেন, তখন এই ভণ্ড ছিল সেই মর্কট, বুদ্ধ শিষ্যরা ছিল সেই সমস্ত ঋষি এবং আমি ছিলাম তাদের শাস্তা।

[দ্রষ্টব্য : জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪-৪৫

Jātaka, Fausboll, vol. II, pp., 72-73, Dictionary of Pali Proper Names G. P. Malalasekera, vol. I, Page, 246]

বেলা ভট্টাচার্য

আদিত্ত জাতক (আদীপ্ত জাতক, নং—৪২৪)

শাস্তা যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন কোশলরাজ তখন অসাধারণ দান করেছিলেন। শাস্তা তৎসম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন।

বহুপূর্বে সৌবীর দেশে রোরব নগরের রাজা ছিলেন ভরত। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল ছিলেন ও বহুবিধ দানাদির দ্বারা তাঁর প্রজাগণকে প্রতিপালন করতেন। তাঁর প্রধান মহিষী সমুদ্রবিজয়া পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানে অগ্রগণ্যা ছিলেন। একদিন রাজার মনে হল তিনি যা দান করনে তা ভোগ করে অযোগ্য লোভী গ্রহীতারা। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি প্রত্যেকবুদ্ধগণকে যথাবিধ দান করবেন। কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধগণ হিমবন্তবাসী। তাঁদের দানগ্রহণের জন্য কিভাবে আমন্ত্রিত করা যায়। তাঁর এই অভিলাষের কথা তিনি সমুদ্রবিজয়ার কাছে ব্যক্ত করলেন। মহিষী তাঁকে অশ্বস্ত করে বলেন শীল ও সত্যবলে তাঁরা পুষ্প প্রেরণ করে ঐসব প্রত্যেকবুদ্ধগণকে নিমন্ত্রণ জানাবেন এবং তাঁদের আগমন ঘটলে অষ্টবিধদানে তাঁদের আপ্যায়িত করবেন। রাজা প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন ও ঘোষণা করেন সকলকে শীলরক্ষা করতে হবে। অতঃপর তিনি ও তাঁর আত্মীয়বর্গ প্রয়োজনীয় কৃত্যাসাধনান্তে জাতীপুষ্পপূর্ণ একবিধ স্বর্ণনির্মিত ফুলের সাজি হাতে নিয়ে প্রাসাদ অঙ্গনে উপস্থিত হলেন ও সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হয়ে রাজা পূর্বদিকে দৃষ্টি দিয়া অর্হৎদিগকে প্রণাম করে তাঁদের ভিক্ষাগ্রহণের জন্য মিনতি করলেন। যেহেতু

পূর্বদিকে প্রত্যেকবুদ্ধগণ থাকেন না সেজন্য রাজার প্রার্থনা বিফল হল। পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটল। চতুর্থদিবসে উত্তরদিকে তাকিয়ে উত্তরহিমালয়বাসী প্রত্যেকবুদ্ধগণকে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পুষ্প নিক্ষেপ করলেন। ঐসব নিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশি গুহাবাসী পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধগণের উপর পতিত হল। চিন্তা করে তাঁরা জানলেন রাজা তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে থেকে তাঁরা সাতজনকে নির্বাচন করে রাজাকে অনুগ্রহ করতে বলেন। ঐ সাতজন আকাশপথে এসে রাজার নিকট উপস্থিত হলে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন। প্রণত হয়ে এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে রাজা তাঁদের প্রভূত দানে আপ্যায়তি করলেন। ছদিন এই ভাবে ঐ সপ্ত প্রত্যেকবুদ্ধগণকে সেবা করার পর সপ্তমদিনে সর্বপরিষ্কারদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। স্বর্ণনির্মিত মঞ্চ প্রভৃতি সজ্জিত করে রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণের সামনে শ্রমণ গ্রহণযোগ্য ত্রিচীবরাদি বস্ত্র এনে তাঁদের অনুরোধ জানান সেগুলি গ্রহণ করতে। রাজা ও রাণীর প্রণামান্তে তাঁরা ভোজন সমাপ্ত করলেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি সঙ্ঘ স্থবির ছিলেন তিনি দান অনুমোদন করার সময় দানের মাহাত্ম্য কীর্তন করে একটি গাথা রচনা করে রাজাকে অপ্রমত্ত থাকতে উপদেশ দিলেন। এরপর প্রাসাদের শীর্ষদেশ বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আকাশপথে তিনি স্বনিবাসে প্রত্যাগমন করলেন। প্রদত্ত পুরস্কারগুলিও সেই সঙ্গে গুহায় এসে পড়ল। রাজা ও রানী এসব ঘটনায় নিরন্তর সন্তোষ লাভ করলেন। এরপর অন্যান্য প্রত্যেকবুদ্ধগণও প্রকৃত দানের মহিমা এবং নিবারণের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করে প্রত্যেকে এক একটি গাথা উপহার দিয়ে পুরষ্কার সমূহসহ স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা ও রাণী আমরণ দান ধর্ম পালন করে স্বর্গলাভ করেন।

তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন। রাহুল মাতা ছিলেন সমুদ্রবিজয়া এবং বক্তা ছিলেন রাজা ভরত।

বেলা ভট্টাচার্য

আদিত্তপরিযায় সুত্ত (আদীপ্ত পর্য্যায় দেশনা সূত্র)

ভগবান বুদ্ধ উরুবেলায় অবস্থান করে গয়াশীর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, তার সঙ্গে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁরা সকলেই জটিল ছিলেন। গয়ায় গয়াশীর্ষ পর্বতে ভিক্ষুসহ ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করতে লাগলেন। সেখানে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন যে—সমস্তই জ্বলছে। চক্ষু জ্বলছে, রূপ জ্বলছে, চক্ষু বিজ্ঞান জ্বলছে, চক্ষু সংস্পর্শ জ্বলছে এবং সংস্পর্শ বেদনা, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা না দুঃখ—না সুখ বেদনা জ্বলছে। রাগাগ্নি, দেষাগ্নি, মোহাগ্নির দ্বারা জ্বলছে। জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণ জ্বলছে।

ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম্ম সমন্ধে এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, এইসব দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষু বিষয়ে, রূপে, চক্ষুবিজ্ঞানে, চক্ষু সংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ সুখবেদনায়, দুঃখ বেদনায় অথবা না দুঃখ, না সুখ বেদনায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রে, শব্দে, ঘ্রাণে, গন্ধে, জিহ্বায়, রসে, কায়ে, স্পর্শে, মনে এবং ধর্ম্মেও নির্ব্বেদ

প্রাপ্ত হলে বীতরাগ হয়, বীতরাগ হলে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং সে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে—"আমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এবং অতঃপর আমাকে অত্র থামতে হবে না। এই বিবৃতি প্রদানকালে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসব হতে বিমুক্ত হল।

[দ্রষ্টব্য : মহাবর্গ, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, শ্রী অধরলাল বড়ুয়া প্রকাশিত, খ্রীঃ ১৯৩৭, পৃষ্ঠা, ৩৬-৩৭]

বেলা ভট্টাচার্য

আদি-বুদ্ধ

খুব সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র নালন্দা বিহারে আদি-বুদ্ধের মতবাদ উৎপত্তি হয়েছিল। বজ্রযানের এক শাখা কাল-চক্র-যান অথবা কাল-চক্র-তন্ত্র এই মতবাদ প্রথমে গ্রহণ করেছিল। আদি-বুদ্ধে উৎসর্গিত বিশেষ তন্ত্রই হচ্ছে কাল-চক্র তন্ত্র যাহা মৌলিক তন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে আদি-বুদ্ধের মতবাদ প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল। এইরূপে কাল-চক্র তন্ত্র দশম খৃষ্টাব্দের গুণফল। কাল-চক্র সহ যে তান্ত্রিক পদ্ধতির অত্যন্ত উন্নয়ন ঘটেছিল যা যদিও দর্শন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য ছিল তথাপি তা এখানে মতবাদ সম্পর্কিত ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইহা কেবলমাত্র মন্ত্রযানের নির্বোধোচিত অতীন্দ্রিয়বাদ সহ আদি-বুদ্ধ মতবাদের অশিষ্ট তান্ত্রিক উন্নয়ন এবং ইহা কেবলমাত্র ধ্যানীবুদ্ধ নহে এমনকি স্বয়ং আদি-বুদ্ধের সহিত ভয়ঙ্করী কালীর মিলন দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টি এবং গোপনীয় শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। এইভাবে ধ্যান দ্বারা আদি-বুদ্ধ কর্তৃক উৎপাদিত কর্মশক্তি প্রকাশিত হয়, যার দ্বারা ভীতি সঞ্চারিকা সমওরা এবং অপর ভয়ানক ডাকিনী-পাষণ্ডি, সকলেই কালী-প্রতীক, তাদের মত ভয়ঙ্কর স্বামী লাভ করে যদিও স্বামীগণ আদি-বুদ্ধের এবং ধ্যানী বুদ্ধগণের প্রতিফলিত আলোক বলে পরিগণিত হন। দশম খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধ্যভারতে আদি-বুদ্ধের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন লেখকগণ কর্তৃক কোথাও কালচক্র অথবা আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আদি-বুদ্ধের মতবাদ হচ্ছে সেই মতবাদ যাহা উদিত হয়েছিল আস্তিকতা রূপে বর্ণিত হচ্ছে এইরূপ তাহার উন্নয়নের অংশ বিশেষ। তাঁহারা বলেন যে কখন আদি-বুদ্ধের অথবা পরমাদি-বুদ্ধের মতবাদ আবির্ভূত হয়েছিল তাহার সিদ্ধান্তে আসায় অসুবিধা আছে। দশম খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয়েছে বলে বিবেচিত গ্রন্থ নামসংগীতিতে মঞ্জুশ্রীর নাম রূপে আদি-বুদ্ধ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আদি-বুদ্ধের চরিত্র মঞ্জুশ্রীতে আরোপ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি জ্ঞানের আধার যে কারণে বুদ্ধগণ উদ্ভূত হন এবং 'জ্ঞানসত্ত্ব' বলে তিনি বোধিসত্ত্ব হতে অধিক। মঞ্জুশ্রী হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ কারণ তিনি বৌদ্ধগণের মাতা প্রজ্ঞার রাজা।

আদি-বুদ্ধকে ঈশ্বর বা শ্রষ্টার ঠিক অপর এক নাম বিবেচনা করলে ইহা হবে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা হবে এক সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ ইহা অত্যাবশ্যকভাবে এবং মৌলিকতায় কোন ঈশ্বর বা স্রষ্টার ধারণাকে অস্বীকার করে। আদি-বুদ্ধের ধারণাকে

বরং গণ্য করা উচিত হবে অভিজ্ঞতার সার্বজনীনতা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা হিসাবে, সংসারের এবং নির্বাণের অপরিহার্য একত্ব যাহা মহাযানের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সময়ে সময়ে আদি-বুদ্ধকে এক মহাজাগতিক মনের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে ইহাকে সম্ভবতঃ বর্ণনা করা যেতে পারে। সি, ইলিয়টের মতে বৌদ্ধ কাল-চক্রের অদ্ভুত মতবাদ হচ্ছে যে একজন আদি-বুদ্ধ অথবা আদি বুদ্ধেশ্বর আছেন, যাঁর কাছ হতে অন্য সকলে আবির্ভূত হয়েছেন। খুব সম্ভবতঃ মুসলমানগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম এই শেষ প্রচেষ্টাকে প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করে, যাহা মহম্মদের উপদেশগুলির ভিত্তিগুলি অস্বীকারের পরিবর্তে প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছে যে একেশ্বরবাদ বৌদ্ধধর্মে দেখা দিতে পারে ভারতবর্ষে একজাতীয় তর্কের অবতারণা প্রায়ই ঘটে। আদি-বুদ্ধের মতবাদ যা হোক নতুন অথবা যথার্থভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ ভারতীয় মনে বুদ্ধের তিন কায়ের মতবাদের ইঙ্গিত করে, বস্তুতপক্ষে সম্ভোগকায় একজন ভারতীয় দেব এবং ধর্মকায় হচ্ছেন ব্রহ্মা অথবা সর্বেশ্বর। কাল-চক্রের প্রভাবে লামাগণ একজন সর্বোচ্চ দেবতাকে পূজা করা অর্থে আস্তিক হয়ে যাননি, কিন্তু তাঁরা আদি-বুদ্ধকে কোনও বিশেষ দেবতার সহিত সনাক্ত করেছিলেন। অতএব সমন্তভদ্র, যিনি সাধারণতঃ বোধি-সত্ত্ব হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত অর্থাৎ যিনি বুদ্ধ হতে নিম্নতর তিনি কারও দ্বারা এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কালচক্র তন্ত্রগুলি সকল অমিতাচারগুলি অবলম্বন করেছিল এবং প্রধান বুদ্ধগণদের এবং বোধিসত্ত্বদের জন্য একটি করে স্ত্রী যোগিয়েছিল এবং এমন কি আদি-বুদ্ধকে একটি দিয়েছিল। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের বৌদ্ধধারণাগুলির মতে, মহত্তম দেবতা বজ্রধর আদি-বুদ্ধ, সর্বপ্রথম বা আদিম একেশ্বরবাদী দেবতা নামে পরিচিত। তিনি হচ্ছেন শূণ্যের মূর্তকরণ এবং তাঁর থেকে ধ্যানী বুদ্ধগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। দশম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নালন্দা বিহারে এই মতবাদ উদ্ভূত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়। আদি-বুদ্ধকে উৎসর্গীত বিশেষ তন্ত্র, কাল-চক্র তন্ত্র সেইজন্য দশম খৃষ্টাব্দের গুণফল বলে যথার্থভাবে বিবেচিত হয়েছে। আদি-বুদ্ধকে অগ্নিশিখার প্রতীক হিসাবে পূজা অর্পণ করা হয়েছিল এবং বৌদ্ধ পুরোহিতযান তাঁকে অমর স্বয়ম্ভু বা স্ব-জীবিত বলে বিশ্বাস করে। স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে, আদি-বুদ্ধ অগ্নিশিখার আকারে নেপালে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ইহাকে আশ্রয় দিতে মঞ্জুশ্রী ইহার উপরে এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সময় হতে ইহা স্বয়ম্ভু চৈত্য নামে পরিচিত হয়েছে। এই অগ্নিশিখার অভ্যুদয় নেপালের কালিহ্রদ সরোবরের পদ্মে হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ অনেক পূজারী ইহাতে পূজা অর্পণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ স্বর্গীয় ভবনের সর্বোচ্চস্থানে আদি-বুদ্ধ বাস করতেন বলে অনুমান করা হয়।

চীনা ভাষায় পেন-চু-ফো হিসেবে অনূদিত হয়েছে যাকে আক্ষরিকভাবে অর্থ করলে দাঁড়ায় আদিম, সর্বপ্রথম বুদ্ধ। পরমাদি-বুদ্ধ হচ্ছে আর একটি নাম। ইহা চীনা ভাষায় সেঙ্-চু-ফো হিসেবে অনূদিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছ অতুলনীয়, প্রথম বুদ্ধ। তিব্বতী ভাষায় ইহা দন-পোহি-মানস-খগ্যাম্, মচোগ-গি-দন-পোহি-মানস খগ্যাম্ বা যোগ-মহি-মানস-খগ্যাম হিসেবে অনূদিত হয়েছে। সবগুলিই ইঙ্গিত করছে সকল বুদ্ধগণের বুদ্ধ, যিনি মৌলিকভাবে অগ্রগামীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আদি-বুদ্ধর ধারণা এবং বিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছে বিদেশাগত শিক্ষাদানে নহে, কিন্তু গুহ্য বৌদ্ধধর্মেতে। বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রারম্ভকালে পদটি মনে হয়

ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই ধারণায় বিশ্বাস সম্ভবতঃ দেরিতে উদয় হয়েছিল, যখন গুহ্য বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় তান্ত্রিকতার অতীন্দ্রিয়বাদের সংস্পর্শে এসেছিল, পরিণামে তাদের পারস্পরিক প্রভাব। মহাবৈরোচন সূত্রের বুদ্ধগুহ্য টীকাতে আদি-বুদ্ধ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা, যাঁরা নিজ-জাগরিত তাঁরা হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব, অষ্টম শ্রেণী হতে তাঁরা মহত্তর। তাঁরা অপরজন দ্বারা নির্দেশিত হল না, কিন্তু তাঁরা নিজেদের দ্বারা জাগরণ লাভ করেন।

নামসংগীতি টীকাতে আদি-বুদ্ধ উল্লিখিত এবং প্রশংসিত হয়েছেন। আদি-বুদ্ধের আরম্ভ নেই এবং সময়ে অসীম হয়েছেন। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন অশরীরী এবং অদৃশ্য। আদি-বুদ্ধের ধারণার বিষয়গুলি হচ্ছে এইরূপ ঃ আদি-বুদ্ধ হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মতবাদ, যাহা একই সময়ে হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম জড় মূল। জড় অথবা আধ্যাত্মিক হতে যাহা পৃথক নয় এবং একই সময়ে হচ্ছে জড় এবং আধ্যাত্মিক, এইরূপ যথার্থ নির্বাস-কায়ের জন্য হচ্ছে এই নাম। এটা হচ্ছে শাশ্বত এবং অবিনশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত দ্রব্যের এটা হচ্ছে উৎস, কারণ ইহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিত হয় এবং বিকশিত হয়। এটা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক মহান জীবন-কায় এবং এটা স্বয়ং উভয় উৎপাদন এবং ধ্বংস থেকে পৃথক। এটা সমস্ত দ্রব্যের উৎস এবং সমস্ত কিছু এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল-চক্র সূত্র হচ্ছে শেষ সূত্র যাতে আদি-বুদ্ধের ধারণার উল্লেখ আছে। পদ্ম-কর-পা কৃত বৌদ্ধ ইতিহাসে আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ "তাঁহারা আদি-বুদ্ধ জানেন না, তাঁহারা কাল-চক্র সূত্র জানেন না। যাঁহারা কাল-চক্র সূত্র জানেন না, তাঁহারা কিরূপে ঠিকভাবে চিহ্ন ব্যাখ্যা করতে হয় জানেন না, তাঁহারা বজ্রধরের জ্ঞানকায় জানেন না। যাঁহারা বজ্রধরের জ্ঞান-কায় জানেন না, তাঁহারা মন্ত্রযান জানেন না, তাঁহারা হচ্ছেন মোহগ্রস্ত জনগণ এবং যাঁহারা ভগবত এবং বজ্রধরের পথ হতে বিচ্যুত হয়েছেন। অতএব, মন্ত্র-যানের সকল প্রভুগণ তাঁহাদের শিষ্যদের এই পরমাদ্য বুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন। মন্ত্র-যানের সকল শিষ্যগণ যাঁহারা বোধিজ্ঞান উপলব্ধি করতে চান তাঁহারা পরমাদ্য বুদ্ধের এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবেন"। নেপাল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আদি-বুদ্ধর প্রথম পদ্ধতি ঐশ্বরিক নামে এক আস্তিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বি. ভট্টাচার্য বলেন, "আদি-বুদ্ধ স্বয়ং নেপালে অগ্নিশিখার আকারে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং সেইজন্য ইহাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু-ক্ষেত্র (স্বয়ং-জাতর স্থান)"। আদি-বুদ্ধের মন্দিরসহ এই স্থানকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গিত করা হয়েছে এবং ইহার নিকটবর্তী হচ্ছে স্বরস্বতী স্থান হিসেবে পরিচিত মঞ্জুশ্রী পর্বত। মঞ্জুশ্রী চীন থেকে এসেছিলেন। যেখানে তিনি পঞ্চশীর্ষ পর্বতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। তাঁর অনেক শিষ্য এবং অনুগামী ছিলেন। দেশের রাজা ধর্মকর তাঁদের মধ্যে একজন। নেপালের কালি হ্রদের জলের পদ্মে স্বয়ংজাত প্রভু আদি-বুদ্ধ অগ্নিশিখার আকারে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন এই ঐশ্বরিক বার্তা একদিন প্রাপ্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্যগণ, তাঁর দুই স্ত্রী এবং রাজা ধর্মকরসহ এই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এই দেবতাকে ভক্তি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে। যখন তিনি হ্রদের নিকট এসেছিলেন তখন তিনি দেবতাকে বেষ্টন করে বিরাট এক জলোচ্ছাস দেখেছিলেন এবং প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্য দিয়ে তিনি অগ্নিশিখার নিকট এসেছিলেন এবং তাঁর অভিবাদন জ্ঞাপন করেছিলেন। অবশেষে কৃতকার্য হয়ে তিনি সকলে যাতে দেবতার সাক্ষাৎ পায় এর কিছু উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে হ্রদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তখন তিনি পর্বতের

দক্ষিণ-দিকস্থ স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁর তরবারি উত্তোলন করেছিলেন এবং নিম্নে নামিয়েছিলেন। এতে পর্বত দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং খোলা জায়গা দিয়ে জল তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়েছিল। এর ফলে শুষ্ক এক বিস্তীর্ণ এলাকা প্রসারিত হয়েছিল যাহা এখন নেপাল উপত্যকা নামে পরিচিত হয়েছে। বাঘমতীর জল এমন কি আজ পর্যন্ত সেই খোলা জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে আজও বলা হয় 'কোতবার' অথবা 'তরবারি কাটা'। মঞ্জুশ্রী সময় নষ্ট না করে অগ্নিশিখার উপরে এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং শিষ্যগণের জন্য মঞ্জু-পট্টন বা পত্তন নামে এক বিহার নির্মাণ করেছিলেন যাহা আজও মঞ্জু-পত্তন নামে পরিচিত। তাঁহারই প্রচেষ্টা ধর্মকর নেপালের রাজা হয়েছিলেন। স্বয়ম্ভু পুরাণে মঞ্জুশ্রীর এইরকম অনেক ধর্মীয় কার্যাবলীর বিবরণ আছে। এর পরে মঞ্জুশ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁর পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে বোধিসত্ত্বের ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তি লাভ করেছিলেন।" আদি বুদ্ধের পূজা নেপালী ধর্মে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এইরূপ ধর্মের-অস্তিত্ব আছে। নেপালে কাঠমাণ্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভু পাহাড়ে আদি-বুদ্ধকে অর্পিত প্রধান মন্দির আছে। এই মন্দির খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়, কিন্তু আদি-বুদ্ধ অথবা স্বয়ম্ভু ভারতের অপর অলৌকিক প্রতিমূর্তিগুলি থেকে একেবারে পৃথক নয়।

বজ্রযানে বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতারূপে আদি-বুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আদিম বুদ্ধ অথবা পরিমাদি বুদ্ধ (তিব্বতীতে-দন-পোয়া মনম্-খগ্যাম মোহো-গ্গি দন পোয়া...), অর্থাৎ প্রথম বুদ্ধ, প্রাথমিক বা মৌলিক বুদ্ধ শুরু থেকে বুদ্ধ, যার উৎপত্তি হয় নি এইরূপ বুদ্ধ (অনাদি বুদ্ধ) এবং বুদ্ধগণের বুদ্ধ। আদি-বুদ্ধের উপাদান মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইন্দ্রিয়গুলি ছিল জ্ঞান অথবা মন। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বি-জাত অথবা স্বভব, স্বয়ং বর্তমান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টকর্তা বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন স্বয়ম্ভু পুরাণের প্রভু (স্বয়ম্ভু)। তিনি সেখানে সর্বোচ্চ দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি নেপাল দেশের গৌরীশৃঙ্গ পর্বতে সকল দেবতাগণ, যক্ষগণ এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক পূজিত হন। তিনি ধর্মাতুর প্রকৃতি হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি তাঁর চারদিকে স্থাপিত অপর চার তথাগত সহ প্রভু বৈরোচণরূপে কল্পিত হয়েছেন। তাঁহাকে শাক্য-মুনি, জগন্নাথ এবং ধর্মরাজও বলা হয়। আদি-বুদ্ধ, যিনি হচ্ছেন স্বয়ম্ভু এবং যিনি ধর্মরাজ বলে বর্ণিত হয়েছেন, তিনি ত্রি-রত্নের প্রকৃতিরূপে সময় সময় বর্ণিত হয়েছেন। আদি বুদ্ধকে এবং আদিপ্রজ্ঞাকে স্বয়ম্ভু পুরাণে খোলাখুলিভাবে উপায় এবং প্রজ্ঞার অথবা করুণা এবং শূন্যতার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পুনরায় শিব এবং শক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ধর্মকোষ-সংগ্রহে প্রভু হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ, কারণ তিনি হচ্ছেন প্রথম অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞেয়, কারণ-ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর কোন আকার নেই। তাঁকে নিরঞ্জন বলা হয় কারণ তাঁর মধ্যে কোন কলঙ্ক নেই, তিনি আকাশের মত শূন্যতার প্রতীক। তিনি হচ্ছেন নিরাকার, অবলম্বনহীন, উদার এবং মহাবৈরোচন। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন ধর্মরাজ কারণ তিনি হচ্ছেন সকল সত্ত্বের প্রভু এবং সকল সত্ত্বগণ এবং সমস্ত কিছু তাঁর আলোর দ্বারা ভাস্বর। তাঁকে ধর্মেশও বলা হয়, কারণ তিনি বৌদ্ধ দশকুশলগুলির, সকল স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক পুণ্যের প্রভু এবং তিনি সকল ধার্মিক ব্যক্তিগণের প্রভু। তিনি সকল পবিত্র ধর্মধাতুগুলির সহিত সংযুক্ত রয়েছেন বলে তিনি হচ্ছেন ধর্মরাজ। তিনি ধর্ম অথবা ধর্মধাতু দ্বারা আলোকিত করেন

বলে তাঁকে ধর্মরাজ বলা হয়। নেপালী বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ দেবতা, আদি-বুদ্ধ যিনি উপায় এবং প্রজ্ঞার সহিত তুলনীয়, তিনি ধর্মরাজ বলে সর্বত্র সুপরিচিত।

কারণ্ডব্যূহে আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। "তখন কিছুই ছিল না, তখন ছিলেন সেই শম্ভু তিনি হচ্ছেন স্ব-জাত (স্বয়ম্ভু) ... তিনি সকলের অগ্রে, সেজন্য তাঁকে বলা হয় আদি-বুদ্ধ আদি (প্রথম), বুদ্ধ (জ্ঞানী))। ... আদি-বুদ্ধ, স্বয়ম্ভু এবং আদিনাথ আলোকের আকারে (জ্যোতিরূপ) আরম্ভকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" কারণ্ডব্যূহ হতে জানা যায় যে আদিম প্রভু (আদি-বুদ্ধ) বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রথমে অবলোকিতেশ্বরের চক্ষুগুলি থেকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে উৎপাদন করেছিলেন, তাঁর কপাল থেকে মহেশ্বরকে, তাঁর দুই কাঁধ থেকে ব্রহ্মাকে এবং অপরজনদের, তাঁর হৃৎপিণ্ড থেকে নারায়ণকে, 'তাঁর দাঁতগুলি থেকে স্বরস্বতীকে, মুখ থেকে বায়ুকে, পদযুগল থেকে পৃথিবীকে এবং উদর থেকে বরুণকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই সকল দেবতাগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর মহেশ্বরকে নির্বাচিত করেছিলেন, তাঁকে তিনি আদি-দেব নামে কলি যুগে সৃষ্টিকর্তা বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এসব থেকে আমাদের মনে হয় যে সৃষ্টির আদিতেই আদি-বুদ্ধ অথবা স্বয়ম্ভু অথবা আদিনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর শেষোক্ত ঈশ্বরসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। আদি-বুদ্ধ সৃষ্টির আদি, কল্পের আরম্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি শূন্যতা থেকে নির্গত হয়েছিলেন এবং তাঁর অসংখ্য নাম ছিল। তিনি পরিচিত ছিলেন বিশ্বরূপ নামে। তিনি নির্বাণে অবস্থান করেন এবং স্বয়ং পবিত্র আলোক ছিলেন বলে কারও পক্ষে তাঁকে দেখা সম্ভব ছিল না। তিনি সর্বজন দ্বারা পূজিত হলেও, তাঁর নামে কিন্তু কোন প্রার্থনাদির উল্লেখ নেই। পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ অথবা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধগণ তাঁর শক্তিদ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলেন। বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন আদিম বোধি লাভী আদি-বুদ্ধ, যিনি পাঁচ প্রকার জ্ঞান বা স্বাভাবিক গুণের অধিকারী। এই পাঁচ স্বাভাবকি গুণ থেকে পাঁচ প্রকার-ধ্যান উৎপাদিত হয় এবং এই পাঁচ প্রকার ধ্যান হতে নির্গত হন পাঁচ ধ্যানী-বুদ্ধ। আদি-বুদ্ধের কায় হচ্ছে ধর্মকায়। তিনি সমন্তভদ্র অর্থাৎ সার্বজনীনভাবে প্রসন্ন। তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছিল বুদ্ধগণের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ। ব্রহ্মা হতে অধিকতর সৌভাগ্যশালী তিনি পূজিত হন স্বয়ম্ভু নামে। সাধারণ বুদ্ধগণ থেকে তিনি পৃথক। নেপালী-ঐশ্বরিক সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধকে অসীম, সর্বদর্শী, স্বয়ম্ভু, অনাদি, অনন্ত এবং সকল দ্রব্যের উৎস এবং উৎপত্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছে। তিনি তাঁর জ্ঞানের পাঁচ প্রকারের পুণ্যের দ্বারা এবং পাঁচ ধ্যানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণকে অথবা স্বর্গীয় জিনগণকে। তাঁদের বলা হয় অনুপপাদক অথবা পিতামাতা ব্যতীত জাত। সম্পূর্ণ শূণ্যতা (মহাশূণ্যতা), মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী স্বর ওম যার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকে স্বেচ্ছায় আদি-বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। পৃথিবীর সৃষ্টির শুরুতে আদি-বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন অগ্নিশিখার আকারে যাহা পদ্মফুল থেকে নির্গত হয়েছিল এবং নেপালে এই প্রতীক দ্বারা আদি-বুদ্ধকে সর্বদা উল্লেখ করেছে। ঐশ্বরিক সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেছে। আদি-বুদ্ধ যখন মানবীয় আকারে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তখন তিনি বজ্রধর রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। বজ্রধর তিনি অবিনাশযোগ্য, সমস্ত গোপনীয় রহস্যের প্রভু, তিনি আদি-বুদ্ধের হচ্ছেন এক জনপ্রিয় আকার এবং এই আকারে তিনি পূর্বদিকের এলাকায় রাজত্ব করেন বলে

বিশ্বাস করা হয়। এখন তিব্বতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধ অথবা আদিম বুদ্ধরূপে বজ্রধরকে পূজা করে। এর মতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী এবং সকল দ্রব্যের স্রষ্টা। লালটুপি সম্প্রদায় (একাদশ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের ক-দম-পা অতীশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নেপালী মহাযানীগণ মনে করেছিলেন যে আদি-বুদ্ধ ছিলেন বজ্রসত্ব। তাঁরা তাঁকে পূজা করেছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন যে "আদি-বুদ্ধরূপে বজ্রধরকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হয় না। যখন আদি-বুদ্ধর মতবাদ পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধগণ তখন অনেক সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল, কেহ কেহ আদি-বুদ্ধরূপে পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণের একজনকে বিবেচনা করেছিলেন। কেহ কেহ আদি-বুদ্ধরূপে বজ্রসত্বকে স্বীকার করেছিলেন এবং কারও মতে আদি-বুদ্ধগণরূপে সমন্তভদ্র এবং বজ্রপাণি বিবেচিত হয়েছিলেন। অতএব আদি-বুদ্ধের ধর্মবিশ্বাস বিতরিত হয়েছিল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের মধ্যে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল।"

নালন্দা মহাবিহারে আদি-বুদ্ধের এবং কালচক্রের মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। শেষে বজ্রধর আদি-বুদ্ধের সহিত মিলিত হয়ছিলেন। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন আদিম বুদ্ধ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আদি-বুদ্ধ বা বজ্রধর হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধ এবং অন্যান্য তথাগতগণের স্রষ্টা। স্বয়ম্ভূ পুরাণে বলা হয়েছে যে আদি-বুদ্ধ যখন একক তখন তাঁর বর্ণ নীল এবং পরিধানে স্বর্গীয় অলংকার এবং পোশাক। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সমাসীন। তাঁর এক হাতে বজ্র, অন্যহাতে ঘণ্টা এবং তাঁর বুকে বজ্রহুমকার মুদ্রা। অষ্টম খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিব্বতের নিঙ্-মা-পা সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধ অথবা আদিম বুদ্ধরূপে সমন্তভদ্রকে উল্লেখ করেছে। নেপাল এবং তিব্বতে আদি-বুদ্ধ তাঁহার শক্তির সঙ্গে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছেন। সেই সময় তিনি যোগাম্বর এবং তাঁর শক্তি দিগম্বরী রূপে পরিচিত ছিলেন। যদিও আদি-বুদ্ধ একজন বুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি সর্বদা মুকুট এবং অলংকার পরিহিত এবং তাঁর পোশাক ছিল একজন রাজপুত্রের মত। তাঁর স্ত্রী বা শক্তি আদি ধর্মরূপে (আদি প্রজ্ঞারূপে) পরিচিত ছিলেন। তিব্বতী সম্প্রদায় নিঙ্-মা-পাতে আদি-বুদ্ধ সমন্তভদ্র অথবা বজ্রসত্ব রূপে বিবেচিত হয়েছেন। জাপান কখনও আদি-বুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেনি। বাস্তবিক পক্ষে এই শব্দ জাপানে অপরিচিত ছিল। কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধগণ, অমিতাভ এবং বৈরোচন বুদ্ধ জাপানে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। জাপানী বৌদ্ধধর্মে আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন মহাবৈরোচন তথাগত এবং সকল বুদ্ধগণ, বোধিসত্বগণ এবং অপর দেহীগণ হচ্ছেন আদি-বুদ্ধের প্রতিফলিতকায় স্বরূপ। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন সম্পূর্ণ বুদ্ধ এবং একজন ধ্যানীবুদ্ধ হচ্ছেন আংশিক বুদ্ধ। একজন হচ্ছেন 'সার্বজনীন প্রবেশ পথ' এবং অন্যজন হচ্ছেন 'এক-প্রবেশ পথ'।

গ্রন্থপঞ্জি

1. B. Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, Calcutta, 1968.
2. B. Bhattacharyya, An Introduction to Buddhist Esoterism, Oxford University press, London, 1932.

3. B. Bhattacharyya, Buddhist Iconography : Vajradhara Vs Vajrasattva, The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna, vol. IX, March, 1923.
4. Sir Charles Bell, The Religion of Tibet, Oxford, 1931.
5. C. Bendall, A journey in Nepal and North India, Cambridge, 1956.
6. S. W. Bushell, The Early History of Tibet from Chinese Sources, Journal of the Royal Asiatic Society, XII, London, 1880.
7. A. K. Coomaraswamy, Elements of Buddhist Iconography, Cambridge, Mass, 1935.
8. A. De Kores Csoma, Note on the Origin of the Kālacakra and Ādi-Buddha Systems, Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 11, Calcutta, 1833.
9. S. B. Dasgupta, An Introduction to Tantric Buddhism, University of Calcutta, Calcutta, 1950.
10. S. B. Dasgupta, Obscure Religious cults as Background of Bengali literature, University of Calcutta, Calcutta, 1946.
11. A. David-Neel, Magic and Mystery in Tibet, New York, 1932.
12. Dharma-Kosa- Saṅgraha, Royal Asiatic Society of Bengal, No 8055, Calcutta.
13. Encyclopaedia of Buddhism, Fascicle I : Acala-Akain, ed. G. P. Malalasekera, the Government of Ceylon, 1963 ; vol. II, Fascicle 2 : Asita Devala Atthakavagga, Ceylon 1967 ; vol. III, Fascicle : Bharini-Kehmon, Ceylon, 1973.
14. A. Getty. The Gods of Northern Buddhism, Oxford, 1914.
15. A. K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism, New York, 1939.
16. H. Hoffman, The Religions of Tibet, London, 1961.
17. S. Levi, Le Nepal, vols. I & II, Paris, 1905, Vol. III, Paris, 1908.
18. L. M. Joshi, Studies in the Buddhistic Culture of India, Delhi, 1977.
19. W. F. Mayers, Illustrations of the Lamaist system of Tibet drawn from chinese sources, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Inland. vol. IV, London, 1869.
20. R. L Mitra, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Calcutta, 1882.
21. R. L. Mitra, Svayambhu Purāṇa, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Calcutta, 1882.

22. H. A. Oldfield, Sketches from Nepal, vol. II, London, 1880.

23. L. Poussin, Ādibuddha, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. I, Hastings, vol. I, London.

24. Saddharmapuṇḍarikasūtra, ed., P. L. Vaidya, Buddhist Sanskrit Text, No. 6, Darhanga, 1960 ; tr. H. Kern, Sacred Books of the East, vol. XXXI, Delhi, 1966.

25. C. Eliot, Hinduism and Buddhism, vol. III London 1954.

26. B. H. Hodgson, Essays on the Languages, Literatures and Religions of Nepal and Tibet, London, 1916.

27. L. A. Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism, London. 1895.

28. S. C. Vidyabhusana, On certain Tibetan Scrolls and Images, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. vol. I, no. I, Calcutta, 1905.

29. Advayavajrasaṅgraha, Ed., H. P. Sastri, G. O. S., No. XL., Baroda, 1927.

30. B. Bhattacharyya, ed., Two Vajrayāna works consisting of the Jñānasiddhi of Indrabhūti and the Prajñopāya Viniścayasiddhi of Anaṅgavajra, Gos, no. 44, Baroda, 1929.

31. B. Bhattacharyya, ed., Guhyasamāja Tantra, or the Tathāgataguhyaka, Gos, no. 53 Baroda, 1931.

32. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed., James Hastings, vol. I, A-Art, New York, 1971 ; Encyclopeadia of world art, vol. II, Asiatic Protohistory Byzantine Art, McGraw Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1958.

কানাইলাল হাজরা

আদীনব

আঠার প্রকার অন্তর্নিহিত জ্ঞানের যে কোন একটির দীনাবস্থায় গভীরভাবে ধ্যান করাকে আদীনবানুপস্সনা এ্রাণ বলে। পাঁচটি কুকর্ম একত্রে সংযুক্ত হয়ে মানসিক চিন্তাধারাকে ধর্মীয় আচরণ (পঞ্চ আদীনবা দুস্সীলস্‌স সীল বিপত্‌তীয়া, দীঘ-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫) থেকে অলস, কুখ্যাত করে তুলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার জন্য তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় এবং মৃত্যুর পরেও সে অসুখী পুনর্জন্ম লাভ করে।

দীঘ-নিকায় এ দেখা যায় ভগবান বুদ্ধ পোক্‌খরসাদিকে ধাপে ধাপে দানকথা, সীলকথা, সগ্‌গকথা প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক দেশনা দেন। তারপর ইন্দ্রিয় আনন্দবর্ধক বস্তুর বিপদ (কামানম্‌

আদীনব), তার অহংকার (ওকার), অপবিত্রতা (সঙ্কিলেস) পরিহার করে স্বীয় মানসিকতার কিভাবে উন্নতি করা যায় তার শিক্ষা দেন।

দীঘ-নিকায় এর সিগালবাদ সুত্তন্তে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৪) দেখা যায় একজন যুবা পুরুষ কুকর্মে (আদীনব) দ্বারা লিপ্ত হয়ে বিপথগামী হতে পারে। এর মূল কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান, ইতস্ততঃ রাস্তায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভ্রমণ, মেলা দর্শন, জুয়াখেলা, বদলোকের সাহচর্য এবং আলসতা।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol. I, Fascicle 1, P. 221]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

আনন্দ

কপিলাবস্তু নগরের শাক্যদের রাজা ছিলেন জয়সেন। জয়সেনের মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনে আরোহ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর প্রধানা মহিষীর নাম কাত্যায়নী। তাঁদের পঞ্চপুত্রের নাম হল যথাক্রমে—শুদ্ধোদন, অমিতোদন, ধোতোদন, শুক্লোদন, এবং অশুক্লোদন। পিতার মৃত্যুর পর শুদ্ধোদন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অনুজ অমিতোদন এবং রাজকুলবধূ জনপদকল্যাণীর পুত্র আনন্দ। তিনি শাক্যরাজান্তপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শাক্যরাজ্যের সকলের অন্তরে আনন্দ ধারা প্লাবিত হয়। তাদের সুখ, ঐশ্বর্য এবং হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে। এই শিশুর শরীরের বর্ণ ছিল অতি উজ্জ্বল, কমনীয় কান্তি, সর্ব অবয়ব লালিত্যময় অনিন্দ্যসুন্দর। শিশুর কণ্ঠস্বরও করুণামাখা। তার দর্শনে সকলের আনন্দ, কথা স্মরণে আনন্দ। শিশুর নামও রাখা হল 'আনন্দ'। ক্রমশ তিনি অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হলেন। রাজকুমার এখন সর্বাঙ্গসৌষ্ঠব, সর্বশাস্ত্রবিদ, সর্ব শাস্ত্রপারঙ্গম। শুদ্ধোদনের প্রথম পুত্র সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে সর্ব মানবের মুক্তির অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে নিরঞ্জনা নদীতীরে বোধিতরুমূলে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। অতঃপর বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এর পর বহির্গত হলেন সত্যধর্ম প্রচারে। যশ প্রমুখ ষাটজন এবং জটিল ভ্রাতৃত্রয় শান্তিপ্রদ নির্বাণের পথচারী হলেন। এবার শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে বুদ্ধ এলেন নৃপতি বিম্বিসারের রাজ্য মগধের রাজধানী রাজগৃহের বেণুবনে। এখান থেকে বুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণ পেয়ে পিতৃদর্শনে ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে শাক্যরাজ্যে উপনীত হলেন। পিতা শুদ্ধোদনসহ দলে দলে সহস্রাধিক শাক্য পুরুষ মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এসময়ে কপিলাবস্তুর রাজপরিবারের পাঁচজন রাজকুমার—ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু ও কিম্বিল এবং রাজকুলের ক্ষৌরকার উপালি অনুপ্রিয়-এর আম্রকাননে উপস্থিত হলেন। দেবদহের রাজপুত্র দেবদত্তও এঁদের সঙ্গী হলেন। এঁরা সকলে প্রব্রজ্যা প্রার্থী। ভগবান উপালিকে প্রথম প্রব্রজ্যা দান করে পরে বয়ঃক্রমানুসারে রাজকুমারগণকে প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর পূর্ণ মন্তানিপুত্র আনন্দের উপাধ্যায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর কাছে ধর্ম শ্রবণ করে আনন্দ স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম বিংশতি বৎসর ভগবানের কোনও নির্দিষ্ট সেবক ছিল না। নাগসমাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, উদায়ী, চুন্দ, রাধ ও মেঘিয় প্রমুখ ভিক্ষুগণ যথাক্রমে তাঁর পরিচর্য্যা করেছেন, কিন্তু এঁরা কেউ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেননি। অবশেষে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ভগবান ঘোষণা করলেন—ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার একজন সর্বক্ষণের স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন। তথাগতের যে সেবক হবে তার নিরলস, কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও ঐকান্তিক হওয়া প্রয়োজন। শারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন প্রমুখ অশীতি মহাশ্রাবক একে একে প্রত্যেকেই সেবকত্বপদপ্রার্থী হয়ে প্রার্থনা জানালেন। ভগবান প্রত্যেকের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। সভার একান্তে দুঃখে ক্ষোভে নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন আনন্দ। ভিক্ষুগণ আনন্দকে সেবকত্বপদ প্রার্থী হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আনন্দ বললেন—তথাগত আমায় কেন আদেশ করছেন না? আমি তাঁর সেবক হওয়ার যোগ্য কিনা তা তো তিনি ভালোই জানেন। ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—আনন্দ, বুদ্ধের প্রদান সেবক হওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে। আনন্দ দাঁড়িয়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করলেন—'প্রভু, আমার আটটি বর প্রার্থনীয় আছে'। আনন্দ দুই পর্যায়ে আটটি বরের বিষয় উপস্থাপন করলেন।

প্রথম পর্যায় : (১) ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চীবর (২) এবং উত্তম খাদ্যবস্তু আমার গ্রহণীয় হবেনা। (৩) ভগবানের সঙ্গে গন্ধকুটীতে আমি অবস্থান করব না। (৪) আমন্ত্রিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে গমন করার অধিকার আমার থাকবে।

দ্বিতীয় পর্যায় : (১) আমার গৃহীত নিমন্ত্রণ ভগবান গ্রহণ করবেন (২) ভগবানকে দর্শনের উদ্দেশ্যে দূরদেশ হতে আগত ব্যক্তিদের আমার ইচ্ছানুসারে যে কোনও সময়ে ভগবানের কাছে উপনীত করা যাবে। (৩) কোনও বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগলে তা অপনোদনের জন্য যে কোনও সময় ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়ার অধিকার আমার থাকবে। (৪) আমার অনুপস্থিতিতে ভগবান যেখানে যে ধর্মদেশনা দান করবেন পরে তা আমার কাছে পুনরুত্থাপন করবেন। আনন্দ আরো জানালেন প্রথম ৪টি বর প্রার্থনার কারণ ভিক্ষুগণ ভবিষ্যতে যেন বলতে না পারেন যে আমি তথাগত লব্ধ উত্তম চীবর ও খাদ্য ভোজ্য পরিভোগ করছি অথবা গন্ধকুটীতে অবস্থান করছি এবং একসঙ্গে নিমন্ত্রণে যাচ্ছি। আমি এই লাভ সৎকারের জন্যই বুদ্ধের সেবা করেছি।

যাজ্ঞাত্মক আরো ৪টি বর চেয়েছি এই কারণে—(১,২) যদি শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকারা ভগবানের দর্শন লাভের অবকাশ না পেয়ে আমার কাছে ভগবানের আমন্ত্রণ সংবাদ রেখে যান আর ভগবান সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং দর্শনার্থী জনগণকে আমার ইচ্ছানুযায়ী ভগবানের কাছে উপনীত করতে না পারি তা হলে সাধারণের কাছে আমাকে বিদ্রূপের পাত্র হতে হবে। (৩,৪) যদি কোন বিষয়ে আমার সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং ভগবানের দেশনা বিষয় আমার অজ্ঞাত থাকে তা হলে ভগবানের পরিনির্বাণের পর কেহ যদি জানতে চায় এই দেশনা ভগবান কোথায়, কি প্রসঙ্গে, কাকে দিয়েছেন আর আমি তার যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ হই তবে আমাকে অভিযুক্ত হতে হবে। তাঁরা বলবেন আনন্দ ভগবানের সেবকত্ব লাভ করেও তাঁর দেশনা সম্যক অবগত নহেন। আনন্দের যুক্তিযুক্ত বাক্যে ভগবান একান্ত প্রসন্ন হলেন এবং এই অষ্ট বর প্রদান করলেন। সেদিন থেকে আনন্দ ভগবান বুদ্ধের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং ভগবানের মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও

মমতা এবং সহনশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ ভগবানের সেবা করেছেন। ভগবান বুদ্ধের সেবায় তাঁর প্রাত্যহিক কর্মতালিকা ছিল অতি সুশৃঙ্খল ও নিষ্ঠাপূর্ণ। আনন্দ প্রত্যহ দিবসের প্রারম্ভে ভগবানের জন্য ত্রিবিধ দন্তকাষ্ঠ এবং তাঁর স্নানের জন্য শীতল ও উষ্ণ জলের আয়োজন করতেন। সযত্নে চরণ ধৌতকরণ এবং পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জন করতেন। প্রত্যহ গন্ধকুটীর সম্মার্জন এবং ভগবানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাস্থানে সংরক্ষণ। দিবসে গন্ধকুটীর অনতিদূরে অবস্থান এবং রাত্রে দণ্ডপ্রদীপ হস্তে গন্ধকুটীর চতুর্দিকে প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে নিদ্রা ও আলস্য বর্জন করতেন। বুদ্ধের দর্শনার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে তাদের বুদ্ধের কাছে উপনীত করাতেন। ভগবান শারীরিক পীড়া বোধ করলে আনন্দ মাতৃ-মমতায় নিরন্তর তাঁর সেবাযত্ন করতেন। বুদ্ধ ছিলেন আনন্দের জীবনাধিক প্রিয় অন্তর-দেবতা। পীড়িত বুদ্ধের সন্নিকটে অবস্থিত আনন্দের মনের অবস্থা কী করুণ তা তাঁর একটি উক্তি হতে বোঝা যায়। আনন্দ বুদ্ধকে বলছেন—'প্রভু, আপনার রোগের সময় আমার অবস্থা হয়েছিল শূলারোপিত ব্যক্তির মত, শরীর হয়েছিল অচল। চোখে কেবল অন্ধকার দেখতাম। চতুর্বিধ স্মৃতি প্রস্থানও স্মৃতিপথে আসত না। সমস্ত কেমন ভুল হয়ে যেত।' দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে হত্যা করার জন্য নালাগিরি নামক ভয়াবহ গজরাজকে বুদ্ধের দিকে ধাবিত করেন, ব্যাকুল আনন্দ তখন তাঁর জন্য প্রাণদানে উদ্যত হন।

শাস্তা বুদ্ধ আনন্দকে শিক্ষাদান বিষয়ে সতত সচেষ্ট থাকতেন। উপযুক্ত ধর্ম ব্যাখ্যাতারূপে আনন্দকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর আত্যন্তিক প্রচেষ্টা ছিল। ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য বুদ্ধ পাঁচটি নীতি নির্ধারণ করেন এবং আনন্দকে তা শিক্ষাদান করেন। এই পাঁচটি নীতি হল :—

(১) আনুপূর্বিক শিক্ষাদান—যেমন দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, ভোগের আদীনব, দশবিধ হীনক্লেশ, নৈষ্ক্রম্যের গুণ ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী ভাষায় শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী করে বলতে হবে।

(২) পর্যায়ানুক্রমদর্শী হয়ে শিক্ষাদান অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ের স্তর বিভাগ করে পর পর শিক্ষাদান করতে হবে।

(৩) হিতকামী হয়ে শিক্ষাদান—কোনও প্রকার বিরূপ মনোভাব নিয়ে নয়, শ্রোতাদের কল্যানকামী হয়ে শিক্ষাদান করতে হবে।

(৪) আমিষ অন্তর্গত বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা হবে না। নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোনও বাক্য বলা হবে না।

(৫) নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রোতাদের হেয় প্রতিপন্ন করে শিক্ষাদান করা অনুচিত। আক্রমণাত্মক রূঢ় বাক্য এবং নিজের গুণ ও অন্যের দোষ কীর্তন বর্জন করে শ্রুতিসুখকর ও মৈত্রীসহগত বাক্যে ধর্মদেশনা করবে। আনন্দের মনের অহমিকা দূর করার জন্যও তিনি চেষ্টা করতেন। একদা আনন্দ বিশেষ এক পরিস্থিতিতে ভগবানের নিকট আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, প্রভু, প্রতীত্যসমুৎপাদ যেমন গম্ভীর তেমনি গভীর ও সুস্পষ্ট রূপেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন তা আমার কাছে অতি সহজবোধ্য ও সুখবোধ্য মনে হচ্ছে। ভগবান আনন্দের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বললেন—এভাবে বলো না। প্রতীত্যসমুৎপাদ অতীব

দুরনুবোধ্য, গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও জটিল। এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। ভগবান প্রশ্নোত্তরের সহায়তায় প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব আনন্দের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। আনন্দের মনের ক্ষোভ দূর করার জন্য বুদ্ধ বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে আনন্দ বেদনামিশ্রিত ক্ষোভে বুদ্ধকে ঐ স্থান ত্যাগ করার জন্য আবেদন জানালেন। ভগবান জানতে চাইলেন 'এই স্থান ত্যাগ করতে বলছ কেন।' আনন্দ বললেন—প্রভু, এখানকার লোকেরা ভিক্ষুদের সম্বন্ধে অযথা কুৎসা রটনা করছে। বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে 'কোথায় যেতে চাও আনন্দ', 'অন্য কোনওখানে'।—'কিন্তু সেখানকার লোকেরাও যদি তিরস্কার করে?'—'তা হলে সে স্থান ত্যাগ করে, অন্যত্র যাব'।—'যদি সেখানের লোকেরাও অপবাদ দেয়?'—'তা হলে অন্য স্থানে যাব'।—'কিন্তু এটা ঠিক নয়। তিরস্কার বা অপবাদ যেখান থেকে আসে সেখানে দাঁড়িয়েই তার উপশমের চেষ্টা করতে হবে। আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ গজরাজের মত সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমস্ত তিরস্কারের শরজাল সহ্য করব এবং স্থান ত্যাগ করব না।' ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগে আনন্দ ছিলেন প্রধান ও একমাত্র সহায়ক। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে শোকাতুরা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবান বুদ্ধের কাছে উপনীত হয়ে বুদ্ধশাসনে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রার্থনা করলেন। ভগবান দৃঢ়কণ্ঠে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। গৌতমী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও একই প্রার্থনা করেন এবং ভগবান স্থিরকণ্ঠে তা পুনরায় অস্বীকার করেন। রোরুদ্যমানা গৌতমী বিষণ্ণ হয়ে প্রস্থান করলেন। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন। ভগবান শাক্যরাজ্য হতে প্রত্যাবর্তন করে বৈশালীর মহাবন কূটাগারশালায় উপনীত হলেন। কেশকলাপ মুণ্ডিতা গৌতমী রাজবসন ত্যাগ করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করলেন এবং পঞ্চশতাধিক শাক্যকুলবধূসহ পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বৈশালীতে উপনীত হলেন। কূটাগারশালার বহির্দ্বারে অপেক্ষারত গৌতমী আনন্দের কাছে তাঁর মনোবাসনা জ্ঞাপন করলেন। আনন্দ গৌতমীর প্রব্রজ্যালাভের ঐকান্তিক আগ্রহ, নিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা হৃদয়ঙ্গম করলেন। তিনি ভগবানের কাছে মাতৃজাতিকে তথাগত শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভগবান এবারও দৃঢ়কণ্ঠে আনন্দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও আনন্দ একই প্রার্থনা জানালেন। এবং বুদ্ধ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এবার আনন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁর সহায়ক হল। সবিনয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে জানতে চাইলেন—'ভগবান, মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাঁরা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব মার্গ ফল লাভ করতে পারবেন কি?'—'হ্যাঁ পারবে।' এবার আনন্দ সুকৌশলে আরো যুক্তি উত্থাপন করলেন। বললেন—'প্রভু, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপনার মাতৃস্থানীয়া, বহু উপকারিণী, আপনার মাতৃ বিয়োগের পর তিনিই আপনাকে স্তন্যদান করেছেন, মাতৃস্নেহে আপনার পরিচর্যা করেছেন। সেই উপকার স্মরণ করে তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন।' এবার ভগবান আনন্দের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। অষ্ট 'গুরুধর্ম' পালনের বিনিময়ে গৌতমীর উপসম্পদা সমাপ্ত হল। পঞ্চ শতাধিক শাক্য রমণী প্রব্রজিত হলেন। ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল। এবার বুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে আনন্দকে বললেন—মাতৃজাতি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত না হলে সদ্ধর্ম সহস্র বৎসর স্থায়ী হত। যেহেতু মাতৃজাতি সংঘে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি পেয়েছে সেহেতু এই ধর্ম-বিনয় পঞ্চাশত বৎসর মাত্র স্থায়ী হবে।

প্রব্রজ্যালাভের পর দীর্ঘ দিন অর্হত্বলাভ না করলেও আনন্দের চরিত্র সপ্তবিধ দুর্লভ গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত ছিল। যেমন—

(১) ধর্ম-বিনয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। (২) প্রতীত্যসমুৎপাদ তাঁর অধিগত ছিল (৩) তিনি গভীর জ্ঞান ও কমনীয় মনের অধিকারী ছিলেন। (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত ছিলেন। শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে আনন্দের বিশেষ চারটি গুণের উল্লেখ করেন। যথা—(১) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা আনন্দের সাক্ষাৎলাভ করলে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। (২) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকারা আনন্দকে যতই দর্শন করুক তাদের তৃপ্তি হয় না। অবশেষে পরিষদ সমাপ্ত হলে আনন্দকে ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক অবস্থায় অতৃপ্ত মনে প্রত্যাবর্তন করে। (৩) আনন্দ যখন পরিষদে ধর্ম দেশনা দান করে তখন শ্রোতারা গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। কারণ আনন্দ মুধরভাষী ও সুনিপুণ ধর্মভাষক (৪) শ্রোতারা আনন্দের প্রদত্ত দেশনা শুনে দেশনা সমাপ্ত হলেও তাদের আরো শ্রবণের আগ্রহ থেকে যায়। বহু জন্মজন্মান্তরে আনন্দ মৈত্রী করুণাদি পূর্ণ করে, বহুবিধ গুণরাজীর অধিকারী হয়েছেন। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি (১) বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব লাভ করেন (২) বহুশ্রুত জ্ঞান লাভ করেন এবং ধর্মভাণ্ডাগারিক বা ধর্মরত্ন ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ উপাধি লাভ করেন। (৩) অগ্র স্মৃতিমান উপাধি লাভ করেন। (৪) অগ্র গতিমান অভিধা লাভ করেন। একপদ বা বাক্য থেকে ষাট হাজার পদ বা বাক্য নির্ভুলভাবে বলতে পারেন। এবং বুদ্ধের সমগ্র দেশনা জ্ঞাত হয়ে তা হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন। (৫) অগ্রধৃতিমান উপাধি লাভ—ধর্ম-নিয়ে, বুদ্ধের দেশনা আবৃত্তিতে, অনুশীলনে এবং প্রদানে এবং বুদ্ধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সহিষ্ণুতায় তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে অসদৃশ। শাস্তা বুদ্ধের শিক্ষায় আনন্দের মধ্যে এতগুলি মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছিল। শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারের ধর্মসভায় চারিপরিষদের উপস্থিতিতে ভগবান ঘোষণা করেন—আমার শ্রাবক সঙ্ঘের মধ্যে যারা বহুশ্রুত, স্মৃতিমান, গতিমান ও ধৃতিমান তাদের মধ্যে আনন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ। শিষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি গুরু সব সময়েই দিয়েছেন। একদা শ্রাবস্তীর এক উপাসক বুদ্ধরত্ন ও সংঘরত্নের পূজা সংকার করে ভগবানের কাছে ধর্মরত্নের পূজা করার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করলেন। বুদ্ধ বললেন—যদি ধর্মরত্নের পূজা করতে চাও তবে আনন্দের পূজা কর। আনন্দ হল ধর্মরত্নের অধ্যক্ষ। উপাসক প্রচুর খাদ্যভোজ্য ও ক্ষৌমবস্ত্র দ্বারা আনন্দের পূজা করলেন। আনন্দ সমস্ত দানীয় বস্ত্র ধর্মসেনাপতি শারিপুত্রকে দান করেন। শারিপুত্র তা ধর্মস্বামী ভগবান বুদ্ধকে দান করলেন। উপাসকের ধর্মপূজা পরম সাফল্য লাভ করল। ভগবানের অন্তিম সময়ে তাঁকে মল্লরাজ পুক্কুস প্রদত্ত মহার্ঘ দু'খানা বস্ত্রের একখানা তাঁর নির্দেশে আনন্দকে প্রদান করা হয়। কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্তপুরচারিণীদের ধর্মদেশনা দানের জন্য আনন্দ ভিক্ষুই যোগ্য উপদেশক নির্বাচিত হয়েছেন। পুরমহিলারা আনন্দের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন।

আনন্দের উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ছিল প্রশংসার্হ। রাজার মহামূল্য চূড়ামণি অপহৃত হয়। রাজাদেশে সর্বত্র এমনকি রাজ অন্তপুরেও অনুসন্ধান চলতে লাগল। রাণীরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। অবস্থা বুঝে আনন্দ একটি ব্যবস্থা দিলেন। বললেন—প্রাঙ্গনের নিভৃত স্থানে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করে নির্দেশ দিন রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকে কুম্ভে হস্ত ধৌত করে নিক। নির্দেশ মত কাজ শুরু হলে মণিচোর ভয়ে-ভয়ে কুম্ভে মণি নিক্ষেপ করে নিষ্কৃতি পেল।

এক সময় কোশলরাজ সহস্র মহার্ঘ বস্ত্র লাভ করে তার পঞ্চশত বস্ত্র রানীদের দান করেন। রানীরা তা উৎফুল্লচিত্তে আনন্দ স্থবিরকে দান করেন। রাজার মনে সংশয় উৎপন্ন হল ভিক্ষু আনন্দ এত বস্ত্রর কী করলেন? আনন্দ জানালেন সমস্ত বস্ত্র ভিক্ষুদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ভিক্ষুদের পরিত্যক্ত পুরাতন পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণতানুযায়ী ক্রমশ শয্যাস্তরণ, বসবার আসন, পাপোষ এবং সর্বশেষে গৃহ প্রলেপের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজা আনন্দিত চিত্তে আরো পঞ্চশত বস্ত্রও প্রসন্ন মনে আনন্দকে দান করলেন। ভিক্ষু কালুদায়ী আনন্দের উপর ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। আনন্দের দোষ ও ছিদ্রান্বেষণে তিনি রত থাকতেন। ভগবান একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে উদায়ীকে তিরস্কার করে বললেন, চিত্তপ্রসন্নতাহেতু আনন্দ যা পুণ্যসম্পদ অর্জন করেছে তাতে অনায়াসে সপ্তবার ইন্দ্রত্ব ও সপ্তবার চক্রবর্তী রাজত্ব লাভ করা যায়। আনন্দ অচিরেই অর্হত্ব লাভ করবে।

অনাথপিণ্ডিকের অনুরোধে আনন্দ ভগবানের অনুমতি নিয়ে জেতবনে মহাবোধিতরু রোপণ করেন। এই মহাবোধি তরু ভগবানের পারিভোগিক চৈত্যরূপে স্বীকৃত এবং আনন্দের প্রচেষ্টায় রোপিত হয়েছিল বলে আনন্দবোধি রূপে পরিচিতি লাভ করে।

আনন্দ ও প্রকৃতির কাহিনী একটি নিটোল আখ্যায়িকা। একদা পিপাসার্ত আনন্দ কূপ হতে পানীয় জল আহরণরতা এক তন্বী চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে জল প্রার্থী হলেন। আশ্চর্য অভিভূত প্রকৃতি বলল—'আমি অস্পৃশ্যা চণ্ডালিকা। আপনি কে মহাপুরুষ? আমার প্রদত্ত জল আপনি কি পান করবেন?' আনন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'আমি বুদ্ধশিষ্য আনন্দ। আমি তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণার জল কখনও অস্পৃশ্য হয় না।' প্রকৃতিদত্ত জল পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে আনন্দ বিহারের দিকে চলে গেলেন। অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়ে আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে প্রকৃতি তাঁর মাকে সব জানাল। মা আনন্দের পরিচয় অবগত হয়ে মেয়েকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু প্রকৃতি দৃঢ়সংকল্প। আনন্দকে সে বিয়ে করবে। অবশেষে যাদু মন্ত্র প্রয়োগ করে আনন্দকে মাতঙ্গীর কুটীরে আনয়ন করা হল। আনন্দ এলেন, কিন্তু মোহগ্রস্ত হলেন না। তিনি একাগ্র চিত্তে তথাগত বুদ্ধকে স্মরণ করে স্থির শান্ত ও সংযত ভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। চণ্ডালিনীর যাদুমন্ত্র ব্যর্থ হল। আনন্দ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। আনন্দের প্রস্থানের পর বিরহকাতরা প্রকৃতি আনন্দের অনুসন্ধান করে জেতবনের সন্নিকটে ভিক্ষারত আনন্দকে অনুসরণ করে জেতবনে উপস্থিত হল। ভগবান প্রকৃতিকে আহ্বান করে বললেন—আনন্দ সংসারত্যাগী ভিক্ষু, মুণ্ডিত মস্তক। তাকে বিয়ে করতে হলে তোমাকেও মুণ্ডিত মস্তক হতে হবে। প্রকৃতি পরম আনন্দে মস্তক মুণ্ডন করে নিল। এবার বুদ্ধ প্রকৃতিকে কায়গত স্মৃতি ভাবনার উপদেশ দিলেন। প্রকৃতি দেহস্থ দ্বাত্রিংশ অশুচির স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। অবিদ্যার নিরবশেষ সমাপ্তিতে প্রকৃতি তৃষ্ণামুক্ত হলেন। চণ্ডালকন্যা অর্হত্ব লাভ করলেন।

আনন্দের জীবনের চরম ভুল হল ভগবান যথাযথ আভাস ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবানের কাছে কল্পকাল বা ততোধিক কাল অবস্থানের জন্য প্রার্থনা করেননি। ভগবান আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেন। আনন্দ গভীর বেদনার সঙ্গে জানতে পারলেন তথাগত আয়ু ত্যাগ করেছেন। তিন মাসের মধ্যেই তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন। এই সুনিশ্চিত ও অমোঘ সত্য

প্রত্যাহার অসম্ভব। তাঁর কাছে কল্পায়ু প্রার্থনা করার সময়ও অতীত হয়ে গেছে। এটা স্থির বাক্য। তিনি আরো জানতে পারলেন এটা তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ।

ভগবান কর্মকারপুত্র চুন্দের আম্রকাননে অবস্থান কালে চুন্দের প্রদত্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে কঠিন রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। কুশিনারায় আগমন পথে বৃক্ষমূলে আনন্দ শ্রান্ত ক্লান্ত বুদ্ধের রোগশয্যা প্রস্তুত করে দেন এবং ককুথা নদী থেকে পানীয় জল আহরণ করে বুদ্ধকে প্রদান করেন। অতঃপর হিরণ্যবতী নদী তীরবর্তী কুশিনারায় মল্লগণের শালবনে উপনীত হয়ে ভগবানের আদেশে আনন্দ যমজ শাল বৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর অন্তিম-শয্যা প্রস্তুত করেন। অন্তিম শয়নে শায়িত বুদ্ধ ভিক্ষু ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান, চার মহাস্থান, মাতৃ জাতির প্রতি আচরণ, বুদ্ধের দেহ সৎকার, চারি স্তূপার্হ ইত্যাদি বিষয়ে আনন্দকে নির্দেশ প্রদান করেন। ভগবানের অন্তিম সময় আগত হলে আনন্দ অবোধ শিশুর মত ক্রন্দন পরায়ণ হলেন। ভগবান তাঁকে কাছে ডেকে সস্নেহে ঘোষণা করলেন—আনন্দ, দীর্ঘ দিন তুমি পরম মৈত্রীচিত্তে তথাগতের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য সেবা করে এসেছ, তুমি কৃতপুণ্য। এবার তোমার অর্হত্ব লাভের সময় আগত। তুমি অতন্দ্রিত হয়ে সাধানায় মগ্ন হও। ভগবান আরো ঘোষণা করলেন—'বস্ত্র-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে উপবিষ্ট পঞ্চদশ ভিক্ষুর মধ্যে আনন্দ জ্ঞানে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু স্রোতাপন্ন, অপায় বিমুক্ত এবং সম্বোধিপরায়ণ'। ভগবানের পরিনির্বাণের পর আনন্দ শোকে মুহ্যমান হলেন। তাঁর হৃদয়বিদীর্ণ শোকবার্তা হল—

'তদাসি যং ভিংসনকং—তদাসি লোমহংসনং,
সব্বকারবরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।'

সর্বগুণশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে লোমহর্ষ ভূমিকম্প বজ্র নির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ চমকিত হল।

কিন্তু পরম শোকও তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। তিনি কুশীনগরের মল্লদের কাছে বহন করে নিয়ে গেছেন শোকবার্তা, শোকাভিভূত নগরবাসী সর্বসাধারণকে বুদ্ধের মরদেহ দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি নির্ভুলভাবে সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এতটুকু কর্তব্যভ্রষ্ট হননি।

প্রথম সঙ্গীতিতে আনন্দের উপস্থিতির অপরিহার্যতা সংঘের ভিক্ষুগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দ তখনও অর্হত্ব প্রাপ্ত হননি। সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে প্রথম সঙ্গীতিকারক পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দের জন্যও একটি আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। সঙ্গীতি আরম্ভ হতে আর একটি রাত্রি মাত্র সময়। আনন্দ কায়গত স্মৃতি ভাবনায় মনোযোগী হলেন। গভীর তন্ময়তা, অনির্বচনীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টায় তিনি সাধন পথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু চরম ক্ষণ তখনও অনাগত। এদিকে বিনিদ্র রজনী অবসান হতে চলেছে। আনন্দের শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে চরম হতাশা। তিনি একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলেন। শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে শয্যায় শয়নের জন্য পাদদ্বয় ভূমি হতে উত্তোলন করেছেন, মস্তকও উপাধানের দিকে নমিত হয়েছে ঠিক এমন সময়ে তাঁর অন্তর আস্রব মুক্ত হল। কর্মচক্রের গতিবেগ হল রুদ্ধ। খ্রী. পূ. ৫৪৫ অব্দের শ্রাবণী পূর্ণিমায় তিনি অর্হত্ব লাভ করলেন। যথা সময়ে আনন্দ সঙ্গীতিতে যোগদান করলেন। তিনি মহা সঙ্গীতিতে ধর্ম সম্বন্ধে ভগবানের দেশনা আবৃত্তি করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পরও আনন্দ কিন্তু নিষ্কৃতি পাননি। ভিক্ষুসংঘের বিভিন্ন অভিযোগ তিনি বিনয়-বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর যখন একশত বিশ বৎসর বয়স তখন তিনি রোহিণী নদীর উভয় তীরের জনসাধারণকে জানালেন আর ছয় সপ্তাহ কাল পরে তিনি পরিনির্বাপিত হবেন। সাধারণ মানুষ শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে নদীর দুই তীরে সমবেত হতে লাগল। নদীর দুই তীরের জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা আনন্দ তাঁদেরই ভূমি ভাগে পরির্নিবৃত হন। আনন্দ বুঝলেন তাঁর পরিনির্বাণের পর দুই তীরের জনগণের মধ্যে তাঁর দেহধাতু নিয়ে বিবাদের সূচনা হবে। সুতরাং ভূমিভাগ ত্যাগ করে আকাশ অবলম্বনে দেহত্যাগ করতে হবে। আকাশে উত্থিত আনন্দ মধুর কণ্ঠে নদীর দুই তীরের সমবেত সকলকে ধর্মদেশনা দান করলেন। তিনি তেজঃকসিন ভাবনায় চিত্ত স্থির করলেন এবং অগ্নি প্রজ্বলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে পরিনির্বাণ লাভ করলেন। তাঁর দেহ-ধাতু সমভাগে বিভক্ত হয়ে উভয় তীরবাসী জনগণের কাছে পতিত হল।

সূত্র ঃ

১. বিনয় পিটক, Vol. I, II, (Mahāvagga, Cūlavagga) ed. H. Oldenberg, P. T. S. 1969, 1977.

২. দীঘনিকায়, Vol. II, (Mahāparinibbāna Sutta). T. W. Rhys Davids and J. E. Carpenter, P. T. S. 1982.

৩. থেরগাথা, ed. H. Oldenberg, P. T. S., 1883, 1966

৪. জাতক, মহাসার (৯২), (১৫৭ গুণ), ভিক্খাপরম্পরা (৪৯৬), খুল্লহংস (৫৩৩)

৫. অঙ্গুত্তর নিকায়, Vol I-III, (তিক, চতুক্ক, পঞ্চক নিপাত) ed. R. Morris and E. Hardy, P.T.S., 1961, 1976, 1976.

৬. থেরগাথা অট্ঠকথা, ed. F. L. Woodward, Vol II and III, P. T. S., 1977, 1984.

৭. পরমত্থজোতিকা Vol II, ed. Helmer Smith, P. T. S. 1977.

৮. মনোরথপূরণী, Vol. I, ed. M. Walleser, P. T. S., 1973.

৯. ধম্মপদট্ঠকথা Vol. III, IV, ed. H. C. Norman, P. T. S. 1912, 1914.

১০. শার্দূলকর্ণাবদান, দিব্যাবদান, ed. E. B. Cowell and R. A. Neil, Cambridge, 1886 ; Nepalase Buddhist Literature, Rajendra Lal Mitra, p. 223.

১১. আনন্দ, শীলালঙ্কার মহাস্থবির, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫

১২. Ānanda the man and monk, Maha Bodhi Society of India,

আশা দাশ

আনন্দবোধি

জেতবনের প্রবেশপথে আনন্দ যে বোধিবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন সেটিই আনন্দবোধি। অনাথপিণ্ডিকের নেতৃত্বে সাবত্থীনগরের অধিবাসীগণ আনন্দের কাছে নিবেদন করে যে ভগবান বুদ্ধ যখন সময়-সময় ভ্রমণে বহির্গত হন তখন এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন

যেখানে তাঁরা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পুষ্প ও সুগন্ধী নিবেদন করতে পারে। বুদ্ধের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর এবং মোগ্‌গল্লানের সাহায্যে আনন্দ গয়ার বোধিবৃক্ষ থেকে একটি ফল এনেছিলেন এবং বিশাল ও বিশিষ্ট এক জমায়েতের সম্মুখে (যার মধ্যে কোশলের রাজা পসেনদি ও বিশাখা উপস্থিত ছিলেন) ফলটিকে জেতবনের প্রবেশদ্বারে রোপণ করেছিলেন। বীজটি রোপিত হয়েছিল অনাথপিণ্ডিকের দ্বারা প্রদত্ত সুগন্ধযুক্ত মৃত্তিকাপূর্ণ একটি সুবর্ণ পাত্রে। অবিলম্বে একটি চারাগাছ দেখা গেল যার উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচ হাত এবং পাঁচটি শাখার প্রত্যেকটি পাঁচ হাত দীর্ঘ। আটশত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে রাখা সুরভিত জল রাজা সেখানে ঢেলে দিয়েছিলেন। নতুন বৃক্ষকে পূত করার জন্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ সেখানে একটি রাত ধ্যানস্থ হয়ে কাটিয়েছিলেন। যেহেতু আনন্দ এই চারাটি রোপণ করেছিলেন সেজন্য সেটি আনন্দ-বোধি নামে পরিচিত। বুদ্ধের দর্শন মানসে আগত তীর্থযাত্রীগণ ঐ আনন্দ-বোধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করত। এই বোধিবৃক্ষের প্রসঙ্গেই পদুম জাতক এবং কলিঙ্গবোধিজাতক—দুটিরই প্রচার ঘটেছিল।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names. G. P. Malalasekera. Vol. I. Page 275]

বেলা ভট্টাচার্য

আনন্দ ভদ্‌দেকরত্ত সুত্ত (আনন্দ ভদ্রেকরক্ত সূত্র)

এটি মজ্ঝিমনিকায়ের তৃতীয় খণ্ডের বিভঙ্গ বর্গের অন্তর্গত। এটি ১৩২ নং সূত্র। একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুগণকে উৎসাহিত করছিলেন এবং ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ্য ও বিভঙ্গ সম্পর্কে দেশনা দিচ্ছিলেন। তখন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে অবগত হলেন যে আনন্দ ভিক্ষুগণকে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণটি যথাযথ হল কিনা—সেজন্য আয়ুষ্মান আনন্দ পুনরায় তথাগতের নিকট বিবৃত করলেন। তা হল কেহ সুদীর্ঘ অতীতকে অনুসরণ করে আনন্দ লাভ করে। অতীত আমার এইরূপ ছিল। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এরূপ। এইরূপে অতীতকে অনুসরণ করে। সুদীর্ঘ অতীতকে লোক কিরূপে অনুসরণ করে না? অতীত তার এরূপ ছিল মনে করে সে তাতে আনন্দলাভ করেনা। কিরূপে লোক সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে? অনাগতে তার এরূপ হোক মনে করে আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এরূপ। কিরূপে সে সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে না। কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্নধর্মে আকৃষ্ট হয়? অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে, আর্যগণের দর্শন লাভ করে না, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও ঐরূপ। এইভাবেই লোকে প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকৃষ্ট হয়। কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না? শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, আর্যগণের দর্শন লাভ করে, যে আর্যধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষ ধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখে না, আত্মাকে রূপবান দেখে না, আত্মায় রূপ দেখে না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এরূপেই লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকৃষ্ট হয় না।

ভগবান তথাগত আনন্দের ভাষণে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং আনন্দের প্রশংসা করেছিলেন কারণ তিনি ভিক্ষুগণকে উত্তমরূপে ভাষণ দিয়েছেন।

ভগবান বুদ্ধের ভদ্রকরক্ত সূত্রে (১৩১নং) ভিক্ষুগণকে ভগবান যা ভাষণ দিয়েছেন তা আনন্দ ভদ্রকরক্ত সূত্রে (১৩২নং) ভিক্ষুগণকে পুনরায় ভাষণ দিয়েছেন বলে এটিকে আনন্দ ভদ্রকরক্ত সূত্র বলে অভিহিত করা হয়।

[দ্রষ্টব্য : ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, মজ্ঝিমনিকায় (৩য় খণ্ড) পৃষ্ঠা ১৫২ ; Majjhima Nikāya, P. T. S. Vol. 111 page, 189-91.

Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol. 1. page, 275.]

বেলা ভট্টাচার্য

আভস্‌সর (আভাস্বর)

এটি একটি ব্রহ্মজগৎ। দীঘনিকায়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল সূত্রে এই নামটি পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অতীত হবার পর এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে দেবতাগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বরজগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তারা সেখানে মনোময় হয়ে থাকে। প্রীতি তাদের (পীতিভক্‌খা) ভক্ষ্য স্বরূপ হয়, তারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এই আভাস্বর জগৎ রূপলোকে এবং দ্বিতীয় ধ্যানস্থানে অধিষ্ঠান করে। দীর্ঘকাল এই জগৎ অতীত হবার পর এই জগতের বিবর্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগৎ হতে চ্যুত হয়ে শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হয়ে থাকে। প্রীতি তাদের ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করে। দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করে, তার মনে উদ্বেগ, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। সে তখন অন্যজীবগণ ঐ স্থানে আসুক মনে মনে সেই আশা পোষণ করে। ঐ সময়েই অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বর লোক হতে চ্যুত হয়ে তার সঙ্গীরূপ ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তারা সেখানে মনোময় হয়ে থাকে। প্রীতি তাদের ভক্ষ্য হয়। তারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব মনে মনে এরূপ চিন্তা করে যে, সে ব্রহ্মা মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। তাঁর প্রার্থনায় পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণ এই স্থানে আগমন করেছে এবং পশ্চাৎ উৎপন্ন সত্ত্বগণ ভাবে যে অগ্রে উৎপন্ন সত্ত্বই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। তাঁরা পূর্ব্বের ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। যিনি প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য ও পরাক্রমশালী। আর যারা পশ্চাতে উৎপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য ও অল্প পরাক্রমশালী। তৎপরে কোন এক সত্ত্ব ঐ স্থান হতে চ্যুত হয়ে এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করে তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করে অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ ও সম্যক চিন্তার দ্বারা চিত্তসমাধিপ্রাপ্ত হন এবং ঐ সমাধি অবস্থায়

পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্তী জন্ম স্মরণ করতে অক্ষম হন। তিনি সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। তাঁর দ্বারাই তারা সৃষ্ট হয়েছে। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্ম্মী, তিনি অনন্ত। পরে যারা এসেছে তারা তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট। পরে যারা আগত তারা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও পরিবর্ত্তনশীল। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন যে তাঁদের পৃথিবীতে জন্ম হয় স্বয়ংপ্রভভাবে (opapātika) এবং তাঁরা মনোময় (manomaya). বুদ্ধঘোষ বলেন যে এই আভস্‌সর দেবগণের দেহ হতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, সেজন্য তাঁদের আভস্‌সর বলা হয়। (daṇḍadīpikāya acci viya etesam sarīrato ābhā chijjitvā chijjitvā patanti viya sarati visaratī ti Ābhassarā).

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol I page, 279-280 ; Dīgha Nikāya, Vol. I, page 17-18 ; Dialogues of the Buddha, Rhys Davids, page, 30-32, দীঘনিকায়, ভিক্ষু শীলভদ্র, পৃষ্ঠা ২০-২২.

বেলা ভট্টাচার্য

আমিষ

আমিষ কথাটি সাধারণত খাদ্যবস্তু (খাদনীয়ম্‌-ভোজনীয়ম্‌) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৈদিক 'আম' এই শব্দটি থেকে আমিষ শব্দটির উৎপত্তি। 'আম' শব্দটির অর্থ 'কাঁচা' বা 'অপক্ব'। পালি সাহিত্যে আমক (কাঁচা), আমগন্ধ (কাঁচা মাংসের গন্ধ), আমগিদ্‌ধ (মাংসলোলুপ) প্রভৃতি বৈদিক 'আম' শব্দের সমার্থক।

'আমিষ' শব্দটির মূলতঃ অর্থ 'কাঁচা মাংস'। অপর মানে 'শারীরিক' বা 'শরীর সম্বন্ধীয়' যা মন বা আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতকে (জাতক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮) আমরা দেখতে পাই 'আমিসনতি খাদনীয়ভোজনীয়ম্‌', অঙ্গুত্তর নিকায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ১১) এ আমিষকে এক প্রকার দান আবার কখনও ধম্মদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বুদ্ধ কখনও ভিক্ষুদের আমিষ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেননি। মজ্ঝিম-নিকায় এ দেখা যায় তিনি ভিক্ষুদের আমিষ গ্রহণের বিপক্ষে বললেও ধম্মদানের সপক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের আমিষ সঞ্চয় (আমিস-সন্নিধি) না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দীঘ-নিকায়-অট্‌ঠকথা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩) অনুসারে যে সমস্ত মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষু আমিষ সঞ্চয় করতেন তাঁদেরকে মুণ্ডকুটম্বিক-জীবকারূপে অভিহিত করা হয়েছে। ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের বা ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের মধ্যে কোনরূপে আমিষ আদান-প্রদানের ব্যাপারে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।

পালি-সাহিত্যে আমিষ বলতে অল্প-স্বল্প লাভ বা প্রলোভনকেও বোঝায়। (মজ্‌ঝিম-নিকায়-১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩ ; অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮ ; সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)।

চিত্তরঞ্জন পাত্র

আয়তন

আয়তন শব্দের অর্থ হলো গৃহ, আবাস, বাসস্থান, আসন, আধার, মূলভূমি, উৎস বা উৎপত্তিস্থল। "আয়তন" শব্দটি বৈদিক সাহিত্যেও প্রচলিত আছে। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতে আ + য়ম = আয়ত এর সঙ্গে তুলনীয়। আয়তন বহু বচনান্ত শব্দ। আয়তনের স্বচ্ছন্দ সংজ্ঞা হলো "আয়স্‌স বা তনতো, আয়তস্‌স সংসার-দুক্‌খস্‌স নয়নতো আয়তনানি"। সাধারণতঃ আয়তন বলতে প্রকৃতি (আয়তন), মূল (আয়) মানসিক শক্তি এবং মুখ্য (নয়ন) বলে বুঝতে হবে। অধিকন্তু আয়তনকে ভাণ্ডার, মিলনক্ষেত্র এবং জন্মস্থানরূপে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, শিক্ষায়তন, দেবায়তন ইত্যাদি, এক কথায় আবাসস্থল বলেই এটা আয়তন। আয়তন ষড়ইন্দ্রিয় এবং ষড় জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—নামরূপের কারণে ষড়ায়তন। আবার ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারকে বলা হয় ছয় আয়তন। যেমন—চক্ষু আয়তন, শ্রোত্রায়াতন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন, মনায়তন, রূপ (আলম্বন), শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম। প্রত্যেকের ১-৬ পর্যন্ত অন্তরায়তন এবং ৭-১২ পর্যন্ত বহিরায়তনও বিদ্যমান। রূপালম্বন কায়িকধর্ম দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে নীল, হলুদ, লাল, আলো, অন্ধকার প্রভৃতির উদয় হয় এবং এর হেতুতেই দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। মনায়তন হলো পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত রূপ। তন্মধ্যে বিজ্ঞান, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু, ভবাঙ্গ চিত্ত (যা আয়তনে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং মনোদ্বার বলে বিবেচিত)। সেখানে পঞ্চ কায়েন্দ্রিয় হলো পাঁচ প্রকার বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার।

আয়তন নাম ও রূপভেদে দুই প্রকার। কারণ মনায়তন হলো মনোধর্মের একটি অংশ, ইহা নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলো হলো 'রূপ'। মনায়তন হিসেবে বিভক্ত করলেও সমস্ত আয়তন কুশল, অকুশল, বিপাক, কৃত্য এবং চিত্তভেদে ৮৯ প্রকার অথবা ১২১ প্রকার (৮১ প্রকার লৌকিয় এবং ৪৩ প্রকার লোকোত্তর)।

অন্তরায়তন ও বহিরায়তন ভেদেও আয়তন দুই প্রকার ; সকল আয়তন অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বলে অন্তরায়তন শূন্য গ্রামের সঙ্গে তুলনীয়। বহিরায়তন দস্যু আক্রান্ত গ্রামের সঙ্গে তুলনীয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ, অনু ঃ বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃঃ ২৩০।

বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব—রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২২৩-২২৪।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, নারদ মহাস্থবির, অনুঃ সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, কলিকাতা ১৯৯১, পৃঃ ৩০১।

অভিধর্ম- দর্পণ—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মধ্যমগ্রাম-১৩৮১, পৃঃ ১২-১৩]

জিনবোধি ভিক্ষু

আয়তপণ্‌হি—আয়তনপর্ষ্ণি

আয়ত অর্থে প্রশস্ত, বিশাল, বিস্তৃত, আজানুলম্বিত ইত্যাদি বোঝায়। পার্ষ্ণি অর্থে গুলফ বা গোড়ালিকে বোঝানো হয়েছে। আয়তপণ্‌হি বলতে বোঝায় পায়ের গোড়ালি। আবার পায়ের পরিপূর্ণ গোড়ালিও বলা হয়।

দীঘনিকায়ের লক্ষণ সূত্রের বলা হয়েছে যে,—যিনি মহাপুরুষ তিনি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ সম্পন্ন। যিনি বুদ্ধ তিনি মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন। তথাগত বুদ্ধের পায়ের গোড়ালি পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পায়ের চারিভাগের দুইভাগ পদাগ্রের দিকে, তৃতীয় ভাগে জঙ্ঘা সংস্থিত এবং চতুর্থভাগ জঙ্ঘাকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত করেছিল। ইহা উক্ত দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণের একটি লক্ষণ। তাই বলা হয়েছে—

চক্কবরঙ্কিত-রত্ত-সুপাদো
লক্খণ-মণ্ডিত-আয়তপণ্হি ;
চামর-ছত্ত-বিভূসিতপাদো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

অর্থাৎ—

"শ্রেষ্ঠ চক্রাঙ্কিত রাঙা চরণ,
গুল্ফ বিস্তৃত সুদৃশ্য লাঞ্ছন ;
চমরী-চামর ভূষিত পাদ,
তিনি তব পিতা পুরুষসিংহ।"

যশোধরা পুত্র রাহুলের কাছে তাঁর পিতার দৈহিক গুণ বর্ণনা দেবার সময় এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড অনুঃ ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি, কালি-১৯৪৭, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃঃ ৫২৯, দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড ঐ, পৃঃ ৯৬।

সুত্ত নিপাত—অনুঃ সাধনানন্দ মহাস্থবির, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪৯।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আয়াচিতভত্ত জাতক (আয়াচিতভক্ত জাতক, ১৯)

লোকে বাণিজ্যার্থে দূরদেশে যাওয়ার সময় দেবতাদের পশুবলি দিত এবং যদি সাফল্য লাভ করে ফিরে আসি তাহলে আবার পশুবলি দিয়ে পূজো করবো—দেবতার কাছে এরূপ মানত করে যাত্রা করতো। যদি সত্যিই সাফল্য লাভ করে স্বদেশে ফিরত, তাহলে দেবতাদের অনুগ্রহেই এরূপ সুবিধা রয়েছে এই ভেবে অঙ্গীকার হতে নিষ্কৃতি লাভার্থে পুনরায় অনেক প্রাণী হত্যা করতো। একদিন জেতবনস্থ ভিক্ষুরা শাস্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে দেবতাদের নিকট পশুবলি দিলে কিছু উপকার হয় কিনা। তদুত্তরে শাস্তা বলেছিলেন যে—পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন পল্লীভূস্বামী গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষবাসী দেবতাকে পশুবলি দেবার মানত করে বিদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখান হতে ফেরার পর বহু প্রাণীবধ দ্বারা মানত শোধ দেওয়ার জন্য সেই বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সময় বৃক্ষ দেবতা বৃক্ষস্কন্ধে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে একটি গাথার দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন—জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ মানবগণ আত্মমুক্তি

লাভ করে, অজ্ঞান পাষণ্ড ব্যক্তিগণ জীবে হিংসা করে। তখন থেকে লোকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়ে ধর্মপথে বিচরণপূর্বক দেবলোকের অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। জাতকটি প্রাণবধ জাতক নামে উল্লিখিত। এখানে বৃক্ষদেবতা হলেন স্বয়ং তথাগত। আয়াচিত শব্দের অর্থ প্রার্থনা বা মানত।

[দ্রষ্টব্য : জাতক, ঈশান ঘোষ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯ ; Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol. 1, page, 283-284]

বেলা ভট্টাচার্য

আয়ুপাল

একজন থের। সাগলের নিকটবর্তী সংখ্যেয় পরিবেণতে বাস করতেন। রাজা মিলিন্দের রাজজ্যোতির্বিদ প্রবীণ আয়ুপালকে জানিয়েছিলেন যে রাজা তাঁর দর্শনাভিলাষী। তাঁর অনুমতি পেয়ে রাজা পাঁচশত সহচর পরিবৃত হয়ে পরিবেণতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পাঁচশত সহচর দ্বারা (yonakas) পরিবৃত রাজা থের আয়ুপালের সঙ্গে আলোচনা করেন। 'যদি গৃহীরাও মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, তাহলে ভিক্ষুদের প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা নিরর্থক নয় কি?' আয়ুপাল রাজা মিলিন্দের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নি।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper names. G. P. Malalasekera. Vol. 1. page, 284 ; মিলিন্দপঞ্হ (PTS) পৃঃ ১৯]

বেলা ভট্টাচার্য

আরঞ্ঞিকংগ—আরণ্যিক ব্রত

আরণ্যিকাঙ্গ বা অরণ্যে নিবাস বা বসবাসকারী বলে এর নাম আরণ্যিক। তার অঙ্গ—আরণ্যিকাঙ্গ। আরণ্যিক ধুতাঙ্গ ব্রত অধিষ্ঠানকারীকে গ্রাম্য শয়নাসন ত্যাগ করে অরণ্যেই অরুণোদয় কাল পর্যন্ত বাস করতে হয়। যাঁরা দিবা-রাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে অরণ্যে বাস করেন তাঁদের আরণ্যিক ধুতাঙ্গ ব্রত উৎকৃষ্ট। যাঁরা বর্ষার চারি মাস গ্রামে বাস করেন অবশিষ্ট আটমাস অরণ্যে বাস করেন, তাঁদের বলা হয় মধ্যম আরণ্যিক। মৃদু আরণ্যক ধুতাঙ্গ ব্রতধারিগণ হেমন্তকালেও গ্রামে বাস করতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে স্বীয় রুচি অনুযায়ী গ্রামে বাস করলে অরুণোদয় মাত্রই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান ভঙ্গ হয়ে যায়।

এইভাবে আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারীর অরণ্যে বিহারের ফলে তাঁর নূতন সমাধি লাভ হয় এবং লব্ধ সমাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবিক্ষিপ্ত চিত্তে তখন সুখে অবস্থান করেন সাধক।

[দ্রষ্টব্য : বিশুদ্ধিমার্গ—অনু : শ্রমণ পুর্ণানন্দ স্বামী ও শ্রী গোপাল দাস চৌধুরী, কলিকাতা ১৯২৩, পৃঃ ৭৩-৯৯।

বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধ তত্ত্ব—রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১০৪-১১৪।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আরম্মণ (আলম্বন)

পট্‌ঠান বা পট্‌ঠান-পকরণ অভিধম্ম পিটকের সপ্তম ও শেষ গ্রন্থ। এটিতে চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় (পচ্চয়) এর বর্ণনা আছে। এই চব্বিশ প্রকার পচ্চয়-এর মধ্যে আরম্মণ বা আলম্বন এক প্রকার প্রত্যয়।

রম্ ধাতু হতে আরম্মণ শব্দের উৎপত্তি—অর্থ হল রমিত হওয়া বা আনন্দ লাভ করা। লম্ব ধাতু হতে, আলম্বন শব্দের উৎপত্তি—এর অর্থ হল নির্ভর করা ঝুলে থাকা। যাতে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজক (subject) রমিত হয় অথবা নির্ভর করে তা বস্তু বা বিষয় (object). যে বস্তু বা বিষয়ে কর্তা রমিত হয় ঝুলে থাকে তাই আরম্মণ বা আলম্বন। আলম্বন ছয় প্রকার। চক্ষু ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, শব্দাদি পঞ্চ শ্রেণীর আলম্বন এবং মন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত কিছুই ধর্মালম্বন অর্থাৎ এই ছয় প্রকারের যে কোনটি প্রত্যয়ধর্ম (পচ্চয়ধম্ম) এবং চিত্ত-চৈতসিক পচ্চয়ুপ্পন্ন ধম্ম (যং যং ধম্মং আরব্ভ যে যে ধম্মা উপ্পজ্জন্তি চিত্ত-চেতসিকা ধম্মা, তে তে ধম্মা তেসং তেসং ধম্মানং আরম্মণপচ্চয়েন পচ্চয়ো)।

বৌদ্ধ দর্শন মতে আরম্মণ বা আলম্বন প্রত্যয়রূপে পরিগণিত হতে পারে। যখন কোন মানসিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় অর্থাৎ চিত্ত উৎপন্ন হয়, তা কোন বিষয় বা বস্তুকে অবলম্বন করে সংঘটিত হয়। এখানে সেই বিষয় বা বস্তু কার্যকারণ সম্পর্কে আলম্বন প্রত্যয়। সমস্ত বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। যখন কোন কার্য সংঘটিত হয় তার পশ্চাতে কারণ অনিবার্য। কারণ ব্যতীত কার্য সংঘটিত হয় না। পট্‌ঠানে আরম্মণ প্রত্যয়ের সেরূপ ভূমিকা দেখা যায়। যেমন, রূপ চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন প্রত্যয়, শব্দ শ্রোত্র বিজ্ঞানের আলম্বন প্রত্যয়। এরূপ যার অবলম্বনে সমস্ত চিত্ত চৈতসিক উৎপন্ন হয়, তা চিত্ত চৈতসিকের আলম্বন। এতে চিত্ত চৈতসিক রমিত হয় বলে এটি আরম্মণ ; বিচরণ করে বলে গোচর (বিচরণ ভূমি) ; একে ভোগ্য বস্তুরূপে ব্যবহার করে বলে বিষয় এবং এটি চিত্ত চৈতসিকের নিবাসস্থান বলে আয়তনও বলা হয়।

[দ্রষ্টব্য : অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি পৃষ্ঠা, ১০৮।

বৌদ্ধ সাহিত্য, বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, পৃষ্ঠা, ১০৬ ; অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, পৃষ্ঠা, ৩১৮

Pali English Dictionary, PTS, page, 107]

বেলা ভট্টাচার্য

আরম্মণপচ্চয়—আলম্বন প্রত্যয়

যে বস্তু বা বিষয়ে কর্তা রমিত হয় বা ঝুলে থাকে তাই আলম্বন। প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রধান, কারণ, হেতু, নিদান প্রভৃতি হতে পারে। যার সহায়তায় কোন কার্য সম্পন্ন হয়, ঘটনা সংঘঠিত হয়, ফল উৎপাদিত হয় তা-ই ঐ কার্য, ঘটনা বা ফলের প্রত্যয়। সুতরাং এই অর্থে প্রত্যয় শব্দ "সাহায্যকারক" বা "উপকারক" রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সংস্কারের উৎপাদনে

অবিদ্যা সহায়করূপে কার্য করে। অবিদ্যার সহায়তা ব্যতীত সংস্কার উৎপন্ন হতে পারে না। দধি উৎপাদনের জন্য দুগ্ধ প্রত্যয়রূপে কাজ করে। জগতে বিনা কারণে কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক কার্যের মুখ্য ও গৌণ অনেকগুলি কারণ থাকে। প্রত্যেকটি কারণই একেকটি প্রত্যয়রূপে কাজ করে।

আলম্বন এর অপর নাম অবলম্বন, গোচর, বিষয় বা আয়তন, চিত্ত-চৈতসিক এতে রমিত হয় বলে "অবলম্বন", একে ভোগ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করে বলে 'বিষয়', এতে বিচরণ করে বলে "গোচর" এবং চিত্ত-চৈতসিকের আবাস বলে "আয়তন" নামে অভিহিত হয়। আলম্বন চিত্ত চৈতসিকের ক্রীড়াভূমি। জরা-জীর্ণ, রুগ্ন ব্যক্তি যেমন যষ্টির উপর ভর করে উত্থিত হয় সেইরূপ চিত্ত-চৈতসিকও রূপ, শব্দ, গন্ধাদি প্রভৃতির অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ যার আশ্রয়ে চিত্ত চৈতসিকের উৎপত্তি হয় তা-ই এর অবলম্বন। এইরূপ আলম্বনের উপরই চিত্ত-চৈতসিক ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আলম্বন ব্যতীত চিত্ত-চৈতসিকের ক্রিয়া নিরুদ্ধ বলা যায়। সুতরাং এই আলম্বন গ্রহণ প্রতিগ্রহণ, নির্বাচন এবং এতে চিত্তের অবস্থানের উপরই মানুষের কুশলাকুশল নির্ভর করে। চিত্ত-চৈতসিকও পরস্পর পরস্পরের আলম্বন সাপেক্ষ। একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করাকেই মহাপট্ঠানে "আলম্বন প্রত্যয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলম্বন গ্রহণের মাধ্যমেই অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু চৈত্ত-চৈতসিক হলো আমাদের অর্ন্তজগৎ এবং আলম্বন হলো বর্হিজগৎ। বুদ্ধ বর্হিজগতকে কল্পনামাত্র বলে কখনো উড়িয়ে দেন নি। আলম্বন বা বর্হিজগৎ সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার জন্যই তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রূপ চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন প্রত্যয়, লৌকিক বা লোকোত্তর সব কিছুই মনের আলম্বন হতে পারে।

সকল প্রকার চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নির্বাণ, প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন প্রত্যয়, বস্তুতঃ পক্ষে বিশ্বে এমন কোন ধর্মই (= অবস্থা) নেই যা চিত্তের আলম্বন হয় না। মানুষ অর্থ চায়, কারণ সে অর্থ ব্যতীত জগতে বাঁচতে পারে না। তদ্রূপ চিত্তও আলম্বন চায়, কারণ কোন না কোন আলম্বন ব্যতীত ইহা থাকতে পারে না। আলম্বন ছয় প্রকার। যথা— রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্প্রষ্টব্যালম্বন এবং ধর্মালম্বন। সমস্ত প্রকার রূপ রূপালম্বন, সমস্ত প্রকার শব্দ শব্দালম্বন, সমস্ত প্রকার গন্ধ গন্ধালম্বন, সমস্ত প্রকার রস রসালম্বন, সমস্ত প্রকার স্প্রষ্টব্য এবং কঠিনতা, কোমলতা, উত্তাপ শৈত্য, গতি-গুরুত্ব ইত্যাদি স্প্রষ্টব্য সমূহ স্প্রষ্টব্যালম্বন। ধর্মালম্বন ছয় প্রকার, যথা—প্রসাদরূপ, সূক্ষ্মরূপ, চিত্ত, চৈতসিক, নির্বাণ এবং প্রজ্ঞপ্তি। চিত্ত ও তার সহজাত চৈতসিকের উৎপত্তিতে আলম্বনের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। অতএব আলম্বন সহায়তাদানে চৈত্ত-চৈতসিকের প্রত্যয় হয়। এই জন্য একে বলা হয় আলম্বন—প্রত্যয়। সংশ্লিষ্ট চিত্ত-চৈতসিক সেই প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন। নাম, রূপ, প্রজ্ঞপ্তি ও নির্বাণ যা কিছু চিত্ত-চৈতসিকের আলম্বন হয়, সমস্তই আলম্বন প্রত্যয়। তা-ই বলা হয়েছে উক্ত ছয় প্রকার ধর্মালম্বনই আলম্বন-প্রত্যয় ধর্ম এবং সমস্ত প্রকার চিত্ত-চৈতসিক হচ্ছে আলম্বন-প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম।

অতএব, আলম্বন-প্রত্যয় আলম্বনের আকারে চিত্ত এবং চৈতসিকের উৎপত্তির কারণ। যেমন রূপালম্বন চক্ষুবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ, শব্দালম্বন শ্রোত্রবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ

ইত্যাদি। তদ্রূপ মনে উৎপন্ন যে কোন আলম্বন মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। মনালম্বন কায়িক, মানসিক, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, বাস্তব বা কাল্পনিক যা কিছু হতে পারে।

এও উল্লেখ্য যে—আলম্বন যখন অত্যন্ত প্রীতির, লোভের বা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয় তখন তা আলম্বনাধিপতি বা আলম্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয়ধর্মী হয়। তদুভয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম ৮ লোভসহগত চিত্ত, ৮ মহাকুশল চিত্ত, ৪ জ্ঞানসম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া, ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৪৭ চৈতসিক, আলম্বন-প্রত্যয় রূপ, নাম, প্রজ্ঞপ্তি ও নির্বাণ ; কিন্তু এদের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম সর্বদা চিত্ত-চৈতসিক।

[দ্রষ্টব্য ঃ Patthāna, Vol. 1-6, Ed. by Mrs Rhys Davids, P. T. S. London, 1906 ; 1922-23.

পট্‌ঠান ১ম খণ্ড, অনুঃ ডঃ সুকোমল চৌধুরী, কলি-১৯৯৭, পৃঃ v - vi, ১-৩।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ-অনুঃ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম-১৯৪০, পৃঃ ১০৮-১০৯, ২৪৮।

অভিধর্ম-দর্পণ—শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মধ্যমগ্রাম, ১৩৮; বৌদ্ধ সাহিত্য-ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, পৃঃ ১৩৯। কলি-১৯৯৫, পৃঃ ১০৬।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আরামদূসক জাতক[১] (জাতক, ৪৬)

পূর্বকালে বারাণসীর রাজা বিশ্বসেনের সময় একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাজার উদ্যানপালক সেই উৎসবে যোগদান করার মানসে উদ্যানবাসী মর্কটগুলিকে তাহার অনুপস্থিতিতে বাগানের চারাগাছগুলিতে জল দেওয়ার জন্য আদেশ দেয়। মর্কটদের কয়েকটি চামড়া নির্মিত পাত্র দেয় কাজ করার জন্য ও উৎসবে চলে যায়। মর্কটরা সেইমত গাছের গোড়ায় জল সেচন করতে শুরু করে। সেই সময় তাদের দলনেতা তাদের বলে যে জল দুষ্প্রাপ্য বস্তু। জলের অপচয় হওয়া ঠিক নয়। সে প্রস্তাব করে গাছগুলিকে উপড়িয়ে ফেলা হোক এবং দেখা হোক কোন গাছের মূল কতটা দীর্ঘ। মূলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী জলসেচন করতে হবে। মর্কটদের মধ্যে একদল তখন গাছগুলিকে উপড়িয়ে ফেলতে থাকে আর অন্যদল গাছগুলিকে আবার রোপণ করে সেগুলির মূলের দৈর্ঘ অনুযায়ী জলসেচন করতে থাকে। বোধিসত্ত্ব সেইসময়ে বারাণসীতে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবার সেই বাগানে গিয়ে মর্কটদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রশ্ন করেন কে তাদের ঐরকম কাজ করতে বলেছে। মর্কটরা তাদের দলনেতার নাম বলে। বোধিসত্ত্ব তখন বলেছিলেন যে তাদের দলনেতারই যদি ঐরকম মূঢ়ের মত বুদ্ধি হয় তাহলে তাদের বুদ্ধি যে কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। বক্তব্যটি তিনি গাথার সাহায্যে বিশদভাবে বলেছিলেন।

তাঁর গাথা শুনে মর্কটরাও একটি গাথার মাধ্যমে বলেছিলেন যে তারা মূর্খ নয় কারণ মূল না দেখে গাছের কতটা জল দরকার তা কিভাবে বোঝা যাবে। বোধিসত্ত্ব তখন অপর

একটি গাথার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি মর্কটদের নিন্দা করেননি। নিন্দার পাত্র বিশ্বসেন যার উদ্যানে ঐরকম বৃক্ষরোপকের স্থান পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কোশলে থাকার সময় বুদ্ধ কাহিনীটি বলেছিলেন। গ্রামের ভূস্বামী বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন ও তাঁদের ভোজনের শেষে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার জন্য বলেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একটি রিক্ত ভূখণ্ড দেখেছিলেন এবং উদ্যানপালকের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে পূর্বে একটি বালকের কাজ ছিল গাছে জল সেচন করা। সে জল দেওয়ার আগে গাছগুলি কিভাবে জন্মায় তা দেখার জন্য গাছগুলিকে উৎপাটিত করত। ভারহুত স্তূপে ক্ষোদিত এই কাহিনীটি লক্ষ্য করা যায়।

[দ্রষ্টব্য : জাতক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৯-৫১]

আরামদূসক জাতক² (আরামদূস জাতক, ২৬৮)

এখানে কাহিনীটি উপরে লেখা কাহিনীর মতই। পার্থক্য শুধু এই যে বানরগুলিকে এক সপ্তাহের জন্য জল সেচন করতে বলা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ও মর্কট অধিপতির মধ্যে কথোপকথন কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কাহিনীটি কোশল ঘটিত নয়—দক্ষিণ গিরির একটি বালকের প্রসঙ্গে।

সমাধানে বলা যায় যে তখন এই উদ্যাননাশক বালক ছিল বানরদিগের সেই অধিনেতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।

[দ্রষ্টব্য : জাতক, ঈশান ঘোষ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৬-২৭

Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, page Vol. 1. page, 287.]

বেলা ভট্টাচার্য

আরূপ্প—আরূপ্য বা অরূপতা

অরূপতা অর্থে অরূপ লোকভূমিকে বোঝায়, 'লোক' বলতে কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। তন্মধ্যে অরূপলোক বলতে বলা হয়েছে যে লোকে রূপ নেই—বিজ্ঞান আছে মাত্র। প্রবল মানসিক শক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে বিজ্ঞান সাময়িকভাবে রূপে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরূপলোকে অবস্থান করে। চারি অরূপধ্যানানুযায়ী অরূপলোকও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, আকিঞ্চনায়তন, এবং নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন। এই চারিটিকে অরূপ ভাবনাও বলা হয়। অরূপ ভাবনা দ্বারা চার অরূপ ধ্যান লাভ হয়, এই ধ্যান লাভ করলে ধ্যানী অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে পারে। ইহা চিত্তজকুশলকর্ম।

(১) **আকাশানন্ত্যায়তন :**— আকাশের সৃষ্টি যেমন নেই, তেমনি তার বিনাশও নেই। তার আদিও নেই, অন্তও নেই। তাই আকাশ অনন্ত। তাই আলম্বন অর্থে আয়তন। এই আকাশ অর্থাৎ এই ধ্যান আকাশানন্ত্যায়তন (আকাশ + অনন্ত + আয়তন) নামে অভিহিত। অনন্ত আকাশের ধারণায় মগ্ন হয়ে ধ্যানী সর্বপ্রকার রূপ বা ভৌতিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তা

পরিহার করেন। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ তাঁর নির্বিকার নির্লিপ্ত চিত্তকে স্পর্শ করে না। তিনি তাঁর ধ্যানের মগ্নতার মধ্যে অনন্ত আকশের সঙ্গে চিত্তকে একত্রীভূত দেখেন বা একাত্মতা অনুভব করেন। তখন 'আমি' 'তুমি' দ্বৈতবোধ তাঁর থাকেনা, আত্মপরভেদ হারিয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে শুধু অনন্ত অসীম আকাশ যা ঘটে পটে সর্বত্র বিদ্যমান। এই হচ্ছে প্রথম অরূপধ্যান—আকাশানন্তায়তন চিত্ত। এতে অসীম আকাশের অনুভূতি হয়।

(২) **বিজ্ঞানানন্তায়তন ঃ—** আকাশানন্তায়তন ধ্যানচিত্ত লাভের পর যে ধ্যানন্তর আয়ত্ত হয়, তাকে বলা হয় বিজ্ঞানানন্তায়তন। বিজ্ঞান বা চিত্তের উৎপত্তি বিলয় আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত সীমাবদ্ধ হলেও অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করাতে একে অনন্ত বলা হয়েছে। উৎপত্তি বিলয়ের সীমা ছাড়িয়ে চিত্ত অনন্ত আকাশের সঙ্গে একীভূত হওয়ায় পর সেই অনন্ত আকাশময়, অনন্তচিত্তকে আলম্বন করে যোগী বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানানুশীলন করেন। অনন্তকে ব্যাপৃত করে বলে অনন্ত বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। এই ধ্যানের মধ্যে যে অনন্ত বিজ্ঞানের প্রকাশ, তা বিজ্ঞানানন্তায়তন।

(৩) **আকিঞ্চনায়তন ঃ—** আকিঞ্চনায়তন ধ্যান হচ্ছে তৃতীয় অরূপধ্যান। বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যান আয়ত্ত করে তাতে পারদর্শী হয়ে তৃতীয় অরূপধ্যানের অনুশীলন করতে হয়। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে তখন অনন্তবিজ্ঞান যেন কিছুই নয়, তার ভগ্নাংশও অবিদ্যমান। বিজ্ঞানের অবিদ্যমানতা বা অভাবের সূত্র ধরে মনে হয় কিছু নেই কিছু নেই—শুধু শূন্য, শূন্য। অবিদ্যমানতা বা শূন্যতা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। একে বলা হয় আকিঞ্চন অর্থাৎ কিছু নেই। তখন তিনি সর্বতোভাবে বিজ্ঞানানন্তায়তন অতিক্রম করে আকিঞ্চনায়তন ধ্যান আয়ত্ত করেন।

(৪) **নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ঃ—** যোগী অবিদ্যমানতা বা শূন্যতাকে আলম্বন করে যে আকিঞ্চন ধ্যান আয়ত্ত করেন তা অত্যন্ত ধীর শান্ত বলে প্রতিভাত হয়। তখন যোগী সংজ্ঞা সমূহকে রোগতুল্য, গণ্ডতুল্য, শল্যতুল্য মনে করেন। এই প্রশান্ত অবস্থাতে সংজ্ঞাও নেই, অসংজ্ঞাও নেই, তাই একে বলা হয় নৈবসংজ্ঞানাংসংজ্ঞায়তন। এতেই যোগী অর্পণা ধ্যানবিধি অবগত হন।

এই চারি অরূপ ধ্যানের ধ্যানাঙ্গ হচ্ছে উপেক্ষা ও একাগ্রতা। বলা বাহুল্য—প্রথম অরূপ ধ্যানের চেয়ে দ্বিতীয় অরূপধ্যান সূক্ষ্মতর এবং শান্ততর। তেমনি দ্বিতীয় অরূপধ্যানের চেয়ে তৃতীয় অরূপধ্যান এবং তৃতীয় অরূপ ধ্যানের চেয়ে চতুর্থ অরূপ ধ্যান সূক্ষ্মতর ও শান্ততর।

[দ্রষ্টব্য ঃ বিশুদ্ধিমার্গ—অনুঃ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ও গোপাল দাস চৌধুরী, কলিকাতা-১৯২৩, পৃঃ ২১২-২২৪, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা—শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী—বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাষ্ট, দত্তপুকুর, ১৯৮৪, পৃঃ ৬৬-৭০, বুদ্ধের যোগনীতি—শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির, প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯৫২, পৃঃ ৯৭-১০১।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সী কলিকাতা-১৯৯৭, পৃঃ ২৫৪-২৫৭।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আর্যদেব

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক এবং উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য নাগার্জুনের প্রধান শিষ্য। 'আর্যদেব' ছাড়াও তাঁর অনেক নাম ছিল যেমন দেব, বোধিসত্ত্বদেব, কাণদেব, কর্ণরিপ, নীলনেত্র, পিঙ্গলনেত্র, পিঙ্গলচক্ষু ইত্যাদি। তবে আর্যদেব নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অনেকের মতে তিনি দক্ষিণভারতের কোনও ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকীর্তি ও তিব্বতী ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ছিলেন শ্রীলংকার রাজা পঞ্চশৃঙ্গের পুত্র। অল্প বয়সেই তিনি পণ্ডিত হেমদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। গুরুর নিকট অবস্থান করে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তারপর তীর্থস্থান দর্শনাভিলাষী হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ঘটনাক্রমে আচার্য নাগার্জুনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং নাগার্জুনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাগার্জুনও শিষ্যকে দীক্ষা দেবার আগে তাকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। আর্যদেবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আচার্য নাগার্জুন তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। তাই অনেকে আর্যদেবকে নাগার্জুনের ধর্মপুত্ররূপেও অভিহিত করেছেন। আর্যদেবও গুরুর যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন এবং আজীবন অক্লান্তভাবে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। আর্যদেবের মতো সুযোগ্য শিষ্য না পেলে নাগার্জুনের পক্ষে তাঁর শূন্যবাদ বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচার করা সম্ভব হতো না। কারণ রাজপৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কোনও দেশে কোনও ধর্মমত স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। নাগার্জুনের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণভারতের রাজারা ছিলেন ঘোর বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। নাগার্জুনের পক্ষে সম্ভব হয় নি এ সকল রাজাদের স্বমতে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু আর্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিকট রাজারা মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর্যদেব একে একে দক্ষিণভারতের সকল রাজাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। একাজে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল, কারণ দক্ষিণভারতে তখন তীর্থিকদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তীর্থিকদের বশীভূত করে রাজাদের স্বমতে প্রতিষ্ঠিত করতে তাই আর্যদেবকে অনেক বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছিল এবং কত যে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

আর্যদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা হচ্ছে 'নাগার্জুনের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম'। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল ভাষায় বহুমুখী ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা নাগার্জুনের শূন্যবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এজন্য তাঁকে অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে তাঁকে সাংখ্য, বৈশেষিক ও জৈন দার্শনিকদের বিরূপ সমালোচনাকে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে নানা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধবিদ্বেষী বিধর্মী মতবাদ সমূহকে খণ্ডন করে শূন্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে লেখনীরূপ অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে।

আর্যদেব যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলোর লক্ষ্য ছিল শূন্যবাদ তথা মাধ্যমিক দর্শনের বিশদ ব্যাখ্যা। তাঁর মূল গ্রন্থাবলী এখন সবই বিলুপ্ত। চীনা ও তিব্বতীভাষায় এদের কিছু অনুবাদমাত্র পাওয়া যায়। চীনা ত্রিপিটক থেকে আমরা জানতে পারি যে আর্যদেব মাত্র ৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তিব্বতী ত্রিপিটকে তাঁর নামে ২৩ খানি গ্রন্থ বিদ্যমান। তবে চীনা ও তিব্বতী ত্রিপিটক পর্যালোচনা করে আর্যদেবের নামে ৯ বা ১০ খানি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। যেমন, চতুঃশতক, মাধ্যমিকশাস্ত্র, শতশাস্ত্র, শতশাস্ত্র বৈপুল্য, অক্ষরশতক, মহাপুরুষশাস্ত্র, হস্তবাল প্রকরণ প্রভৃতি।

(১) চতুঃশতক ঃ—ইহা আর্যদের প্রধান গ্রন্থ। ১৩টি অধ্যায়ে রচিত। সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না। সংস্কৃত মূল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ থেকে। টীকাকার চন্দ্রকীর্তির মতে চতুঃশতকের প্রথম চারটি অধ্যায়ে কেবল লৌকিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য হল, যা কিছু উৎপন্ন হয় তা পরিণামধর্মী এবং অনিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে অনিত্য ধর্মসমূহ দুঃখোৎপত্তির কারণ, তাই অশুচি। তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য এই যে অশুচি ধর্ম সমূহের প্রতি আমিত্ব ও মমত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ের বক্তব্য হল অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষ দুঃখকে সুখ, অনিত্যকে নিত্য এবং অশুচিকে শুচি বলে মনে করে। এই মিথ্যাদৃষ্টি দূর করতে হবে এবং এর জন্য বোধিসত্ত্বচর্যার প্রয়োজন আছে, তাই পঞ্চম অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বচর্যা আলোচিত হয়েছে। চিত্তক্লেশ বোধিসত্ত্বচর্যার অন্তরায়স্বরূপ, তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্তক্লেশ দূরীভূত করে চিত্তশুদ্ধির উপায় বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আছে ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত থাকার উপায়। অষ্টম অধ্যায়ে আছে শিষ্যের করণীয় অকরণীয় বিষয়ক শিক্ষা। নবম থেকে ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জাগতিক বিষয়সমূহকে সম্যক্‌ভাবে জানার জন্য সাধনা করতে হবে। সাধনার দ্বারাই উপলব্ধি করা যাবে যে 'শূন্যতাই' জগতের একমাত্র সত্য, দ্বিতীয় কোনও সত্য নেই।

(২) মাধ্যমিকশাস্ত্র ঃ—নাগার্জুন এবং আর্যদেব যৌথভাবে এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। নাগার্জুনের 'মূল্যমাধ্যমিককারিকা' এই শাস্ত্র থেকে ভিন্ন। এতে মাধ্যমিক-কারিকার ৫০০ শ্লোকের টীকা আছে। কুমারজীব চীনাভাষায় এর অনুবাদ করেছেন।

(৩) শতশাস্ত্র ঃ—এই গ্রন্থকে চতুঃশতকেব সারাংশ বলা যেতে পারে। কারণ এতে চতুঃশতকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এর চীনা অনুবাদ পাওয়া যায় কিন্তু তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায় না। জাপানের সান্‌-রোন্‌ এবং চীনের সান্‌-লুঙ্‌ সম্প্রদায়ের তিনটি প্রধান গ্রন্থের মধ্যে এটি অন্যতম।

(৪) শতশাস্ত্র বৈপুল্য ঃ—এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু চতুঃশতকের শেষের ৮টি অধ্যায়ের অনুরূপ। আচার্য ধর্মপাল এর টীকাকার। হিউয়েন-সাঙ্‌ চীনাভাষায় এর অনুবাদ করেছেন।

(৫) অক্ষরশতক ঃ—এতে মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিপাদ্যবিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এর তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। মতান্তরে নাগার্জুন এর গ্রন্থকার।

(৬) মহাপুরুষশাস্ত্র ঃ—বোধিসত্ত্ববিষয়ে মহাযান মতাদর্শ এতে আলোচিত হয়েছে। কেবল চীনাভাষাতেই এর অনুবাদ পাওয়া যায়।

(৭) হস্তবাল প্রকরণ ঃ—মাত্র ৬টি কারিকায় এই গ্রন্থে মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিপাদ্যবিষয় ব্যক্ত হয়েছে। এর চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। মতান্তরে আচার্য দিঙ্‌নাগ এর রচয়িতা।

আচার্য আর্যদেবের নামে আরও কিছু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। স্থানাভাবে সেগুলোর আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হল। তবে একটি বিষয় জ্ঞাতব্য যে 'আর্যদেব' নামে দ্বিতীয় একজন তান্ত্রিক লোকের নাম পাওয়া যায় যার আবির্ভাব হয়েছিল ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে অর্থাৎ আচার্য আর্যদেবের অনেক পরে। তাঁর নামে ১৮ খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

আলবক

আলবীর রাজা আলবক। তাঁর সৈন্যদলকে যথাযথ রাখার জন্য তিনি সপ্তাহে একবার শিকারে যেতেন। একদিন মৃগয়া করার সময়ে রাজা যেখানে তাঁর লক্ষ্যবস্তু প্রাণীটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেখান থেকে সেই প্রাণীটি পালিয়ে যায়। প্রথানুসারে সেটিকে ধরাই রাজার উচিত। তিনি প্রায় এগার মাইল গিয়ে সেই প্রাণীটিকে অনুসরণ করে সেটিকে নিহত করেন এবং দ্বিখণ্ডিত করেন। পরে তিনি ঐ প্রাণীটিকে কোন আধারে করে বহন করে নিয়ে আসেন এবং ফেরার পথে তিনি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ অতিক্রম করেন যেটি আলবক যক্ষের নিবাস ছিল। যক্ষাধিপতির নিকট হতে ঐ যক্ষ একটি বরলাভ করেছিল—ঐ বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে কেউ গেলে তাকে সে ভক্ষণ করতে পারে। সেই বরানুসারে সে আলবক রাজাকে আক্রমণ করে এবং পরে রাজাকে মুক্তি দেয় এক চুক্তিতে যে সে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে যক্ষকে একটি মনুষ্যদেহ এবং একপাত্র খাদ্য দেবে।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, vol. 1. page, 291.]

বেলা ভট্টাচার্য

আলয়বিঞ্ঞাণ—আলয়বিজ্ঞান

আলয় এবং বিজ্ঞান এই দুইটি শব্দের সংমিশ্রণে আলয়বিজ্ঞান পদ গঠিত। আলয় শব্দের অর্থ হচ্ছে আগার, স্থান বা আধার এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে সচেতনতা। অতএব আলয় বিজ্ঞান হচ্ছে সকল চেতনার (ধর্মের) আধারস্বরূপ যে বিজ্ঞান। সকল সাংক্লেশিক ধর্মের বীজস্থান বলে একে বলা হয় আলয়। অথবা ইহা সকল ধর্মের কারণভাবে উপনিবদ্ধ হয় বলে একে আলয় বলা হয়েছে। একে আবার বিপাকও বলা হয়েছে। কারণ সকল ধাতু, গতি, যোনি এবং জাতি সমূহে এর মধ্যে কুশল এবং অকুশল কর্মের বিপাক হয়। একে আবার "সর্ববীজক" বলা হয়ছে। কারণ এটা ধর্ম সমূহের বীজের আশ্রয়।

আলয়বিজ্ঞান মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য অসঙ্গ (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক)। অনাত্মবাদের সমর্থনে ও রক্ষাকল্পে তিনি সর্বপ্রথম আলয়বিজ্ঞানের কথা প্রচার করনে। তাঁর মতে সত্ত্বগণের অনন্ত জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে এই আলয়বিজ্ঞান subject বা উদ্দেশ্যরূপে কাজ করে। তিনি তাঁর "প্রকরণার্যবাচশাস্ত্র" এবং "মহাযানসংগ্রহ শাস্ত্র" নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই মতবাদকে সুষ্ঠু রূপদান করেন তদীয় ভ্রাতা আচার্য বসুবন্ধু "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি নামক গ্রন্থে।

যোগাচার মতে এই আলয়বিজ্ঞান হচ্ছে অষ্টমবিজ্ঞান। আগের সাতটি বিজ্ঞান হচ্ছে, যথাক্রমে—চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং মন। অপর সাতটি বিজ্ঞানের ন্যায় এই আলয়বিজ্ঞানও সালম্বন এবং সাকার। ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্য উভয়রূপে প্রবৃত্ত হয়।

যোগাচার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে আলয়বিজ্ঞান পরমসত্তা। এই সত্তা থেকে তাঁরা পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয়ের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন। বস্তুতঃ সমস্ত বস্তু এবং চিন্তা চেতনার সমন্বয়ে গঠিত হয় 'মন'। মনের সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের বিভ্রান্তিজনিত যে অবস্থা তাকেই বলা হয় ভ্রান্তি বা অজ্ঞান। এই আলয়বিজ্ঞানকে আবার "মূল বিজ্ঞান" বলা হয়েছে। কারণ ইহা সকল বিজ্ঞানের বীজ। অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্বন্ধ হচ্ছে সমুদ্র ও তরঙ্গের

ন্যায়। আলয়বিজ্ঞান হচ্ছে সমুদ্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞান হচ্ছে তরঙ্গ। অতএব আলয়বিজ্ঞান থেকে অন্যান্য বিজ্ঞান ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে। ভিন্ন নহে এইজন্য, যেহেতু আলয়বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের আধারস্বরূপ। যেমন সমুদ্র তরঙ্গরাশির আধার। আবার অভিন্নও নহে, কারণ আধার এবং আধেয় এক নহে ; সমুদ্র ও তরঙ্গ ভিন্ন। চক্ষুরাদি ষড় বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিষয়ের গ্রহণ ; সপ্তম বিজ্ঞান বা মনের কাজ হচ্ছে গৃহীত বিষয়ের উপলব্ধি এবং অষ্টম বিজ্ঞান বা আলয়বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিষয়ের ধারণা।

স্তরভেদে আলয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন নাম আছে। যেমন বিপাক, আদান, অমল এবং আদর্শজ্ঞান। যখন বোধিসত্ত্ব অষ্টমস্তর বা অর্হত্ত্ব লাভ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় "বিপাক"। এই স্তরে সপ্তম বিজ্ঞান অর্থাৎ মনের কোন প্রভাব থাকে না। যখন বোধিসত্ত্ব পরিপূর্ণ বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় "আদান বিজ্ঞান"। কারণ "বুদ্ধত্ব" অব্যাকৃত হতে পারে না, তা নিত্য শুদ্ধ ও অমল। তাই বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্বের ফল উপভোগ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় "অমল"। এই সর্বোত্তর স্তরে বিজ্ঞানের ক্রিয়া অপেক্ষা জ্ঞান বা প্রজ্ঞা অধিক শক্তিসম্পন্ন বলে তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় "আদর্শ বিজ্ঞান"।

আলয়বিজ্ঞান সর্বদা পাঁচ প্রকার সর্বত্রগামী চৈতসিকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যথা—স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা। বেদনা আবার তিন প্রকার, যথা—সুখ, দুঃখ এবং উপেক্ষা। আলয়বিজ্ঞান কুশল এবং অকুশল কর্মের বিপাক বলে সুখ এবং দুঃখ এতে অবস্থান করতে পারে না। অতএব উপেক্ষাই আলয়বিজ্ঞানের বেদনা। পুনরায় আলয়বিজ্ঞানকে অনিবৃতাব্যাকৃত বলা হয়। কুশল বা অকুশল কোন পর্যায়ে একে ব্যক্ত করা যায় না বলে একে অব্যাকৃত এবং মনোভূমিক আগন্তুক উপক্লেশ সমূহের দ্বারা আবৃত হয় না বলে তা অনিবৃত।

এই আলয়বিজ্ঞানকে জলের স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—জলের স্রোত যেমন ক্ষণিক এবং প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল—দুই মুহূর্ত এক স্থানে স্থির থাকে না, আলয়বিজ্ঞানও তদ্রূপ ক্ষণিক এবং নিত্য পরিবর্তনশীল।

আলয়বিজ্ঞান প্রবাহরূপে সংসারের স্থিতি পর্যন্ত অব্যবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান থাকে। জলপ্রবাহ যেমন তন্মধ্যে পতিত তৃণ-কাষ্ঠ-গোময়াদিকে ভাসিয়ে নিয়ে প্রবাহরত থাকে, তদ্রূপ আলয়বিজ্ঞান কুশল, অকুশল এবং আনেঞ্জ (স্থির অর্থাৎ কুশলও নহে অকুশলও নহে) কর্মবাসনার দ্বারা অনুগত স্পর্শ, মনস্কারাদিকে স্রোতোবৎ ভাসিয়ে নিয়ে সংসারের স্থিতি পর্যন্ত প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। তবে এর শেষ কোথায়? বলা হয়েছে যে, অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিতেই এর নিবৃত্তি। ক্ষয়জ্ঞান এবং অনুৎপত্তিজ্ঞান লাভের দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করা যায়। এই অর্হত্ত্ব অবস্থাতে আলয়বিজ্ঞানস্থিত সকল দৌষ্ঠুল্য অর্থাৎ কর্মবীজ বা ক্লেশের নিরবশেষ প্রহাণ হয় বলে তখন আলয়বিজ্ঞানের অন্তিম পরিণতি হয়।

[দ্রষ্টব্য : বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি :— শ্রীমদাচার্যবসুবন্ধুকৃত, অনু ও সম্পাদিত, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, প্রকাশন বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা-১৯৭৫, পৃঃ ১২১-১২৩।

মাইণ্ড এণ্ড মেন্টাল ফ্যাক্টর ইন আর্লি বুদ্ধিষ্ট সাইকলোজি (ডঃ অমল বড়ুয়া) নিউ দিল্লী—১৯৯০, পৃঃ ৫-৬।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আলবী

সাবথী হতে ত্রিশ এবং বেনারস হতে বারো যোজন দূরে অবস্থিত একটি শহর। এটি সাবথী এবং রাজগৃহের মধ্যে অবস্থিত। ভগবান তথাগত আলবীতে অগ্গালব আরামে অনেক সময় থাকতেন। অগ্গালব আরামটি শহরের নিকটেই অবস্থিত ছিল। বুদ্ধত্বলাভের ষোল বছর পরে ভগবান বুদ্ধ আলবীতে বস্‌সাবাস করেন এবং ৮৪০০০ জন শ্রোতার নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। আলবীর রাজা আলবক নামে পরিচিত এবং তাঁর অধিবাসীগণ আলবকা নামে পরিচিত। শহরটি পরে আলবক যক্ষ এবং হৃথক আলবকের নিবাসস্থল রূপে খ্যাতি লাভ করে। থেরী সেলা আলবীতে জন্মগ্রহণ করেন সেজন্য তিনি আলবিকা নামে পরিচিতা। আলবীতে বহু ভিক্ষু ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে। একদা সাবথীতে থাকার সময় বুদ্ধ জনৈক আলবীর দরিদ্র কৃষককে দেখেন এবং সেই শহরে গিয়ে ধর্ম প্রচার করবেন স্থির করেন। কৃষক জানতেন বুদ্ধ আলবীতে আছেন, তিনি স্থির করেন যে বুদ্ধকে দর্শন করবেন, তিনি খাদ্য গ্রহণ না করেই সাবথীর অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে আলবীতে স্বয়ং তথাগত এবং তাঁর ভিক্ষুসংঘ অধিবাসীদের দ্বারা খাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু দরিদ্র কৃষকের জন্য স্বয়ং তথাগত অপেক্ষা করেছিলেন। কৃষক তথায় উপস্থিত হলে ভগবান বুদ্ধ তাকে কিছু খাদ্য দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। খাদ্য গ্রহণ করার পর দরিদ্র কৃষক বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হয় ও তাঁর দেশনা শ্রবণ করে পরিশেষে স্রোতাপত্তি লাভ করেন।

অপর একটি ঘটনা হল—কোন এক তাঁতীর কন্যার জন্য বুদ্ধ জেতবন থেকে আলবী পর্যন্ত এসেছিলেন। মিসেস রিজ ডেভিড্‌স বলেন যে, আলবী গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ (সুত্ত নিপাত, পৃষ্ঠা ৩) আলবকের ঘোষণার উপর নির্ভরশীল। আলবক বলেছিলেন তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে তিনি বুদ্ধকে গঙ্গার পরপারে নিক্ষিপ্ত করবেন। কিন্তু গঙ্গার পরপার সম্ভবত: আলঙ্কারিক প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে ভৌগোলিক যাথার্থ্যের কোন সম্বন্ধ নেই।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, vol. 1. page, 295-296.]

বেলা ভট্টাচার্য

আলোককসিন—আলোককৃৎস্ন

পালি 'কসিন" শব্দের অর্থ সকল বা সম্পূর্ণ, অট্‌ঠসালিনী সকলার্থে কৃৎস্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। অঙ্কুরটীকা বলে—সকলার্থে কৃৎস্ন, কর্ষণ করে—নিঃশেষ হয়—অর্থে যা নিঃশেষভাবে প্রবর্তিত হয় বলে কৃৎস্ন। একে এক প্রকার ভাবনা বলা হয়। "আলোককৃৎস্ন" অর্থে আলোকে ভিত্তি বা আলম্বন বা বিষয় হিসেবে ভাবনায় রত হওয়াকে বোঝায়। বাতায়ন ইত্যাদির ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট আলো "আলোককৃৎস্নের" আলম্বন হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে শমথ ভাবনার কর্মস্থান বা সাধন প্রণালী চল্লিশ প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কৃৎস্নভাবনা দশ প্রকার, যথা পৃথিবীকৃৎস্ন, অপকৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন,

নীলকৃৎস্ন, পীতকৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন, শ্বেতকৃৎস্ন, আকাশকৃৎস্ন ও আলোককৃৎস্ন। বস্তুত: ক্ষিতি, অপপ্রভৃতি চারভূত, চার রকমের বর্ণ, আকাশ ও আলোক অবলম্বন করে এই সাধনা পদ্ধতি। এইগুলির প্রত্যেকটিকে কর্মস্থান বলা হয়। আলোককৃৎস্ন ভাবনা তাদের মধ্যে অন্যতম ভাবনা পদ্ধতি। সাধক আলোককৃৎস্ন ধ্যান করতে গিয়ে যে কোন ছিদ্রপথে বা বাতায়ন পথে ঘরে আগত "আলোকে" নিমিত্তরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার সম্পন্ন যোগী ছিদ্রাদির ভেতর দিয়ে চন্দ্রালোক বা দীপালোক বা সুর্যালোক ভূমিতে পড়ে যে মণ্ডল উৎপন্ন করে তা দেখেই নিমিত্ত উৎপাদন করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ যোগীরা উক্ত আলোক মণ্ডলকে লক্ষ্য করে "অবভাস" "অবভাস", বা "আলোক" 'আলোক', বলে মনোদ্বারে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে নিমিত্ত গ্রহণ করে থাকেন। যদি রাত্রে ভাবনা করতে হয় তবে একটি মৃন্ময়পাত্রে গোলাকার একটি ছিদ্র করে এর মুখখানি বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর পাত্রের ভেতরে প্রদীপ জ্বেলে এর মুখটি প্রাচীর বা কোন তক্তার উপর প্রতিফলিত করতে হয়। তখন গোলাকার যে আলোক মণ্ডল দেখা যাবে তা দেখেই "আলোক" "আলোক" জপে জপে ভাবনা করা যায়। এই আলোক মণ্ডলকে ধ্যানের অবলম্বন রূপে নির্বাচন পূর্বক তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিত্তকে স্থির অচঞ্চলে রাখতে সচেষ্ট হওয়াই "আলোককৃৎস্ন" ভাবনা চর্চা। এই ভাবে গৃহীত ধ্যানালম্ব উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত ভূমিতে পতিত আলোকমণ্ডলের ন্যায় হয়ে থাকে। আর প্রতিভাগ নিমিত্ত স্বচ্ছালোকপুঞ্জের মত প্রতিভাত হয়।

আলোককৃৎস্ন ভাবনা প্রভাবে সিদ্ধযোগী স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) বিতাড়ন, অন্ধকার দূরীকরণ ও দিব্য চক্ষু দ্বারা রূপদর্শনার্থ আলোককরণ ইত্যাদি ঋদ্ধিলাভ হয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ বিশুদ্ধিমার্গ—১ম ভাগ, পি. টি. এস., লন্ডন, পৃঃ, ১৭৪-১৭৫।

বিশুদ্ধিমার্গ—অনুঃ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ও শ্রী গোপাল দাস চৌধুরী, কলিকাতা-১৯২৩, পৃঃ ১,৫৮,৬০, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১৯৯৭, পৃঃ ২২৭-২২৯। বিশুদ্ধমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব—রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃঃ, ১৪৭। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—অনুঃ সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, কলিকাতা-১৯৯১, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৬।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আবজ্জন—আবর্তন

আবর্তন বা আবর্জ্জন অর্থ মনোনিবেশ। চিত্ত বা মন ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত বা মনের এই ধর্ম প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির ধারাকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়। চিত্ত স্রোত বা প্রবাহ মাত্র। নদীবক্ষে তরঙ্গরাশির মত চিত্ত একের পর এক উৎপন্ন হয় এবং অনুরূপ ভাবে বিলয়প্রাপ্ত হয়। চিত্ত কোন আলম্বন ছাড়া উৎপন্ন হতে পারেনা। চিত্তের এই আলম্বনকে বলা হয় চিত্তবৃত্তি বা চৈতসিক। যে আলম্বনকে আশ্রয় করে চিত্ত বা মন উৎপন্ন হয় তাকে তৎজাতীয় চিত্ত বা মন রূপে অভিহিত করা হয়। কুশল চৈতসিকের সঙ্গে কুশলচিত্ত অকুশল চৈতসিকের সঙ্গে অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়। এইভাবে ৫২ প্রকার চৈতসিককে আলম্বন করে ৮৯ বা ১২১ প্রকার চিত্ত বা মন উৎপন্ন হয়।

আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় রয়েছে। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের বস্তুনিচয় সম্পর্কে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানসিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মে। মন যখন বহিরিন্দ্রিয়ের দিকে আবর্তিত হয় তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং আবার যখন অন্তরের দিকে আবর্তিত হয় তখন মনোজগতের ঘটনাপুঞ্জ সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। প্রথম শ্রেণীর আবর্তন বা আবর্জনকে পঞ্চদ্বারাবর্তন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আবর্তনকে মনোদ্বারাবর্তন নামে অভিহিত করা হয়।

আবর্তন বা আবর্জন নামক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ছয় প্রকারে, যথা—(১) প্রতিসন্ধি বা জন্ম চিত্তের প্রতি আবর্তিত হয়ে, (২) জবন বা দ্রুতগামী চিত্তের প্রতি আবর্তিত হয়ে, (৩) তদালম্বন বা নির্দিষ্ট চিত্তের প্রতি আবির্তিত হয়ে, (৪) ব্যবস্থাপন চিত্তের প্রতি আবর্তিত হয়ে, (৫) কখনও কখনও জবন বা দ্রুতগামী এবং চ্যুতি বা স্খলিত চিত্তের প্রতি আবর্তিত হয়ে, (৬) তদালম্বন বা নির্দিষ্ট চিত্তের প্রতি আবর্তিত হয়ে।

আবর্তন বা আবর্জনের সঙ্গে ভবাঙ্গ চিত্তের এক নিবিড় যোগ রয়েছে। ভবাঙ্গ অর্থ ভবের অঙ্গ। এখানে ভব অর্থে অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে, ভবাঙ্গ সত্তার আবশ্যকীয় শর্ত। যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। দুই চিত্তক্ষণ কখনো একই সঙ্গে উৎপন্ন হতে পারেনা বা একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারেনা। প্রতিটি চিত্তক্ষণ কোন বস্তুকে আলম্বন করে উৎপন্ন হয়। বাহ্য অথবা মানসিক কোন আলম্বন ব্যতীত চিত্ত উৎপন্ন হয় না। গভীর নিদ্রার সময় স্বপ্নবিহীন অবস্থায় মন থাকে নিষ্ক্রিয়। চিত্তের প্রতিসন্ধিক্ষণে এবং চ্যুতিক্ষণেও চিত্তের এই একই অবস্থা দৃষ্ট হয়। অভিধর্মে এই ধরণের চিত্ত প্রবাহকে বলা হয়েছে ভবাঙ্গ স্রোত। অন্যান্য চিত্তের ন্যায় ভবাঙ্গ চিত্তও তিনটি ধর্মের অধীন। এই চিত্তের রয়েছে উৎপত্তি (উপ্‌পাদ), স্থিতি ও বিলয় (ভঙ্গ)। উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় এই তিন চিত্তক্ষণ একত্রে এক চিত্তক্ষণ। নদীর স্রোতধারার ন্যায় চিত্তপ্রবাহ দুই মুহূর্ত এক স্থানে স্থির হয়ে না থেকে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে বয়ে চলেছে।

মানব জীবনে কুশল-অকুশল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে জবন চিত্তের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জবন চিত্তকে আলম্বন বা বস্তুর প্রতি দ্রুত ধাবমান চিত্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ জবন চিত্ত সপ্তচিত্তক্ষণ অথবা পঞ্চচিত্তক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট বস্তু আলম্বনকে আশ্রয় করে বিরাজমান থাকে। মানসিক অবস্থা (Mental state) এই সপ্ত বা পঞ্চ চিত্তক্ষণে অপরিবর্তিত অবস্থায় বিরাজ করে। তবে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সুপ্তশক্তি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না। চিত্ত যখন কোন বস্তু বা আলম্বন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে তখন সাধারণত: জবনচিত্ত সপ্তক্ষণ স্থায়ী হয়। মৃত্যুকালে অথবা তথাগত যখন দ্বৈত ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তখন পঞ্চক্ষণ মাত্র স্থায়ী ছিল জবনচিত্ত। ফলচিত্ত যখন লোকোত্তর লোকে উৎপন্ন হয় তখন জবনচিত্তের স্থায়ীকাল হয় মাত্র একক্ষণ।

এই চিত্তক্ষণ বহুক্ষেত্রে চিত্তকে অকুশল থেকে কুশলের দিকে আবর্তিত করতে অবকাশ পায়। ফলে কুশল সঞ্চয়ের পথ সুগম হয় এবং অধিক মাত্রায় কুশল সঞ্চিত হতে হতে জীবন হয়ে উঠে স্নিগ্ধ ও শুচিস্নাত, অন্যপক্ষে কুশল ও অকুশল জবন আমাদের ভাবী জীবনের ভিত্তি রচনা করে।

কুশল জবন জীবনকে নিয়ে যায় আলোকের পথে আর অকুশল জবন জীবনকে নিক্ষেপ করে গাঢ় অন্ধকার গহ্বরে।

দ্রষ্টব্য : অভিধর্ম দর্পন—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মধ্যমগ্রাম, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃঃ ৮৪

A Manual of Abhidhamma. Nārada Mahathera. Srilanka. 1968 r. 166.

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—অনুঃ ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১২৭২ ???, পৃঃ ১৬।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—অনুঃ সুতুত্তিরঞ্জন বড়ুয়া, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ১৪৯।

জিনবোধি ভিক্ষু

আবাসকল্প

যে দশটি বিনয়-নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল তার মধ্যে 'আবাসকল্প' একটি—অর্থাৎ একই বিহারে অবস্থান করেও আলাদাভাবে 'উপোসথ' কর্ম করাকে বজ্জিপুত্তীয় ভিক্ষুরা অন্যায় বলে মনে করতেন না ; তাঁরা এই নিয়ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : বিনয় ২য় খণ্ড, (PTS) পৃঃ ২৯৪, ৩০০, ৩০৬।]

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

আসংকে জাতক (আশঙ্কা জাতক, ৩৮০)

এক ভিক্ষু তাঁর গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়েছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থান করবার সময় তার সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। এটির প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে বলা যাবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রকৃতই কি তিনি উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। ভিক্ষু সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন এবং তার উৎকণ্ঠার কারণ তার পত্নী। শাস্তা বলেছিলেন এই রমণী তার অনর্থকারিকা। পূর্বেও এরজন্য তিন বহুর চতুরঙ্গিনী সেনা ত্যাগ করে হিমবন্ত প্রদেশে মহাদুঃখে বাস করেছিলেন। এই বলে শাস্তা অতীত কথা আরম্ভ করেছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়ে নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমবন্ত প্রদেশে বাস করেছিলেন। সেখানে তিনি বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ লাভ করেছিলেন।

ঐ সময় এক মহান সত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ঐ অঞ্চলের পদ্মসরোবরের একটা পদ্মের গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সরোবরের অন্যান্য পদ্ম পুরাণ হয়ে খসে পড়ল, কিন্তু এই পদ্মটার কুক্ষি ক্রমে বড় হতে লাগল। এটি শুকিয়ে পড়ল না। ক্রমাগত

বড় হতে লাগল। বোধিসত্ত্ব স্নান করতে গিয়ে ঐ পদ্ম দেখে ভাবলেন, অন্য সমস্ত পদ্ম পড়ে গেল, কিন্তু এই পদ্মটা পড়া দূরে থাকুক, এটির কুক্ষিটা আরও বড় হয়েছে। তিনি স্নান বস্ত্র পরিধান করে জলের ভিতর দিয়ে ওটির নিকটে গেলেন এবং ওটি খুলে সেই কন্যাটিকে দেখতে পেলেন। তিনি কন্যাটিকে নিজের কন্যা জ্ঞান করে পর্ণশালায় এনে লালন পালন করতে লাগলেন। ক্রমে কন্যা ষোড়শবর্ষে উপনীত হল। সে দেখতে পরমা সুন্দরী ও রূপবতী হল। তার বর্ণ দেববর্ণের অপেক্ষা হীন কিন্তু মনুষ্য বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হল। একদা শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করতে এসে তাকে দেখতে পেলেন এবং উহাকে কিভাবে পেয়েছিলেন তা জানলেন এবং মেয়েটি তিনি পেতে পারেন কিনা তা জানতে চাইলেন। বোধিসত্ত্ব বলেন—এর জন্য বাসস্থান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজের ব্যবস্থা করলেই কন্যাটিকে পাবেন। শক্র তৎক্ষণাৎ তার বাসের জন্য স্ফটিকপ্রাসাদ প্রস্তুত করলেন এবং ভোগের জন্য দিব্য শয্যা, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার ও দিব্য অন্নপানের ব্যবস্থা করলেন। কন্যাটি বোধিসত্ত্বের সেবাযত্ন করত এবং প্রাসাদে বাস করত। একদা এক বনেচর বোধিসত্ত্বের নিকট হতে কন্যাটি সম্পর্কে সব জেনে বারাণসীরাজকে জানাল যে হিমবন্তপ্রদেশে এক তপস্বীর এক পরমাসুন্দরী কন্যা দেখে এসেছে। তখন রাজা কন্যার প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। সেই বনেচরকে পথপ্রদর্শক করে চতুরঙ্গিনী সেনাসহ সেই অঞ্চলে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর কন্যার প্রতিপালনের ভার লইবেন।

বোধিসত্ত্ব কন্যাটির আশঙ্কা এই নাম রেখেছিলেন কারণ তাঁর মনে "পদ্মের ভিতর কি আছে" এই আশঙ্কা (সন্দেহ) হয়েছিল বলে তিনি জলে নেমে তাকে এনেছিলেন। এখন তিনি রাজাকে কন্যাটিকে নিতে বললেন এই শর্তে যদি তিনি কন্যাটির নাম কি তা বলতে পারেন। বৎসর কাল রাজা চেষ্টা করল কন্যার নাম কি জানতে কিন্তু বিফল হয়ে অবশেষে রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ঐ কন্যা বাতায়ণ পথে রাজাকে আশাবতী ফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিল—যে ফল আস্বাদনের জন্য দেবতারা সহস্র বৎসর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত সুতরাং সে জানায় যে রাজার আশাহীন হওয়া উচিত নয়। ফলে রাজা নতুন উদ্যমে কন্যার নাম অনুমান করার জন্য আবার সচেষ্ট হয়। আরও এক বৎসর কেটে গেল। তবুও রাজা কন্যার নাম নিরূপণ করতে পারল না। নিরাশ হয়ে রাজা নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে কন্যা রাজাকে বলে সেই বকের কাহিনী যে বকটি পর্বতের উপর অবস্থান করেও ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে। ফলে কন্যার উৎসাহদানের ফলে রাজা তার নাম জানতে আবার চেষ্টা করে এবং এইভাবে আরও এক বৎসর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তৃতীয় বৎসরের শেষেও রাজা কৃতকার্য হয় না, ফলে কন্যাকে বিবাহ করার আশা ত্যাগ করে, রাজা নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। তখন কন্যা রাজাকে কথোপকথনে ব্যস্ত রাখে। এই বাক্যালাপের সময় রাজা আশঙ্কা শব্দটি ব্যবহার করে। পরিশেষে রাজা যখন কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিতে চায় তখন কন্যা রাজাকে জানায় কিছুক্ষণ আগেই রাজা কন্যার নাম উচ্চারণ করেছে। রাজা তখন বুঝতে পারে কন্যার নাম আশঙ্কা। সেকথা বোধিসত্ত্বকে জানাতেই তিনি রাজার হস্তে কন্যাকে দান করেন। রাজা ও কন্যা স্বামী-স্ত্রী রূপে বারাণসীতে ফিরে আসেন এবং বহু পুত্র কন্যা লাভ করে সুখে বাস করতেছিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রেখে ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করেছিলেন। এর সমাধান

হল—তখন এই ব্যক্তির পত্নী ছিল আশঙ্কাকুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

বেলা ভট্টাচার্য

আসব—আস্রব

আ + সু ধাতু উৎপন্ন, প্রবাহিত হওয়া অর্থে আসব। সং আশয় কিংবা আস্রব। আশ্রয় অর্থে ইচ্ছা, অভিপ্রায়। "আ" উৎসর্গ অর্থ অবধি পর্যন্ত। চৈতসিক ভবাগ্র পর্যন্ত বয়ে চলে এই অর্থে আস্রব। আস্রব অর্থে আগন্তুক রূপে স্রাবিত হয়। আসবন্তী বা আসবা, সবন্তি পবত্তন্তি (প - সু), আস্রবিত বা প্রবাহিত হয় অর্থে আস্রব। সুরাদি মাদক দ্রব্যকেও আস্রব বলে। যে যে চৈতসিক (চিত্তবৃত্তি) মত্ততা সাধক, তারা আস্রব সদৃশ। আস্রব আসক্তিই বটে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় মনাদি থেকে ব্রণের পূঁযধারা স্রবণের ন্যায় বিষয় ক্লেশধারা স্রাবিত হয় বলে তাকে আস্রব বলে। "ধম্মতো যাব গোত্রভূ ভবতো যাব ভবগ্গা, আ (সমন্তা) সবন্তি (পবত্তন্তি)" তি আসবং আয়তিং বা সংসারদুক্খং সবন্তি (পসবন্তী) তি আসবা" ; ধর্ম হিসেবে গোত্রভূ চিত্ত লোকোত্তর মার্গের পূর্বক্ষণ এবং ভব হিসেবে ভবাগ্র পর্যন্ত সর্বদিকে স্রবতি (প্রবাহিত) হয় কিংবা যা থেকে ভাবী সংসার দুঃখ ও ক্লেশ স্রাব বা প্রস্রব হয় তা-ই আস্রব। ইহা চিত্তের মত্ততা সাধক অকুশল চৈতসিক (মনোবৃত্তি) বিশেষ।

আবিলতা (ক্লেশ), অনৈতিকতা, ভ্রষ্টতা, কলুষতা, মাদকতা, অশুচিতা প্রভৃতি আস্রবের নিকটতম প্রতিশব্দ। তারা সর্বোচ্চভূমি পর্যন্ত প্রবাহিত হয় অথবা তারা গোত্রভূ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গচিত্তক্ষণের পূর্ব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই সকল আস্রব সকল পৃথগ্জনের নিকট সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং যে কোন ভূমিতে তাদের উত্থান হতে পারে। তারা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তারা সত্ত্বগণের বিভ্রান্তকারী অতি শক্তিশালী মাদকতা সদৃশ এবং নেশাদ্রব্যের মত। অতএব আস্রব এমন এক বস্তু যাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। এই স্থানে আস্রব এমন এক ধর্ম যা থেকে দুঃখ ও ক্লেশ স্রাবিত ও প্রসূত হয় (পঃ সু)। আস্রব চার প্রকার, যথা—কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব ও অবিদ্যাসব।

(১) কামাসব ঃ—কামসুখের প্রতি প্রবল আসক্তিকে বলা হয় কামাসব। কামাসবের আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য। এটা লোভ চৈতসিক। অনাগামী মার্গ লাভে কামাসব ধ্বংস হলেও ভবাসব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। কামাসব ধ্বংস হয় অর্হত্ত্বলাভে।

(২) ভবাসব ঃ—সত্ত্বগণকে ভবযন্ত্রে যুক্ত করে ঘুরপাক খাওয়ায় অথবা কর্ম ও ফলের আবরণে এক ভব থেকে অন্য ভব যন্ত্রণায় যুক্ত করে বলে এর নাম ভবাসব। সংক্ষেপে ভবাসব অর্থে রূপ এবং অরূপ ভূমির প্রতি আকৃষ্টতাকে বোঝায়। ভবাসবের আলম্বন হল নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব। ভবাসব লোভ চৈতসিক। তা অর্হত্ত্বমার্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। অর্হত্ত্বফল লাভে ভবাসব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

(৩) দৃষ্ট্যাসব ঃ—দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় দৃষ্ট্যাসব। দৃষ্ট্যাসবের আলম্বন হল অবিনশ্বর আত্মা। দৃষ্ট্যাসব অরূপ ভব পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটা দৃষ্টি চৈতসিক। স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা নিরবশেষভাবে দৃষ্ট্যাসব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(৪) **অবিদ্যাসব ঃ**—অবিদ্যাসব বলতে চতুরার্যসত্য অনিত্য-দুঃখ অনাত্মা, অতীত জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন, অতীত-ভবিষ্যৎ উভয় এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে বোঝায়। অবিদ্যাসব কামাসব, ভবাসব ও দৃষ্ট্যাসব এই সমস্তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তা মোহ চৈতসিক। অবিদ্যাসব লোকোত্তর মার্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অর্হত্ত্ব মার্গে নিরবশেষভাবে ভবাস্রব এবং অবিদ্যাসব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এভাবে সমস্ত আস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ Pali-English Dictionary, Edited by T. W. Rhys Davids and Willian Stede. The Pali text society, London, 1972. P. 114-115.

A Manual of Abhidhamma by Nārada Mahāthera. Srilanka, 1980, P. 327.

অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ—অনুঃ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম—১৯৪০, পৃঃ ২১০.

An Introduction to Abhidhamma by Silananda Brahmachari, Madhyamgram. 1990. P. 122.

মজ্‌ঝিম নিকায়—১ম ভাগ, অনুঃ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কলিকাতা-১৯৪০ পৃঃ ৯-১৪।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আসবক্খয়ঞাণ—আসবক্ষয়জ্ঞান

বৌদ্ধদর্শনে একমাত্র আসবক্ষয়জ্ঞানই লোকোত্তর জ্ঞান নামে অভিহিত। একে দুঃখ মুক্তির প্রকৃত কারণ বলা হয়েছে। আসব অর্থে এমন এক ধর্ম যা থেকে দুঃখ ও ক্লেশ স্রাবিত ও প্রসৃত হয়। সহজ কথায় আসব এমন এক বস্তু যাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। যিনি সংসারবর্তের কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব এবং অবিদ্যাসব ক্ষয় বা ধ্বংস করেছেন তিনিই আসব মুক্ত হন। বলাবাহুল্য রূপাবচর কিংবা অরূপাবচর ধ্যান প্রভাব বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক যখন বিদর্শন জ্ঞান প্রভাবে চিত্ত সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পরিস্কৃত, বিগতক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, অচঞ্চল ও শক্তিশালী হয়, তখন চিত্ত আসব (আসক্তি) ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে ধাবিত হয়। চিত্তের তদবস্থায় জানতে পারা যায়—ইহা দুঃখ সত্য, দুঃখ সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য এবং প্রতিপদা সত্য। এইরূপে আর্যসত্য দর্শন ও উপলব্ধির ফলে উক্ত চতুর্বিধ আসব (কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব ও অবিদ্যাসব) হতে চিত্ত বিমুক্তয়। আসব হতে চিত্ত বিমুক্ত হয়েছে বলে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানোদয় হয়। এই প্রসঙ্গে আরো হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় যে চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রতোদ্‌যাপন সম্পূর্ণ হয়েছে। আসবক্ষয় জ্ঞান অর্থে জীবনসত্য উপলব্ধির উচ্চতর জ্ঞান।

প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে চৌষট্টি আকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতার জন্য প্রবর্তিত প্রজ্ঞার নাম আসবক্ষয় জ্ঞান। এই ইন্দ্রিয়ত্রয় হচ্ছে—(১) অজ্ঞাতকে জানব ইন্দ্রিয়, (২) আজ্ঞেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং (৩) আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়।

(১) অনাজ্ঞাতকে (অজ্ঞাত) জানব ইন্দ্রিয় কেবল স্রোতাপত্তি মার্গে সমুদিত হয়।

(২) আজ্ঞেন্দ্রিয় ছয় স্থানে সমুদিত হয়। যেমন—স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামীমার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল এবং অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে।

(৩) আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয় কেবল অর্হত্ত্বফলে সমুদিত হয়। স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে অনাজ্ঞাতকে জানব ইন্দ্রিয়ের আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথাঃ—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আটটি ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এই আটটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনাজ্ঞাতকে জানব ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

স্রোতাপত্তি ফলক্ষণে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃ ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আটপ্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাতপরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

সকৃদাগামী মার্গক্ষণে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃ ইন্দ্রিয়, সৌমনস্যইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

সকৃদাগামী ফলক্ষণে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃ ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয় এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার।

অনাগামী মার্গক্ষণে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃ ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয়পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট এবং সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার।

অনাগামীফলক্ষণে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃইন্দ্রিয়, সৌমনস্যইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়, এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট এবং সম্প্রযুক্ত হয়ে থাক। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

অর্হত্ত্বমার্গক্ষিণে—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যোন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট এবং সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞেন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

অর্হত্ত্বফলক্ষণে—আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনঃইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়, এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

অর্হত্ত্বফলক্ষণে আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয় এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট এবং সম্প্রযুক্ত হয়, এই সমুদয় আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার, এভাবে (৮ × ৮ = ৬৪) চৌষট্টি প্রকার ও পরিবারে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের বশীভাবতারূপ যে প্রজ্ঞা অর্থাৎ আস্রবক্ষয় জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

[দ্রষ্টব্য : Pali English Dictionary. Editcr_T. W. Rhys Davids and. William Stede. P. T. S. London. 1972. p. 115.

Patisambhidhamagga. pt. 1. P. T. s. Londoan. 1909.

A manual of Abhidhamma—Narada Maha Thera. Srilanka ; 1980. P. 322, 327.

পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি : অনু: শ্রীজ্যোতিপাল মহাথের, কুমিল্লা-১৯৬৩, পৃঃ ৯, ১১-১২, পরিশিষ্ট।

মধ্যমনিকায়-১ম খণ্ড, অনুঃ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, কলিকাতা-১৯৪০ পৃঃ ৯-১৪।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আসেবনপচ্চয়—আসেবন প্রত্যয়

আসেবন শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ সেবন, পুনরাবৃত্তি, অভ্যাস, খাওয়া, পরিচর্যা ইত্যাদি বোঝায়। পুনঃপুনঃ সেবনে, অভ্যাসে বা পুনরাবৃত্তিতে বা সহায়তা দানে প্রত্যয়ের ক্রিয়া সম্পন্ন করে বলে তাকে বলা হয় আসেবন প্রত্যয়। এই প্রত্যয় কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্তের পক্ষে প্রযোজ্য। কোনো বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুধাবনে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর (প্রতি) অধিকার জন্মে। যেমন, কোন গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নে প্রত্যেক নূতন পাঠের সঙ্গে তা ক্রমে ক্রমে অধিকতর অধিগত হয়। ঠিক তেমনই একই কৃত্য বারবার সম্পাদনে চিত্তের নৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এভাবে চিত্তের প্রগুণতা বা ক্রমবর্ধনশীল দক্ষতা সম্পাদনই আসেবনের বিশেষত্ব। চিত্তবীথির জবন স্থানে প্রথম জবন চিত্তক্ষণ (আসেবন প্রত্যয় ধর্ম)। দ্বিতীয় জবন (প্রত্যোয়োৎপন্ন ধর্ম) কে শক্তিদান করে এবং তৃতীয় জবন চতুর্থ জবনকে শক্তিদান করে অর্থাৎ দ্বিতীয় জবন প্রথম জবন দ্বারা আসেবিত হয়, তৃতীয় জবন দ্বিতীয় জবন দ্বারা আসেবিত হয় এবং চতুর্থ জবন তৃতীয় জবন দ্বারা আসেবিত হয়। এই প্রকারে চিত্তে পুনঃ পুনঃ চতুর্থ জবন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীরূপে বিবেচনা করা হয়।

এটাও উল্লেখ্য যে—আসেবন প্রত্যয় কুশলে কুশলে, অকুশলে অকুশলে, ক্রিয়া-অব্যাকৃতে ক্রিয়া-অব্যাকৃতে। শুধু কামাবচর কুশলাকুশল ক্রিয়াচিত্তে, মহদ্‌গত কুশল ক্রিয়া-চিত্তে, অনুলোম কুশল চিত্তে এবং নির্বাণালম্বনের গোত্রভূ চিত্তেই আসেবন প্রত্যয় হয়। লোকোত্তর চিত্তে জবন নেই, সেজন্য এই চিত্ত আসেবন বর্জ্জিত। লৌকিয় ৪৭ জবন চিত্তেই আসেবন প্রত্যয় হয়। আসেবন প্রত্যয় কর্মে কর্মে প্রত্যয় এবং শুধু জবনস্থানে। উপনিশ্রয় প্রত্যয় কর্মে কর্মে, বিপাকে বিপাকে কর্মে কর্মে কালান্তরে বা ভবান্তরে, বিপাক প্রত্যয় বিপাকে বিপাকে, আসেবন-প্রত্যয় নামের সঙ্গে নামের প্রত্যয় হয়।

ক্ষয়ধর্মী চিত্তে আসেবন প্রত্যয় বিদ্যমান বলে পুরুষবলের, পুরুষবিক্রমের দীর্ঘকাল গঠন ও বর্দ্ধন করে বলে মহৎ ব্যাপার সম্ভবপর হয়। এমন কি বুদ্ধত্ব এই আসেবন প্রত্যয়লব্ধ

প্রগুণতা দ্বারাই লাভ হয়। সতিপট্‌ঠানং ভাবেতি, সম্মপ্পধানং ভাবেতি, সম্মাদিট্‌ঠিং ভাবেতি ইত্যাদিতে ভাবেতি শব্দ দ্বারা জবন স্থানে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল ধরে আসেবন বা অভ্যাস করাই বোঝায়। তাই বলা হয়েছে—"পুরিমা পুরিমা কুসলা ধম্মা পচ্ছিমানং পচ্ছিমানং কুসলানং ধম্মানং আসেবনপচ্চয়েন পচ্চয়া"।

[দ্রষ্টব্য : পট্‌ঠান, প্রথম খণ্ড, অনুঃ ডঃ সুকোমল চৌধুরী, কলিকাতা ১৯৯৭, পৃঃ ভূমিকা, পৃঃ ৯-১০।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—নারদ মহাস্থবির, অনুঃ সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, কলিকাতা-১৯৯১, পৃঃ ৩২০।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী—আচার্য অনুরুদ্ধ, অনুঃ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, চট্টগ্রাম-১৯৯৪, পৃঃ ১৬১।

অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ—বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আহার

আহরণ করে এই অর্থে আহার বলা হয়। এক কথায় আহরতি বা আনে এই অর্থে আহার। (দ্রষ্টব্য :—দি পাথ অফ পিউরিফিকেশন—এ্যাণমোলি ভিক্‌খু, ক্যান্ডি, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৭২)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী বিদ্যমান সকলেই আহারের উপর নির্ভরশীল। তাই আহারকে পরিপোষণ এবং নামরূপের উৎপত্তির কারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আহারের উৎপাদিকা শক্তি থাকলেও, উপত্তম্ভন বা পরিপোষ-শক্তিই এতে প্রবল। আহার চার প্রকার, যথা—কবলীকৃতাহার, স্পর্শাহার, মনঃসঞ্চেতনাহার এবং বিজ্ঞানাহার। এই চতুর্বিধ আহারের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে রূপাহার এবং অবশিষ্ট তিনটি অরূপাহার হিসেবে গণ্য।

(১) **কবলীকৃতাহার** :—কবল বা গ্রাস করে ভোজন করা হয় বলে কবলীকৃতাহার বলা হয়। ভাত ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি রসাল জাতীয় আহারই কবলীকৃতাহার নামে অভিহিত হয়। সহজ কথায়—যা ভক্ষণীয় দ্রব্যাদি তা কবলীকৃতাহার নামে খ্যাত। একে রূপাহারও বলা হয়। কবলীকৃতাহার রূপ-কায়ের সন্ততির কারণ। কর্মফলে রূপ-কায়ের উৎপত্তি হলেও এর পোষণ ও সন্ততির জন্য জড় আহারের প্রয়োজন। যেন ইহা পূর্ণ আয়ুষ্কাল অবিচ্ছেদে যাপন করতে পারে। রূপকায় রূপাহারই খোঁজে। ওদনাদি যে আহার্য বস্তু শরীর রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের জন্য আহার করা হয়, তাকে বলা হয় আহাররূপ। তা আট প্রকার ওজঃ রূপকে আহরণ করে। কবলীকৃতাহারকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়। এইভাবে যাবতীয় আহার গ্রহণ করলে অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায়, জীর্ণাবস্থায় এবং পরিণতাবস্থায় প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপাদন করাই আহার প্রতিকূল সংজ্ঞা বলা হয়। কবলীকৃত আহার রূপকায় বলে কথিত এই দেহকে গঠন করে ও বাঁচিয়ে রাখে। যেখানে কবলীকৃত আহার আছে সেখানে লোভ আছে এবং তাতে ভয় উৎপাদিত হয়।

(২) স্পর্শাহার ঃ—স্পর্শাহার বেদনা বা অনুভূতি আহরণ করে। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা, সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য বেদনা ভেদে পাঁচ প্রকার বেদনা পোষণ করে। বেদনা স্পর্শই খোঁজে। স্পর্শ সুখ বেদনাও জন্মায়। সেই বেদনা উপভোগের জন্য সত্ত্বগণের তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্মোৎপত্তির কারণ হয়। স্পর্শাহারের বলে জীবনচক্র অবিচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ স্পর্শাহার নামে উক্ত অরূপাহার চিত্ত, চৈতসিক ও চিত্তজরূপের এবং প্রতিসন্ধিতে কর্মজ রূপের প্রত্যয় হয়। যেখানে স্পর্শাহার আছে সেখানে ত্রিভবের প্রতিসন্ধি উপগমন আছে, যাতে ভয় উৎপন্ন হয়। অতএব, সংক্ষেপে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা এই বেদনাত্রয়কে রক্ষাকারী ঊননব্বই (৮৯) প্রকার চিত্তকে স্পর্শাহার বলা হয়।

(৩) চেতনা বা মনঃসঞ্চেতনাহার ঃ—চেতনা বোঝায় ২৯ প্রকার কুশলাকুশল কর্ম যা ত্রিভব প্রতিসন্ধি বা জন্ম আহরণ করে। এর অপর নাম কর্ম বা সংস্কার বা কর্মভব এবং ইহা বিজ্ঞান বা বিপাক চিত্তের আহার। "বিপাকো কম্ম-সম্ভবো"। যেখানে চেতনা বা মনঃসঞ্চেতনাহার আছে সেখানে পুনরুৎপত্তি আছে, যা ভয় উৎপাদন করে। সুতরাং কামভবে উৎপদ্যমান কর্ম করলে কামভব, চেতনা প্রযুক্ত হয়ে রূপভবে উৎপদ্যমান কর্ম করলে রূপভব, আর অরূপভবে উৎপদ্যমান কর্ম সম্পাদন করলে অরূপভব ইত্যাদি নামে ত্রিভব আহরণ করে বলেই এর নাম চেতনাহার বা মনঃসঞ্চেতনাহার।

(৪) বিজ্ঞানাহার ঃ—প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপকে আহরণ করে বলে বিজ্ঞানাহার বলা হয়। বিজ্ঞানাহার ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধিচিত্ত। ইহা নাম-রূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শের আহার। বিজ্ঞানাহারে প্রতিসন্ধির সময় ত্রিভবে স্কন্ধ-যোনি-গতি ও সন্ততি ভেদে ৩০ (ত্রিশ) প্রকার ও আহরণ করে। যেখানে বিজ্ঞানাহার আছে সেখানে প্রতিসন্ধি আছে, যা ভয় উৎপাদন করে।

এই ভাবে চার প্রকার আহারে সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, উপগমন, উৎপত্তি ও প্রতিসন্ধি এই চার প্রকার ভয় দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে—পুত্র মাংস ভক্ষণ, চর্মহীন গরু, অঙ্গারগর্ত ও শক্তিশূল রূপে তুলনা করা হয়েছে।

এই চতুর্বিধ আহার প্রভাবে সত্ত্বগণ অপায়, মনুষ্য, দেব, রূপব্রহ্ম, অরূপ ব্রহ্মালোকে সংসরণ করে। এর সমাপ্তিই নির্বাণ।

আহার ভেদে সত্ত্বগণ চতুর্বিধ ঃ রূপুপজীবি, বেদনোপজীবি, সংজ্ঞা উপজীবি ও সংস্কার উপজীবি।

(১) রূপুপজীবি ঃ—১১ প্রকার সত্ত্বগণ (৪ অপায়বাসী, ১ মনুষ্যলোকবাসী, ৬ দেবলোকবাসী) কবলীকৃত আহার গ্রহণ করেন, তাই তাঁরা রূপুপজীবি।

(২) বেদনোপজীবি ঃ—অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্যতীত অপর ১৫ প্রকার রূপ ব্রহ্মবাসী সত্ত্বগণ স্পর্শাহার গ্রহণ করে বলে তাঁরা বেদনোপজীবি।

(৩) সংজ্ঞাউপজীবি ঃ—নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা ব্যতীত অপর তিন অরূপব্রহ্মবাসী সত্ত্বগণ সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন মনঃসঞ্চেতনিকা আহার সেবন করেন, তাই তাঁরা সংজ্ঞা-উপজীবি।

(৪) সংস্কার উপজীবি ঃ—সংস্কার দ্বারা উৎপাদিত বিজ্ঞানাহার ভবাগ্রবাসী অর্থাৎ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা অরূপ ব্রহ্মবাসী সত্ত্বগণ সেবন করেন, তাই তাঁরা সংস্কার-উপজীবি।

বলা বাহুল্য, অসংজ্ঞ সত্ত্বগণ হেতু-আহার-স্পর্শ শূন্য, কারণ ধ্যানই তাঁদের একমাত্র আহার এবং ধ্যান বলেই তাঁরা সেই স্তরে বেঁচে থাকেন। ধ্যান যে আহার তা আহারের লক্ষণ প্রকাশার্থে বলা হয়েছে। প্রত্যেক স্বভাব ধর্মের এক একটি কারণ (প্রত্যয়) আছে। যে কোন ফল উৎপত্তি ও প্রত্যয় জাত, তা আহার থেকে জাত বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—"সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা"—সকল সত্ত্ব আহারের দ্বারা স্থিত বা জীবিত। সেই জন্য বুদ্ধ আরও বলেছেন ঃ—ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাও আহার, অবিদ্যা রূপ আহার হলো পঞ্চনীবরণ (কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা)।

[দ্রষ্টব্য ঃ Visuddhimagga-Ed. Henry Warren clarke, Cambridge. Harvard Oriental Series. Vol. 41. Mass-1950. P. 285. সংযুক্ত নিকায়, ২ খণ্ড, সম্পাদনায় ; এমন, লিওন ফিয়র, পি. টি. এস. লণ্ডন ১৮৮৮, পৃঃ ৯৮-১০০

সার-সংগ্রহ ২য় খণ্ড অনুঃ শ্রী মৎ ধর্মতিলক স্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশন, রেঙ্গুন, ১৯৩২, পৃঃ ২৩২-২৩৭।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—অনুঃ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃঃ ১২২।]

জিনবোধি ভিক্ষু

আহারপচ্চয়—আহার প্রত্যয়

পালি অর্থকথায় বলা হয়েছে "আহারন্তীতি আহারা" অর্থাৎ আহরণ করে এই অর্থে আহার। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হচ্ছে কারণ, নিদান, হেতু। যার সাহায্যে কোন কার্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তা ঐ কার্যের ঐ ফলের প্রত্যয় হয়। সুতরাং প্রত্যয় হচ্ছে সাহায্যকারক। যা নামরূপকে উৎপন্ন করে, পরিপোষণ করে, তা-ই নামরূপের আহার। আহারের উৎপাদিকা শক্তি থাকলেও, উপস্তম্ভন বা পরিপোষণ-শক্তিই এতে প্রবল। আহার চার প্রকার, যথাঃ—কবলীকৃতাহার, স্পর্শাহার, চেতনাহার ও বিজ্ঞানাহার।

[দ্রষ্টব্য ঃ 'আহার' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

আহারে পটিকূলসঞ্ঞা—আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা

দ্রব্যের ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে নিরন্তর অনুধ্যানে যে ভাবনা করা হয় তাকে বলা হয় আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা বা এক সংজ্ঞা ভাবনা। খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটি আকর্ষণ থাকে। কারো কারো এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয়। তাকে আমরা বলি "পেটুক"। আহার্য বস্তুর প্রতি এইরূপ লোলুপতা বা পেটুকতা একটি বড় দোষ যা অধ্যাত্ম সাধনার পথে কণ্টক স্বরূপ। এর মূলে কুঠারঘাত করে আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা বা এক সংজ্ঞা ভাবনা।

এই ভাবনা অভ্যেস করতে হলে আচার্যের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে তা অনুসরণ করা আবশ্যক। নির্জনে অনুকূল পরিবেশে নিবিষ্ট মনে আহারের প্রতিকূলতা দশ উপায়ে প্রত্যবেক্ষণ করতে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর বিশুদ্ধিমার্গে বিস্তৃতভাবে এই দশ উপায়ে প্রত্যবেক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। তারই সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিত রূপে প্রাঞ্জলভাষায় বর্ণনা করেছেন পণ্ডিত শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়—(১) রমণীয় তপোবন ত্যাগ করে, ধ্যান ধারণা বন্ধ করে, আহারের জন্য প্রত্যহ লোকালয়ে যেতে হয় ক্ষুধার্ত জীবের মত। সে গমন মোটেই প্রীতিকর নয়। গমনের প্রস্তুতিও বিরক্তিকর। গমনের পথ নানাভাবে দুর্গম হয়ে ওঠে। কখনো কখনো লোকালয়ে গো-মহিষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির গলিত শবের দুর্গন্ধ-বাসিত স্থানে উপস্থিত হতে হয়। সেখানে শুধু বীভৎস দৃশ্যে নয়, দুর্গন্ধেও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। কখনো কখনো মত্ত হস্তী, চণ্ড গো-মহিষ, কুকুরাদির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজতে হয়। আহারের জন্য লোকালয় গমনে প্রতিকূলতা আরও নানাভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

(২) আহার অন্বেষণে ভিক্ষাধার হাতে নিয়ে, দীন ভিক্ষুকের মত এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বৃষ্টির জল, কাদা, রৌদ্র, ঝড়, বাতাস উপেক্ষা করে চলতে হয়। কখনো অশুচিপূর্ণ নালা নর্দমা পার হতে হয়, কখনো মলমূত্র মাড়াতে হয়, কখনো মশামাছির উপদ্রব সহ্য করতে হয়। আহার অন্বেষণে আরও নানারকম দুঃখকষ্টের কথা ভাবা উচিত।

(৩) পরিভোগে, উপভোগে, অর্থাৎ আহারকালে আঙুলগুলোর ঘামে শুষ্ক কঠিন ভাতও ভিজে নরম হয়। মর্দন করতে করতে গ্রাস যখন মুখে পুরে দেওয়া হয়, তখন নীচের দাঁতগুলো উদুখলের, ওপরের দাঁতগুলো মুষলের এবং জিহ্বা হাতের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এবারে তা দন্ত জিহ্বার ক্রিয়ায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে থুতু ও লালার দন্তমলে ক্লেদাক্ত বিকৃত ঘৃণ্য আকার ধারণ করে গলাধঃকৃত হয়, এই হচ্ছে পরিভোগে প্রতিকূলতা প্রত্যবেক্ষণ।

(৪) আশয়গত বা উদরস্থ হয়ে তা পিত্তাধিক্যে ঘনমধু বা তেল মাখানোর মত, শ্লেষ্মাধিক্যে পাতায় রস মাখানোর মত, পুঁযাধিক্যে পঁচা খোল মাখানোর মত এবং রক্তাধিক্যে রক্ত মাখানোর মত দেখায় এবং অত্যন্ত ঘৃণ্যভাব ধারণ করে।

(৫) পরিপাকের পূর্বাবস্থায় ঐভাবে আশয়ে নিহিত থাকে ঘৃণ্য অশুচি বস্তুরূপে।

(৬) চণ্ডাল-গ্রাম-দ্বারের গর্তে জীবজন্তুর গলিত শবাদি ও তৃণ পত্রাদির সংমিশ্রিত আবর্জনারাশি গ্রীষ্মের অকালবর্ষণসিক্ত হয়ে রৌদ্রতাপে যেমন বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করে, তেমনি শ্লেষ্মাদি পরিবৃত সে ভুক্ত আহার অপরিপাকে দেহাগ্নি তাপে বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করে বিকৃত ঘৃণ্য হয়।

(৭) পরিপাকে তা বিষ্ঠায় পরিণত হয়ে পক্বাশয় এবং মূত্রে পরিণত হয়ে মূত্রাশয় পূর্ণ করে।

(৮) ফলে তা সুষ্ঠু পরিপাকে দেহস্থ কেশলোমাদি বিবিধ অশুচি পদার্থ পোষণ করে এবং অসুষ্ঠু পরিপাকে দেহে নানা ব্যাধি উৎপাদন করে।

(৯) পরিণতিতে তা এক দ্বারে প্রবিষ্ট হলেও নবদ্বার দিয়ে অশুচিরূপে নির্গত হয়। তখন আহারকালের সে হর্ষোৎফুল্লতা থাকে না। তাই বলা হয়, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণে আনন্দে গদগদ হলেও তার নির্গমনে ঘৃণায়, দুর্গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করতে হয়।

(১০) আহারের পরও হাত, ওষ্ঠ, দাঁত ও জিহ্বা আহারলিপ্ত হয়ে ঘৃণা উদ্রেক করে। ধুলেও গন্ধ সহজে যায় না। এই জন্য কেউ গোবর, কেউ মাটি, কেউ বা গন্ধচূর্ণ দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করে।

উক্ত দশ প্রকার আহার প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে আহারের প্রতি প্রতিকূল ধারণা প্রকট হয়ে উঠে। এবং তা ধ্যান নিমিত্তে পরিণত হয়। সেই ধ্যান নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা পঞ্চনীবরণ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কবলীকৃত আহারের স্বভাব-ধর্মতার গভীরতার জন্য অর্পণাধ্যান লাভ না হলেও উপচার সমাধিদ্বারা সাধক চিত্তকে সমাহিত করতে পারে। এই অবস্থায় আহার লোলুপতার প্রশ্নই উঠে না। এইভাবে নিরাসক্তভাবে আহার গ্রহণের ফলে সাধক রসতৃষ্ণা থেকে নিজের চিত্তকে সংযত করেন। মরুকান্তার পারার্থীর মৃত পুত্রের মাংস ভক্ষণের মতই দুঃখ মুক্তির সাধনা সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে বিগতমদ হয়ে আহার গ্রহণ করেন। পঞ্চকামগুণের প্রতি অনুরাগ তাকে অভিভূত করে না। অপরিপক্কাদি প্রতিকূল সংজ্ঞা বলে সাধকের কায়গত স্মৃতিভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে অশুভ সংজ্ঞার দ্বারা লোকোত্তর মার্গ প্রতিপন্ন হয়। ফলে ইহজন্মে সঠিক নির্বাণ লাভ না করলেও মরণান্তে তিনি সুগতি লাভ করেন।

[দ্রষ্টব্য : বিসুদ্ধিমগ্‌গ হাঃ. ও, সিঃ, কেমব্রিজ ১৯৫০), পৃঃ ২৮৫, দি পাথ অব্ পিউরিফিকেশন—ঞানমোলি ভিক্ষু, কাণ্ডি ১৯৭৫, পৃঃ ৩৭২।

সংযুক্তনিকায়, ২য় খণ্ড, সম্পা : এম, লিওন ফিয়র, লণ্ডন ১৯০০ পৃঃ ৯৮-১০০।

বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, ১৯৮৪, পৃঃ ৭১-৭৩।

গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী, কলিকাতা-১৯৯৭, পৃঃ ২৫৩।

জিনবোধি ভিক্ষু

ইচ্ছানংগল

কোশল দেশের ব্রাহ্মণদের একটি গ্রাম। এটি উক্‌কট্‌ঠা গ্রামের নিকটেই অবস্থিত এবং এটি 'মহাসাল' ব্রাহ্মণদের বাসস্থান ছিল। ভগবান বুদ্ধ যখন ঐ স্থানে বসবাস করছিলেন তখন অম্বট্‌ঠ সূত্র দেশনা করেছিলেন। এই সূত্র হতে জানা যায় উক্‌কট্‌ঠার অম্বট্‌ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের জাতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যথা-চংকি, তারুক্‌খ, পোক্‌কর সাতি, জানুস্‌সোনি এবং তোদেয় এখানে বসবাস করতেন। সুত্তনিপাতে বাসেট্‌ঠ

সুত্তে দুজন পণ্ডিত যুবক বাসেট্‌ঠ এবং ভরদ্বাজের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের কথোপকথন হয়। এই বনভূমিতে ভগবান তথাগত একাকী নির্জনে তিনমাস অতিবাহিত করেন এবং ঐ সময়ে একজন ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধকে খাদ্য দেওয়ার জন্য প্রতিদিন আসতো। অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভগবান বুদ্ধ তাঁর বাঞ্ছিত একাকীত্ব উপভোগ করতে পারেন নি কারণ ভগবান তথাগতের আগমনবার্তা শুনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ঐস্থানে এসে চীৎকার করতো তাতে ভগবান বুদ্ধের নির্জনতা ভঙ্গ হতো। ভক্তদের উৎসাহ দমন করার জন্য বুদ্ধ তাঁর ব্যক্তিগত সহচর নাগিতকে প্রেরণ করতে বাধ্য হন।

[দ্রষ্টব্য : দীঘনিকায়, ১, পৃষ্ঠা, ৮৭ ; সংযুক্ত নিকায় ৫, পৃষ্ঠা, ৩২৫

Dictionary of Pali Proper names, G. P. Malalasekera, vol. 1. Page, 304 ; Buddhist Centres in Ancient India, B. N. Choudhury, Page, 82.]

বেলা ভট্টাচার্য

ইতিবুত্তক (ইতিবৃত্তক)

সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ। গ্রন্থের এইরূপ নামকরণের কারণ প্রত্যেক সূত্রের প্রারম্ভে উক্তি আছে : "অর্হৎ ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে" (পালি—বুত্তং হেতং ভগবতা বুত্তং অরহতা)। পালিতে ৪টি নিপাতে ১১টি বর্গ এবং সূত্র সংখ্যা ১১২। অর্থকথাকার ধর্মপাল বলেন যে এই সূত্রগুলি ভগবান কোসম্বীতে খুজ্জুত্তরাকে দেশনা করেছিলেন। খুজ্জুত্তরা আবার উদেনের রাজপ্রাসাদে পাঁচশত স্ত্রীলোকদের নিকট তা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এদের মধ্যে সামাবতী প্রধানা ছিলেন। সূত্রগুলির অধিকাংশ গদ্য ও পদ্যে লেখা। প্রথমে গদ্যে ও পরে পদ্যে লেখা হয়েছে। পঞ্চাশটি সূত্রের বিষয়বস্তু প্রথমে সংক্ষিপ্ত গদ্যে এবং পরে পদ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও বা গদ্যের বিষয়বস্তু হতে পদ্যের বিষয়বস্তু পৃথক। ইতিবুত্তকে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের প্রায় সমস্তই আছে। বিষয়ের গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধকেই একমাত্র বক্তারূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। বুদ্ধই বক্তা এবং আর অন্যান্য সকলেই শ্রোতা। বুদ্ধের উপদেশাত্মক মুখনিঃসৃত বাণীই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, ম্রক্ষ, মান ইত্যাদি হচ্ছে অকুশলের মূল। এই সমস্ত হতে দূরে থাকলেই কুশলে উৎপন্ন হয়। সজ্ঞানে কেহ যদি মৃষাভাষণ দেয় তা পাপ। আবার অন্নদানের দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের দাসত্ব কায়-বাক্য-মনে পাপাচরণ দুঃখ দায়ক। পাপকর্ম বা চিন্তা পরিত্যাগ এবং মৈত্রীভাবনা দান, সত্যভাষণ ইত্যাদি সৎকার্য সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ ইতিবুত্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৩০ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছে যে—ভগবান বুদ্ধ দুটি বিষয় প্রশংসা করেন না—(১) সৎকার্য না করা (২) পাপ কর্মে রত থাকা। আবার বুদ্ধ দুটি বিষয় প্রশংসা করেন (১) সৎকার্য সম্পাদন এবং (২) অসৎকর্ম পরিত্যাগ।

এই সূত্রের পদ্যাংশে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কায় বাক্য মনের দ্বারা দুষ্কার্য সম্পাদন করে সে মৃত্যুর পরে নরকে উৎপন্ন হয়ে দুঃখ ভোগ করে, আবার যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে

সে স্বর্গসুখ ভোগ করে। আবার তৃতীয় নিপাতে উল্লিখিত হয়েছে যে লোভী রাগযুক্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের চীবর স্পর্শ করে থাকলেও সে বুদ্ধ হতে বহু দূরে অবস্থান করে। আবার লোভমুক্ত নিরাসক্ত ও মৈত্রীভাবাপন্ন ভিক্ষু বহু দূরে থাকলেও সে ভগবান বুদ্ধের অতিনিকটে অবস্থান করে। ঐ নিপাতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, বেদনা তিন প্রকার— দুঃখ, সুখ, অদুঃখ-অসুখ। তৃষ্ণা তিন প্রকার—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। দান, শীল, ভাবনা হল সৎকর্ম। সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করা যায়।

যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জেনেছে, সে ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে। এটি চতুর্থ নিপাতে বর্ণিত হয়েছে।

ইতিবুত্তকের ভাষা সরল, স্বাভাবিক ও আড়ম্বর শূন্য। ৭৫ নং সূত্রে বলা হয়েছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি উচ্চনীচ নির্বিশেষে করুণা প্রদর্শন করেন। অন্য একটি সূত্রে বুদ্ধ নিজেকে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও রোগ নিরাময়ক এবং শিষ্যদের তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলে প্রকাশ করেছেন। আরও অন্য একটি সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন, ইন্দ্রিয়গুলি মানবদেহের দরজাস্বরূপ, দরজায় যেমন প্রহরী রাখা প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়গুলি সম্পর্কে তেমনই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

[দ্রষ্টব্য : (১) ইতিবৃত্তক, ডঃ আশা দাশ।

(২) বৌদ্ধ সাহিত্য, ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী।

(৩) Dictionary of Pali Proper names.]

বেলা ভট্টাচার্য

ইদ্ধি—ঋদ্ধি

ঋদ্ধি অর্থ অসাধারণ অলৌকিক বা অতিমানবিক শক্তি যা সাধক, সৎপুরুষেরা ধ্যানবলে আয়ত্ত করেন। এই শক্তির প্রভাবে একজন হয়েও বহুজনরূপে অবস্থান করা যায়। আকাশে বা শূন্যপথে গমন, জলের উপর দিয়ে যাতায়াত পৃথিবীতে বা মৃত্তিকা গর্ভে ডুবে যাওয়া ও নানা প্রকার রূপ ধারণ ইত্যাদি ঋদ্ধি ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই ঋদ্ধিশক্তির অভিলাষী সাধককে অষ্টসমাপত্তি ধ্যানস্তর পর্যন্ত অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে।

বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে ঋদ্ধি দশ প্রকার, যথা—(১) অধিষ্ঠান ঋদ্ধি, (২) বিকুর্বনা ঋদ্ধি, (৩) মনোময় ঋদ্ধি, (৪) জ্ঞানবিস্ফার ঋদ্ধি, (৫) সমাধিবিস্ফার ঋদ্ধি (৬) আর্য ঋদ্ধি, (৭) কর্ম বিপাকজ ঋদ্ধি, (৮) পুণ্যবানের ঋদ্ধি, (৯) বিদ্যাময় ঋদ্ধি এবং (১০) প্রয়োগ প্রত্যয় দ্বারা ধ্যানার্থে ঋদ্ধি।

(১) অধিষ্ঠান ঋদ্ধি :—সাধক ধ্যান বলে নানা প্রকারের ঋদ্ধিবিধান অনুভব করেন। যেমন-এক হয়ে বহু হওয়া, বহু হয়ে এক হওয়া, আবির্ভাব—তিরোধান, মুক্তাকাশে বিচরণের ন্যায় যে কোন প্রাচীর, প্রাকার, পর্বত অনায়াসে ভেদ করে চলে যাওয়া। ব্রহ্মালোক পর্যন্ত

তাঁর বশীভূত হয়। অধিষ্ঠানের দ্বারা সাধক এই জাতীয় ঋদ্ধিলাভ করেন বলে এই ঋদ্ধির নাম অধিষ্ঠান ঋদ্ধি।

(২) বিকুর্বনা ঋদ্ধি ঃ—ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী সাধকের স্বাভাবিক শরীর ত্যাগ করে অলৌকিকভাবে রূপান্তর গ্রহণ করার নামই বিকুর্বনা ঋদ্ধি বা রূপান্তর ঋদ্ধি। যেমন—শিখি নামক ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের অভিভূ নামক একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্মলোকে দাঁড়িয়ে সহস্রীলোকধাতুকে নিজের কণ্ঠস্বর দ্বারা বিজ্ঞাপিত করতে পারতেন। ধর্ম দেশনা করার সময় তাঁর শরীর কখনও দেখা যেত, কখনও দেখা যেত না। কখনও শরীরের অধোভাগ দেখা যেত, অদৃশ্য থাকলেও শরীরের উপরি অর্দ্ধভাগ দেখা যেত। এভাবে ধর্মদেশনা কালে কখনও উর্দ্ধভাগ, কখনও বা অধোভাগ দেখা যেত। কখনও বা দেব, কখনও বা কুমার কখনও বা ব্রহ্মা, কখনও বা সিংহ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অবস্থান প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে বিকুর্বনা ঋদ্ধি।

(৩) মনোময় ঋদ্ধি ঃ—সাধক এই শরীর থেকে অন্য শরীর ঋদ্ধিবলে নির্মাণ করতে পারেন। যেমন—কোন ব্যক্তি সর্পকরণ্ড থেকে সর্পকে বের করল, তারপর সে মনে করে এটা সর্প, এটা করণ্ড। অন্য সর্প অন্য করণ্ড। করণ্ড থেকেই সর্পকে বাইরে আনয়ন করা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ বর্তমান শরীর থেকে ঋদ্ধি বলে অন্য মনোময় সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন অহীনিন্দ্রিয় রূপকায় নির্মাণ করতে পারেন বলেই মনোময় ঋদ্ধি।

(৪) জ্ঞান বিস্ফার ঋদ্ধি ঃ—যে ঋদ্ধি শক্তিতে জ্ঞানের বিস্তার, জ্ঞানের বিভাজন, জ্ঞানের স্ফুরণ ইত্যাদি অলৌকিকভাবে ঘটে থাকে তাকে বলা হয় জ্ঞান বিস্ফার ঋদ্ধি। অনিত্যানুদর্শনের দ্বারা নিত্য সংজ্ঞার প্রহানার্থ লাভ করা জ্ঞান বিস্ফার ঋদ্ধি, তদ্রূপ দুঃখানুদর্শনের দ্বারা সুখ সংজ্ঞার, অনাত্মানুদর্শনের দ্বারা আত্মসংজ্ঞার, নির্বেদানুদর্শনের দ্বারা নন্দির, বিরাগানুদর্শনের দ্বারা রাগের, নিরোধানুদর্শনের দ্বারা সমুদয়ের এবং ত্যাগানুদর্শনের দ্বারা গ্রহণের প্রহানার্থ লাভ করা জ্ঞান বিস্ফার ঋদ্ধি। আয়ুষ্মান বাকুল (বক্কুল), আয়ুষ্মান সংকিচ্চ এবং আয়ুষ্মান ভূতপালের জ্ঞান বিস্ফার ঋদ্ধি ছিল।

(৫) সমাধি বিস্ফার ঋদ্ধি ঃ—অলৌকিকভাবে সমাধির বিস্তার, বিভাজন প্রভৃতি সমাধি বিস্ফার ঋদ্ধি। প্রথম ধ্যানের দ্বারা পঞ্চনীবরণের প্রহান সমাধি বিস্ফার ঋদ্ধি। তদ্রূপ দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা বিতর্ক বিচারের, তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা প্রীতির, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সুখ-দুঃখের, আকাশানন্তায়তন সমাপত্তির দ্বারা রূপ সংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা এবং নানাত্ব সংজ্ঞার, বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকাশানন্তায়তন সংজ্ঞার, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞানান্তায়তন সংজ্ঞার নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চানায়তন সংজ্ঞার প্রহান সমাধি বিস্ফার ঋদ্ধি। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান কোণ্ডণ্য, উত্তরা উপাসিকা এবং শ্যামাবতী উপাসিকার সমাধি বিস্ফার ঋদ্ধি হয়েছিল।

(৬) আর্যঋদ্ধি ঃ—সাধক সংকল্প এবং ঋদ্ধি দ্বারা (ক) প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হন—যেমন তিনি অমঙ্গল বস্তুতে মৈত্রী পোষণ করেন। (খ) তিনি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। যেমন—ইষ্ট বা মঙ্গলজনক বস্তুতে অশুভ দর্শন করেন এবং অনিত্য

সংজ্ঞী হন। (গ) তিনি প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। যেমন—তিনি অনিষ্ট এবং ইষ্ট বস্তুতে মৈত্রীভাব পোষণ করেন। (ঘ) তিনি অপ্রতিকূলে এবং প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে বিহার করেন। যেমন—তিনি ইষ্ট এবং অনিষ্ট বস্তুতে অশুভ দর্শন করে অনিত্য সংজ্ঞী হন। (ঙ) তিনি প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে এবং তদুভয়কে বর্জন করে উপেক্ষক স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞান হয়ে বিহার করেন। যেমন—তিনি কোন রূপ দর্শন করে খুশীও হন না, দুঃখীও হন না, বরং উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন, তদ্রূপ শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য স্পর্শ করে ধর্ম জেনে খুশীও হন না, দুঃখীও হন না, বরং উপেক্ষক ভাব ধারণ করে বিহার করেন বলেই তাকে আর্যঋদ্ধি বলা হয়।

(৭) কর্মবিপাকজঋদ্ধি ঃ—সমস্ত পক্ষী, সমস্ত দেবতা, কিছু কিছু মানুষ বিনিপাতিক সত্ত্বের এই কর্মবিপাকজঋদ্ধি উৎপন্ন হয়।

(৮) পুণ্যবানের ঋদ্ধি ঃ—এই প্রকার ঋদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা, অশ্বপাল এবং রথকারদের সঙ্গে নিয়ে আকাশ পথে বিচরণ করতে পারেন। ইহা পুণ্যবানের ঋদ্ধি। চক্রবর্তী রাজার জ্যোতিষ্ক গৃহপতি, জটিল গৃহপতি, মেন্ডক গৃহপতি এবং ঘোষিত গৃহপতি এই পাঁচ জনের মহাপুণ্যবানের পুণ্যবান ঋদ্ধি ছিল।

(৯) বিদ্যাময় ঋদ্ধি ঃ—এখানে বিদ্যা বলতে বুঝিয়েছে, অলৌকিক বিদ্যা, সম্মোহনী বিদ্যা। বিদ্যাধর ব্যক্তিগণ মন্ত্ররূপ করে আকাশে বিচরণ করেন, আকাশে অন্তরীক্ষে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক ইত্যাদি সেনাব্যূহ প্রদর্শন করতে পারেন। ইহাই বিদ্যাময় ঋদ্ধি।

(১০) প্রয়োগ প্রত্যয় দ্বারা ধ্যানার্থে ঋদ্ধি ঃ—নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দে প্রহান—এটা হচ্ছে তত্র তত্র সম্যক ভাবে প্রয়োগ প্রত্যয় দ্বারা ধ্যানার্থে বা ফললাভার্থে ঋদ্ধি। এভাবে অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদের.........অর্হত্ত্বমার্গের প্রহান লাভ এই ঋদ্ধির অন্তর্গত।

ঋদ্ধির চার প্রকার ভূমি। যথা—বিবেকজ ভূমি হচ্ছে প্রথম ধ্যান, প্রীতি সুখ ভূমি হচ্ছে দ্বিতীয় ধ্যান, উপেক্ষা সুখ ভূমি হচ্ছে তৃতীয় ধ্যান এবং অদুঃখ-অসুখ ভূমি হচ্ছে চতুর্থ ধ্যান।

১৬ প্রকার ঋদ্ধি মূল। যথা—

(১) অসংশীল চিত্ত আলস্যের দ্বারা বিচলিত হয় না—আনেঞ্জ।

(২) অনুদ্ধতচিত্ত ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৩) লোভ বশে অনভিনত চিত্ত সংস্কার বন্ধক লোভের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৪) দ্বেষ বশে অঘটিত চিত্ত ব্যাপাদের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৫) দৃষ্টিবশে অনিশ্চিত চিত্ত মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৬) প্রত্যুপকার-আশাবশে অপ্রতিবদ্ধ চিত্ত ছন্দরাগ বা সপ্তবন্ধক লোভের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৭) বিপ্রযুক্ত চিত্ত কামরাগে প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৮) ক্লেশের দ্বারা বিসংযুক্ত চিত্ত ক্লেশের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(৯) কলুষমুক্ত চিত্ত কলুষের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১০) একালম্বনগত চিত্ত নানাত্ব ক্লেশের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১১) শ্রদ্ধা পরিগৃহীত চিত্ত অশ্রদ্ধার দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১২) বীর্য পরিগৃহীত চিত্ত আলস্যের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১৩) স্মৃতি পরিগৃহীত চিত্ত প্রমাদে প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১৪) সমাধি পরিগৃহীত চিত্ত ঔদ্ধত্যে প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১৫) শ্রদ্ধা পরিগৃহীত চিত্ত অবিদ্যার দ্বারা প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

(১৬) প্রজ্ঞার দ্বারা উদ্ভাসিত অবিদ্যান্ধকারে প্রকম্পিত হয় না—আনেঞ্জ।

এই ১৬ প্রকার ঋদ্ধিমূল, ঋদ্ধি লাভ, ঋদ্ধি প্রতিলাভ, ঋদ্ধি বৈশারদ্যের কারণ।

[দ্রষ্টব্য ঃ মজ্‌ঝিম নিকায় (PTS) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।

Pali—English Dictionary. Edited by. T. W. Rhys Davids and William Stede. London. 1972. p. 120.]

জিনবোধি ভিক্ষু

ইদ্ধিপাদ—ঋদ্ধিপাদ

ঋদ্ধির পাদ ঋদ্ধিপাদ, এখানে প্রতিষ্ঠানার্থে পাদ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ঋদ্ধির দ্বারা সংকল্প (অধিষ্ঠানাদি) সিদ্ধ, সমৃদ্ধ হয় বলে ঋদ্ধি। সাধারণ অর্থে অসাধারণ অলৌকিক শক্তিকে বলা হয় ঋদ্ধি। 'পাদ" অর্থ লাভের উপায় বোঝায়। "ঋদ্ধিপাদ" অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা বা অনন্য সাধারণ অতিমানবিক শক্তি লাভের উপায়কে বলা হয়েছে। এই উপায় চেতনাজাত। স্মৃতি অনুশীলনে অসাধারণ শক্তি বা প্রজ্ঞাবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধু সন্তরা যোগবলে এই শক্তি আয়ত্ত করেন। ঋদ্ধি নানা প্রকার। যথা—দিব্য-শ্রোত্র, পরিচিত্তজ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান (দিব্যচক্ষু) এবং আস্রব বা আসবক্ষয় জ্ঞান। অভিধর্মমতে—ঋদ্ধিপাদ ৪ প্রকার। যথা—ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও বীমংসা ঋদ্ধিপাদ।

(১) ছন্দ ঃ—"ছন্দ" হচ্ছে করার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। অলৌকিক ক্ষমতা লাভের অভিলাষই ছন্দ। কিন্তু ইহা লৌকিক ছন্দ। বস্তুতঃ তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য যে ইচ্ছা তাই ছন্দ। ছন্দ চৈতসিক। পালি অর্থকথায় বলা হয়েছে—কর্তুকাম্যতা অর্থাৎ করার ইচ্ছা, কুশল ধর্ম উৎপাদন করার ইচ্ছা। একে বলা যায় প্রবল ইচ্ছা শক্তি। পুণ্য চিত্তে যখন ছন্দ জাগে তা

কামনায় আবিল হয় না। নির্বাণকে অবলম্বন করে যে ছন্দ উৎপন্ন হয় তা নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক। তৃষ্ণাক্ষয়ের ক্ষেত্রে ছন্দ অত্যন্ত বলবতী হয়। ইহা লোকোত্তর ভাবে উক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল এই ছন্দকে অবলম্বন করে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন।

(২) বীর্য ঃ—"বীর্য" হচ্ছে মানসিক বল বা পরাক্রম, ঐশী শক্তি লাভের একান্ত প্রচেষ্টা। ইহা চৈতসিক। আলস্য, জড়তা, বিদূরিত করে চিত্তে প্রবর্তিত হয় দৃঢ়তা। বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করে বাধার পর বাধা অতিক্রম করা এর প্রকৃতি। বীর্য চারি সম্যক্ প্রধানকে ১। উৎপন্ন অকুশল বা পাপচিত্ত বর্জনের প্রচেষ্টা ২। অনুৎপন্ন অকুশল বা পাপচিত্ত অনুৎপত্তির প্রচেষ্টা ৩। অনুৎপন্ন কুশল চিত্তের উৎপত্তির প্রচেষ্টা এবং ৪। উৎপন্ন কুশল চিত্তের বৃদ্ধির প্রচেষ্টা) নির্দেশ করে। যেমন—আয়ুষ্মান সোন বীর্যকে অবলম্বন করে লোকোত্তর ধর্মলাভ করেছিলেন। তিনি ভাবনা যুক্ত হয়ে অনবরত চংক্রমণ করার সময় পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও আরব্ধবীর্য হেতু চংক্রমণে ক্ষান্ত হন নি। এভাবে বীর্যের রূপায়ন এবং বীর্যলাভের জন্য একান্ত উদ্যোগ হল বীর্যঋদ্ধিপাদ।

(৩) চিত্ত ঃ—চিত্ত বা মনকে অধিপতি করে চিত্তের যে সমাধি বা একাগ্রতা তাই চিত্ত। ইহা হচ্ছে ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চিন্তা। চিন্তা করে বলে চিত্ত। চিত্ত সন্ততি (চিন্তা স্রোত ধারা) ধারণ করার শক্তিই চিত্ত। এখানে চিত্ত বলতে লোকোত্তর চিত্তকে বোঝায়। আয়ুষ্মান সম্ভূত চিত্তকে অবলম্বন করে লোকোত্তর ধর্মলাভ করেছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন চিত্ত বা একান্ত চেতনা থাকলে কি না হয়। তাই তিনি চিত্তকে পূর্বমুখী করেছিলেন। সুতরাং ঋদ্ধি লাভের জন্য একান্ত চিন্তাই হল চিত্তঋদ্ধিপাদ।

(৪) বীমংসা ঃ—বীমংসা শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসন্ধান। একে প্রজ্ঞাও বলা হয়। অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা। আলোকপাতে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় তেমনি বীমংসার উদয়ে অজ্ঞান তিমির বিধ্বস্ত হয়। এখানে বীমংসা হল লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান প্রজ্ঞা। আয়ুষ্মান মোঘরাজ এই বীমংসাকে অবলম্বন করে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছিলেন। লোকোত্তর চিত্তে যখন উপরোক্ত চার বিষয় বিদ্যমান থাকে তখন তাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ। এই চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ প্রত্যেকটি অধিপতি স্বভাববিশিষ্ট। স্মৃতিক্ষণে এই চারি ঋদ্ধিপাদ স্ব-স্ব শক্তিতে সহযোগিতা করে। এই চৈতসিক (চিত্তবৃত্তি) চতুষ্টয় যোগী সাধন করে বলে যখন চতুর্থ ধ্যান স্তর আয়ত্ত হয়, তখন ৪ ঋদ্ধিপাদ পরিপুষ্টি লাভে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভী যোগীগণের এই চারিঋদ্ধিপাদ অনায়াসে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়। তখন সাধকের পঞ্চ অভিজ্ঞা (নানাবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্য শ্রোত্রজ্ঞান, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্বজন্মজ্ঞান ও সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তিজ্ঞান) এবং ষড় অভিজ্ঞা (পঞ্চঅভিজ্ঞাসহ আসবক্ষয়জ্ঞান) লাভ হয়।

আরো ৮ আট প্রকার ঋদ্ধিপাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—সাধক ছন্দকে অবলম্বন করে যদি সমাধি লাভ করেন তাঁর চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। কিন্তু ছন্দ সমাধি নয়, সমাধিও ছন্দ নয়, অন্য ছন্দ, অন্য সমাধি। অনুরূপভাবে বীর্য, চিত্ত ও বীমংসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এভাবে চারি ঋদ্ধিপাদ সমাধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৮ প্রকার হয়।

[দ্রষ্টব্য : পটিসম্ভিদামগ্গো P. T. S. ১ম খণ্ড লন্ডন, ১৯০৭ সাল

মহাপরিনিব্বান সুত্তং—সঙ্কলিত ও অনুঃ রাজগুরু শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম—১৯৪১ সাল পৃঃ ২০৮-২১০।

Pali English Dictionary. Edited by T. W. Rhys Davids and William Stede. London. 1972. p. 120.

জিনবোধি ভিক্ষু

ইন্দ (ইন্দ্র)

শব্দটির অর্থ হল 'অধিপতি' (ইন্দ্ ধাতু থেকে) অর্থাৎ যিনি দেবগণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। অয়কূট জাতকের (জাতক ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৬) এক গাথায় ইন্দকে দেবতাদের রাজা (দেবরাজা) বলা হয়েছে এবং ইন্দ ছিলেন দেবতাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় দেবতা। তাঁর অপরাপর নামগুলি হল বাসব, সক্ক, মঘবা ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্র আদিদেবতা, যদিও পুরাণে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-এই তিনশক্তির অধীন। ইনি পালি নিকায় সাহিত্যে অত্যন্ত পরিচিত দেবতা, ইন্দের ন্যায় বৈদিক অন্য কোন দেবতার বারংবার উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রের জন্ম হয় কোসিয় গোত্রে বা কুলে (জাতক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৫০১) এবং তিনি বত্রভূ কারণ তিনি বত্র (সংঃ বৃত্র) জয়ী (ঐ, ৫ম, পৃঃ ১৫৩), তাঁর বজ্রের নাম ইন্দ্রবজিরা তাই তিনি পালি সাহিত্যে বজিরহথা নামেও খ্যাত। (ঐ, ১ম পৃঃ ৩৫৪)। ইন্দ্রের বজ্রের শব্দ সর্বপ্রকার শব্দের উর্দ্ধে (উদান অট্‌ঠকথা পৃঃ ৬৭)। একবার ইন্দ্র বজ্র ক্ষেপণ করলে এর অগ্রগতি কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না। (বিভঙ্গ অট্‌ঠকথা পৃঃ ৩৩৩) ইনি ছদ্মবেশে কখনও কখনও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন এবং দুষ্টের দমন করেন তাঁর বজ্রসহযোগে। (ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৫)।

ইনি জরামৃত্যুর উর্দ্ধে এবং সকল নৃপতিগণের মধ্যে সর্বপেক্ষা সুখী যা কেবলমাত্র সাত্তিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই লভ্য হয়। (সুত্তনিপাত গাথা নং ৫১৭) ইনি অসুরবিজয়ী যে কারণে তিনি অসুরেন্দ্র এবং অসুরাধিপতি নামে খ্যাত। (জাতক, ৪র্থ, পৃঃ ৩৪৭)। অন্যদিকে তিনি জয়পতি (জয়তং পতি)। মহাবংসেও ইন্দ উল্লিখিত অসাধারণ শৌর্যশালীরূপে। (৩০ অধ্যায়, ১০) জাতকে (৬ষ্ঠ, ২৭১) ইন্দের রাজধানী হিসেবে মসক্কসারের নাম করা হয়েছে যদিও অমরাবতীকেই বেশিরভাগ বর্ণনায় রাজধানী বলা হয়েছে। পুনরায় উল্লিখিত আছে যে অসুরবিজয়ের পর তাঁর বহু মূর্তি (ইন্দপটিমা) চিত্রকূটের বিভিন্নস্থানে স্থাপন করা হয়েছিল অসুরদের ভয় দেখাবার জন্য যাতে তারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করার দুঃসাহস না করে। (জাতক, ৬ষ্ঠ পৃঃ ১২৫-২৬)।

ইন্দ্রের সাহচর্য অত্যন্ত শুভ বলে ধরা হত। (জাতক, ৫ম, ৪১১) ইন্দ্রকে গোধনের রক্ষাকর্তা বলা হয়, মানুষ গো-হত্যা করলে ইন্দ্র তাদের ওপর অত্যন্ত কুপিত হন (সুত্তনিপাত গাথা নং ৩১০)।

তাবতিংস স্বর্গের দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ 'পুরোহিত' রূপে খ্যাত কারণ উক্ত স্বর্গের দেবতাগণের প্রধান ইন্দ্র সকল দেবতা ও মানুষদের মঙ্গলকামনা করে থাকেন। জাতকে (৬ষ্ঠ পৃঃ ৫৬৮) তাবতিংস দেবতাগণকে 'স-ইন্দকা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীঘনিকায়ে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৬) তিনি তিদিবপুরবর এবং সুরবরতররূপে বর্ণিত। একস্থানে তিনি সোম, বরুণ, ঈসান, পজাপতি, ব্রহ্মা, মহিদ্দি ও যমের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন। (দীঘ, ১ম, ২৪৪-৪৫)।

বুদ্ধশিষ্য গোপকের কাছে ধর্মকথা শ্রবণ করে ইন্দের দুই সহচর বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইন্দসমানগোত্ত জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব যখন হিমবন্ত প্রদেশে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করে ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক পঞ্চশত ঋষির আচার্য হয়েছিলেন তখন বোধিসত্ত্বের ইন্দসমানগোত্ত (ইন্দ্রসমানগোত্র) নামে এক অতি অবাধ্য শিষ্য ছিল। ইনি অবাধ্যতাবশতঃ কোনরকম শুভ উপদেশে কর্ণপাত করতেন না। বোধিসত্ত্বের সদুপদেশের অবাধ্যতা করে ইন্দসমানগোত্ত কি ফল লাভ করেছিল উপরোক্ত জাতকে তাই বর্ণিত হয়েছে।

ইন্দসমানগোত্ত একবার এক মাতৃহীনা হস্তিশাবক পুষেছিল। বোধিসত্ত্ব সে বিষয়ে অবগত হয়ে ইন্দসমানগোত্তকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং হস্তিশাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজের পালককে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না বলে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দসমানগোত্ত স্নেহের বশবর্তী হয়ে বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত করেননি। ক্রমে ক্রমে হস্তিশাবক ইন্দসমান গোত্তের লালনপালনে বিশালাকার এক পূর্ণবয়স্ক হস্তীতে পরিণত হয়। অতঃপর বোধিসত্ত্বের ঋষিশিষ্যরা ইন্দসমানগোত্তসহ একবার অরণ্যে ফলমূল আহরণ করার উদ্দেশ্যে আশ্রম ত্যাগ করে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে হস্তীটি উদগ্র কামনার তাড়নায় অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ হস্তীটি তাদের বাসস্থান ধ্বংস করে গৃহের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং পালক ইন্দসমানগোত্তের প্রাণসংহার করবার দুরভিসন্ধি নিয়ে বনের অভ্যন্তরে একস্থানে লুকিয়ে থাকে। অতঃপর ইন্দ্রসমানগোত্ত হস্তীর উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে অন্যান্য ঋষিদের থেকে অগ্রবর্তী হয়ে হস্তীর কাছে এসে উপস্থিত হন। তিনি হস্তীর দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে পূর্বের ন্যায় হস্তীর নিকটবর্তী হলে সেটি তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারে, মস্তক পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে হত্যা করে ও অবশেষে ঋষির দেহ বারংবার মর্দন করে ক্রৌঞ্চনাদ করতে করতে অরণ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর অন্যান্য তাপসরা আচার্যরূপী বোধিসত্ত্বকে ইন্দসমানগোত্তের মৃত্যুসংবাদ দিলে বোধিসত্ত্ব পুনরায় গুরুজনদের কথার অবাধ্যতা করার নিদারুণ ফল কি হয় এবং দুর্জনদের সংসর্গ যে পরিত্যাজ্য তা উপদেশ করেন। অন্যদিকে, তিনি সাধুসঙ্গের উপকারিতার কথাও উপদেশ দেন। (জাতক, ২য় খণ্ড, ১৬১ নং)।

বুদ্ধ তাঁর জনৈক অবাধ্য শিষ্যকে উক্ত জাতক বর্ণনা করে বলেছিলেন যে ঐ শিষ্য পূর্বজন্মেও মত্ত হস্তীর পদনিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল।

ইন্দসমানগোত্ত সম্ভবতঃ থেরগাথা অট্ঠকথায় বর্ণিত কসিয় থের। (পরমত্থদীপনী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫০ তুলনীয় : DPPN Vol-I p. 11)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইন্দসাল গুহা

বেদিয় পর্বতের একটি গুহার নাম। এটি রাজগহের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। কথিত আছে, বুদ্ধ যখন তথায় বসবাস করছিলেন তখন সেস্থানেই তাঁর সঙ্গে দেবরাজ সক্কের (ইন্দ্র) কথোপকথন হয়। এগুলি দীঘনিকায়ের (২য় খণ্ড, ২৬৩), 'সক্কপঞ্হ সুত্তের' অন্তর্ভুক্ত। 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধের সক্কপঞ্হ সুত্তের দেশনা শুনে স্বর্গের আটশত কোটি দেবতাগণের সত্যদর্শন হয়েছিল। (মিলিন্দপঞ্হ পৃঃ ৩৪৯)।

বুদ্ধঘোষের মতে গুহাটি দুটি ঝুলন্ত পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এবং এটির প্রবেশদ্বারে ছিল একটি বিশালাকার শালগাছ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা গুহাটি সর্পিল অলংকরণবিশেষের দ্বারা বেষ্টিত করে বুদ্ধকে দান করেছিল। (সুমঙ্গলবিলাসিনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৭)।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুহাটির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সময়কালে এস্থানটি জনসমাকীর্ণ ছিল এবং বর্ণনানুযায়ী এটি নালন্দার উত্তরপূর্ব দিকের এক যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। (Giles, H. A.—Travels of Fa-hien, Cambridge 1923 p. 48f.) অপরদিকে, হিউয়েন সাঙ এটি জনশূন্য অবস্থায় দেখেছেন এবং এটিকে ইন্দ্রকশৈলগুহা নামে অভিহিত করেছেন। (Beal S—(tr.) Si-yu-Ki—Buddhist Records of the Western World, Vol. II. London, 1883 p. 180-81) উভয় পরিব্রাজকই বর্ণনা করেছেন যে পাহাড়গুলিতে কিছু কিছু লক্ষণীয় চিহ্ন বা ছাপ ছিল যেগুলো তাদের মতে সক্কের সঙ্গে বুদ্ধের কথোপকথন প্রশ্নোত্তরের আকারে অঙ্কিত।

বিশিষ্ট ভূগোলবিৎ কানিংহাম সাহেবের মতে অধুনা বিহারের গিরিয়েক জেলার থেকে দু'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম স্থানে অবস্থিত একটি গুহাই হল ইন্দসাল গুহা। (Ancient Geography of India, p. 539 ff ; তুলনীয় : Stein এর প্রবন্ধ, Indian Antiquary, 1901, p. 54)।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইন্দ্রিয়

জ্ঞানাঙ্গ হলো ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বলতে এক প্রকার শক্তি, কৃত্য অঙ্গ, নৈতিক রূপ, প্রজ্ঞায়তন ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বোঝায়। এক কথায়—ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে এই অর্থে বলা হয় ইন্দ্রিয়।

অর্থাৎ চক্ষু দর্শনকৃত্য সম্পাদনে চক্ষুবিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে এই অর্থে ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয় বাইশ প্রকার, যথা—(১) চক্ষু ইন্দ্রিয়, (২) শ্রোত্রেন্দ্রিয়, (৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, (৪) জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, (৫) কায়েন্দ্রিয়, (৬) মনেন্দ্রিয়, (৭) স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, (৮) পুরুষেন্দ্রিয়, (৯) জীবিতেন্দ্রিয় (১০) সুখেন্দ্রিয়, (১১) দুঃখেন্দ্রিয়, (১২) সৌমনস্যেন্দ্রিয়, (১৩) দৌর্মনস্যেন্দ্রিয়, (১৪) উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, (১৫) শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, (১৬) বীর্যেন্দ্রিয়, (১৭) স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, (১৮) সমাধি-ইন্দ্রিয়, (১৯) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, (২০) অজ্ঞাতকে জানার সংকল্প সূচক ইন্দ্রিয়, (২১) লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও (২২) লোকোত্তর জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় দর্শন শ্রবনাদিকৃত্য সম্পাদনে চক্ষুবিজ্ঞানাদি পঞ্চ বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে যে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে তাকে বলা হয় পঞ্চেন্দ্রিয়। স্ত্রী ও পুরুষত্বভেদে স্ত্রীজনোচিত ও পুরুষ জনোচিত অবয়বাদি গঠনে প্রভাব বিস্তার করে তাই এই দুইটিকে স্ত্রী-ইন্দ্রিয় ও পুরুষেন্দ্রিয় বলা হয়। জীবিত ইন্দ্রিয় বলতে জীবনীশক্তিরূপে নামরূপ বা দেহ মনের পরিপালন বোঝায়। মন সহজাত চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে বলে তা মনেন্দ্রিয়। সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য-দৌমনস্য এবং উপেক্ষাদি পাঁচ প্রকার বেদনাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। কারণ এরা সহজাত চিত্ত চৈতসিককে শান্ত, প্রণীত (উত্তম), নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্ত করায়। শ্রদ্ধা প্রসন্নতা আনয়নে, বীর্য আলস্য জড়তা বিনোদনে, স্মৃতি আলম্বন অনুস্মরণে, সমাধি একাগ্রতা সম্প্রদানে এবং প্রজ্ঞা মোহনাসনে চিত্ত-চৈতাসিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে ইন্দ্রিয়। তারা তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে। শেষোক্ত ইন্দ্রিয় তিনটি অতীব গুরুত্বরূপ এবং তারা লোকোত্তর জ্ঞানের অন্তর্গত। তেমন অজ্ঞাতকে (চারিআর্য সত্যকে) জানার সংকল্প মিথ্যাদৃষ্টি-সংশয়াদি সংযোজন-এর (সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মপাদ, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা বা সংশয়) বা বন্ধন ছেদন করে সহজাত চৈতসিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বলে ইন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় (স্রোতাপত্তিফল থেকে অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান পর্যন্ত ছয় জ্ঞান) কামরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি সংযোজন ছেদনে সহজাত চৈতসিকের উপর প্রভাব বিস্তার দ্বারা নিজের বশবর্তী করে বলে ইন্দ্রিয় বলা হয়। লোকোত্তর-জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ ফল জ্ঞান) জাগতিক ব্যাপারে সকল ঔৎসুক্য বিনোদনে চিত্ত চৈতসিককে নির্বাণ প্রবণ করে। কারণ তিনি চারি আর্য সত্য সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত করেছেন। সর্বশেষ ইন্দ্রিয় অর্হত্ত্বের সর্বোচ্চজ্ঞান বা অর্হত্ত্ব ফলজ্ঞানকে বোঝায়।

দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের ক্রমের বৈশিষ্ট্য ঃ—দেহীকে আর্য-ভূমি লাভ করতে হলে সর্বপ্রথমে দেহস্থ ইন্দ্রিয় সমূহ বুঝতে হবে। এই জন্য চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় উল্লেখিত হয়েছে। দেহী পুনরপি স্ত্রী বা পুরুষ। এইজন্য এই দুই ইন্দ্রিয় তৎপরই স্থান পেয়েছে। কিন্তু উক্ত সপ্ত ইন্দ্রিয় জীবিতেন্দ্রিয় প্রতিবন্ধ। যতকাল জীবিতেন্দ্রিয় প্রবাহমান থাকে, ততকাল সুখ-দুঃখাদি বেদনা বিদ্যমান থাকে। এই বেদনা কিরূপে ইন্দ্রত্ব করে তা বোঝা আবশ্যক। বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, সর্ববিধ বেদনাই দুঃখ। "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিনাম দুক্খা"। এই দুঃখ অতিক্রম করতে হলে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নয়, অনুশীলনে তাদিগকে ইন্দ্রত্ব পরিপুষ্ট করা অপরিহার্য। এদের ইন্দ্রত্ব লাভ উচ্চাশা

নির্দ্ধারণের শক্তি লাভ হয়, অজ্ঞাতকে জানবার সংকল্প জাগে। এই সংকল্পেন্দ্রিত্ব অবস্থাই লোকোত্তরের প্রথম মার্গে, স্রোতাপত্তি মার্গেই উপনীত হবে। এই মার্গ সেই পরিপক্ক জ্ঞান প্রদান করে, সেই লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় (অঞ্ঞিন্দ্রিয়) এর পরেই স্থান পেয়েছে। এই লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুশীলনে লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ইহাই অর্হত্বের অবস্থা। এখানেই করণীয়কৃত্য হয়। ৮ম জীবিতেন্দ্রিয় দ্বিবিধ—রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ও অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়। ১৪শ উপেক্ষেন্দ্রিয় বেদনা চৈতসিক; "তত্র মধ্যস্থতা" নামক শোভন চৈতসিক নয়। বিংশ "অজ্ঞাত—জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়" উচ্চতর জীবন অর্থাৎ স্রোতাপত্তি-মার্গ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন।

১ম হতে ১১শ ইন্দ্রিয় কর্মানুসারে অব্যাকৃত। ১৩শ ইন্দ্রিয় কর্মানুসারে অকুশল। দশম হতে দ্বাবিংশ ইন্দ্রিয় চৈতসিক। প্রথম হতে সপ্তম এবং নবম ইন্দ্রিয় চৈতসিক নয়। প্রথম সাতটি ইন্দ্রিয় রূপ এবং দশমটি (মনেন্দ্রিয়) বিজ্ঞান। অষ্টম জীবিতেন্দ্রিয় রূপ এবং চৈতসিক। স্ত্রী-ইন্দ্রিয় এবং পুরুষ-ইন্দ্রিয় শুধু কামলোকে লভ্য, রূপারূপলোকে লভ্য নয়। রূপ জীবিতেন্দ্রিয় অরূপলোকে লভ্য নয়। পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট রূপারূপ উভয় জীবিতেন্দ্রিয় লভ্য।

অতএব ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে প্রথম ইন্দ্রিয় মার্গ স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় পরবর্তী ছয় মার্গের সঙ্গে এবং ফল স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তৃতীয় ইন্দ্রিয় শেষ ফলস্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ভাবে শেষ তিন ইন্দ্রিয় লোকোত্তর ভূমির অন্তর্গত। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কয়েকটি "সংসার চক্রের" উৎপত্তিতে অবদান রাখে এবং অন্যগুলো সংসার থেকে বিমুক্তির বিধান করে। (গাইড থ্রু দি বিসুদ্ধিমগ্‌গ—উঃ ধম্মরত্ন, সারনাথ, মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৬৮, পৃঃ ১১৭)।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of the Pali Language. ed. Childers. R.C. London. 1874. P. 159.

Guide Through the Abhidhammapitaka—Ñyānatiloka, Colombo. 1958. p. 23, 117. Patisambidhāmagga. Vol. II. ed. Arnold Taylor, (PTS) London. 1905-1907. p. 11-34. অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—অনুবাদক বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী। চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃঃ ২১৮-২২০।

জিনবোধি ভিক্ষু

ইন্দ্রিয়জাতক

জাতক সংখ্যা ৪২৩। এই জাতকটিতে বর্ণিত আছে যে নারদ নামে এক ঋষি একবার এক সুন্দরী গণিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে যে তপোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন, শাস্তা শরভঙ্গের উপদেশে প্রকৃতস্থ হয়ে পুনরায় তিনি তা প্রাপ্ত হয়ে ধ্যানপরায়ণ হয়েছিলেন।

আখ্যানটি হল এই যে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব (এই জাতকে বোধিসত্ত্ব জোতিপাল ও শরভঙ্গ—উভয় নামেই বর্ণিত) এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হন এবং পরে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করে বনে গমন করেন। বোধিসত্ত্বের কাছে বহু তাপস শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একশত জন ছিল 'অন্তেবাসি জেট্‌ঠক' শিষ্য। যেমন—কালদেবল, সালিস্‌সর, মেণ্ডিসার, পব্বতিস্‌সর, অনুশিষ্য ইত্যাদি। কালদেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন নারদ, যিনি অরঞ্জর পার্বত্যদেশে একাকী এক গুহায় বাস করতেন। সে স্থানের অনতিদূরে এক বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ছিল যার মধ্য দিয়ে এক নদী প্রবাহিত হয়েছিল। ঐ নদীতে বহুলোক স্নানার্থে অবতরণ করতেন এবং তাদের প্রলুব্ধ করার জন্য বহু সুন্দরী গণিকা নদীতীরে বসে থাকত। এদের মধ্যে একজনকে দেখে সন্ন্যাসী নারদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি খ্যানাহার ত্যাগ করেন ও কামবশে দগ্ধ হয়ে শয্যাগ্রহণ করেন। এদিকে নারদের অগ্রজ কালদেবল তপোবলে নারদের সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে আকাশমার্গে নারদের কাছে উপস্থিত হন। তিনি কামতাড়িত নারদকে বাঁচাবার জন্য সহচর তিনজন তাপসকে নারদের কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু নারদ তার জ্যেষ্ঠ ও তাপসদের উপদেশে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন না। অতঃপর কালদেবল শূন্যমার্গে শাস্তা শরভঙ্গের কাছে গিয়ে শাস্তাকে নারদের কাছে নিয়ে আসেন। শাস্তা নারদকে অবলোকন করেই বুঝতে পারেন যে তিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়েছেন। নারদও শাস্তার কাছে প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করেন। অনন্তর শাস্তা নারদকে উপদেশ দেন যে ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হলে মানুষের জীবন দুঃখময় হয়, কামচরিতার্থের দ্বারা প্রকৃত সুখলাভ করা যায় না, ইন্দ্রিয়জনিত সুখের দ্বারা কেবলমাত্র ধর্মেরই বিনাশ হয় যার ফলে নরকগামী হতে হয়।

অতঃপর শাস্তা নারদকে প্রথম জীবনেই ধর্মপালন ইত্যাদি কর্তব্যপালন করবার উপদেশ প্রদানের জন্য এক ব্রাহ্মণ যুবকের কাহিনী বিবৃত করেন। যে ব্রাহ্মণ যুবক প্রথম জীবনে কর্তব্য পালন না করার জন্য শেষ জীবনে অত্যন্ত দুঃখলাভ করেছিলেন। উক্ত কাহিনী শ্রবণ করে নারদ তাপস শাস্তার কথায় জ্ঞান ফিরে পান এবং শরভঙ্গের কাছে নিজ কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনন্তর শাস্তার সত্যসমূহের ব্যাখ্যা শুনে উৎকণ্ঠিত নারদ ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উপরোক্ত আখ্যানটি বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে বিবৃত করেন। এক ভিক্ষু তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের পত্নীর প্রলোভন ছাড়তে পারেননি, পত্নীর আকর্ষণে তিনি চতুর্বিধ ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন ও মহাদুঃখ ভোগ করেন। অতঃপর শাস্তার অনুকম্পায় উক্ত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হন। উল্লেখ্য যে পূর্বজীবনেও ঋষি নারদরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও তার শাস্তার সাহায্যেই দুঃখমুক্তি ঘটে।

আখ্যানটি কামবিলাপ জাতকেও (জাতক নং ২৯৭) বর্ণিত।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইন্দ্রিয় পচ্চয়—ইন্দ্রিয় প্রত্যয়

ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে, প্রভাব বিস্তার করে এই অর্থে বলা হয় ইন্দ্রিয়। চক্ষু যখন দর্শন কার্য সম্পাদন চক্ষুবিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে তখন তা ইন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। প্রত্যয় বলতে বোঝায় উৎপত্তি, উৎপত্তিস্থান, হেতু

বা কারণ। অর্থাৎ যে বিষয় যে বিষয়ের স্থিতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে উপকারক বা সহায়ক তাকে তার প্রত্যয় বলা হয়। অধিপতি বা প্রধান অর্থে উপকারক ভাবদ্বয় (স্ত্রী-পুরুষেন্দ্রিয়) ভিন্ন অবশিষ্ট বিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ধর্মী।

প্রত্যয় ধর্ম (গুণ-শক্তি) তিনটি—উৎপাদন, ধারণ, পালন। অনন্তর প্রত্যয় উৎপাদন গুণ-বিশিষ্ট ; পশ্চাজাত প্রত্যয়ে ধারণগুণ প্রকট, এবং জীবিতেন্দ্রিয়ের পালনগুণ প্রধান। কিন্তু "ভাবদ্বয়ে" এই তিনগুণের কোনটি বিদ্যমান নেই। প্রত্যয় গুণ না থাকলেও এদেরকে বলা হয় ইন্দ্রিয় ; কারণ এরা স্ত্রী ও পুরুষের হাব-ভাব, আহারবিহারাদি লক্ষণ সম্বন্ধে কায়ার (দেহের) উপর আধিপত্য করে। পঞ্চপ্রসাদ "ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ধর্ম" এবং চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চ বিজ্ঞান "প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম"। এরা পূর্বজাত ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় "প্রত্যয়ধর্ম" এর "প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম" কর্মজরূপ (রূপ জীবিতেন্দ্রিয় ব্যতীত) রূপ জীবিতেন্দ্রিয় সহজাত রূপের স্থিতিক্ষণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

অবশিষ্ট পঞ্চদশ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়-ধর্মী ; এদের প্রত্যেকের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম স্ব-স্ব সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ও তৎতৎ সমুত্থানরূপ। ইহা অবশ্য চিত্ত-সমুত্থান রূপ ; কিন্তু প্রতিসন্ধিক্ষণে কর্মজ রূপ। (দ্রষ্টব্য : অভিধর্মার্থ সংগ্রহ-অনুঃ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃঃ ২৫৬-৫৭) ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের শ্রেণীভাগ পট্‌ঠান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে—মোট বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষেন্দ্রিয় ব্যতীত অবশিষ্ট বিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। সহজাত, পূর্বজাত এবং বাস্তব জীবনভেদে ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটির প্রত্যয়ধর্মসমূহ হচ্ছে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়, যেমন—জীবেতিন্দ্রিয় ; মনঃইন্দ্রিয়, সুখেন্দ্রিয়, দুঃখেন্দ্রিয়, সৌমনস্যেন্দ্রিয় (অর্থাৎ হর্ষেন্দ্রিয়), দৌমনস্যেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বিষাদেন্দ্রিয়) উপেক্ষেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অজ্ঞাতকে জানার সংকল্প সূচক ইন্দ্রিয়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর অজ্ঞাতাবীন্দ্রিয় বা জ্ঞানীন্দ্রিয়। দ্বিতীয়টির প্রত্যয়ধর্ম হচ্ছে পঞ্চ চেতনেন্দ্রিয় যেমন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শোত্রেন্দ্রিয়, ঘ্রানেন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় এবং কায়েন্দ্রিয়। তৃতীয়টির প্রত্যয়ধর্ম হচ্ছে বাস্তব জীবন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—চক্ষু-ইন্দ্রিয় চক্ষুবিজ্ঞানধাতুর প্রত্যয়। শ্রোত্রেন্দ্রিয় শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণবিজ্ঞান এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। জিহ্বেন্দ্রিয় জিহ্বাবিজ্ঞান এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। কায়েন্দ্রিয় কায়বিজ্ঞান এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কর্মজরূপসমূহের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।

অরূপী ইন্দ্রিয়সমূহ সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের এবং তৎসমুত্থিত রূপ সমূহের ইন্দ্রিয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় (দ্রষ্টব্যঃ—পট্‌ঠান, ১ম ভাগ, অনুঃ ডঃ সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা-১৯৯৭ পৃঃ ১১)।

উক্ত ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রত্যয় ধর্ম এবং এর দ্বারা জাত-বিজ্ঞান রূপ ইত্যাদি হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম। এর প্রভাবে শ্রদ্ধা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যার ফলে ব্যক্তি করজোড়ে

বন্দনা করে। এখানে শ্রদ্ধা বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং করজোড়ে বন্দনা হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম। অনুরূপভাবে চক্ষু হচ্ছে ইন্দ্রিয় এই বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে চক্ষু হচ্ছে প্রত্যয় ধর্ম এবং চক্ষু বিজ্ঞান হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষাকারী হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যয়।

এই ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে স্ত্রী-ইন্দ্রিয় ও পুরুষেন্দ্রিয় ব্যতীত অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহ আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ভূমিকা পালন করে ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় নামে অভিহিত হয়।

[দ্রষ্টব্য : A Manual of Abhidhamma—Nārada Mahāthera. Srilanka, 1980. p. 377.

An Introduction to Abhidhamma—Silananda Brhmachari. Calcutta, 1996. p. 30-37]

জিনবোধি ভিক্ষু

ইন্দ্রিয়ভাবনা সুত্ত

মঝিম নিকায়ে বর্ণিত একটি সুত্ত। (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৩০২) কজঙ্গল নামক স্থানে বুদ্ধ সুত্তটি দেশনা করেন।

কথিত আছে যে একবার পারাসরিয় নামে এক ভিন্ন মতাবলম্বী শাস্তার শিষ্য এক ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধের নিকটে এসেছিলেন। শিষ্যটির নাম ছিল উত্তর। বুদ্ধ উত্তর যে পারাসরিয়ের শিষ্য জানতে পেরে শিষ্যটিকে ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় সম্পর্কে পারাসরিয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করতে বলেন। উত্তরে পারাসরিয়ের শিষ্য বলেন যে একজন মানুষ যে চক্ষুহীন ও বধির অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়গুলি বিকল, তার ইন্দ্রিয়জয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বুদ্ধ পারাসরিয়ের শিষ্যের উত্তরের প্রতিক্ষেপণ করেন যে একজন ব্যক্তি মূক ও অন্ধ অর্থাৎ একজনের ইন্দ্রিয়গুলি বিকল হলেও ইন্দ্রিয়বাসনা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। অতঃপর ব্রাহ্মণ উত্তর বুদ্ধের কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে না পেরে নিঃশব্দে বিহ্বল হয়ে বসে থাকেন।

তখন বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধকে অনুরোধ করেন যে ইন্দ্রিয়দমন কি উপায়ে সম্ভব তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাতে ব্রাহ্মণ উত্তর বুদ্ধের মতামত সম্পর্কে অবগত হন। বুদ্ধ সম্মত হয়ে ইন্দ্রিয় দমনের উপায় সম্পর্কে বোঝাবার জন্য 'ইন্দ্রিয়ভাবনা সুত্ত'টি বহু রূপক উপমার মাধ্যমে বিবৃত করেন।

থেরগাথা (গাথা নং ৭২৬ ইত্যাদি) ও থেরগাথা অট্‌ঠকথায় (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭) বলা আছে যে থের পারাপরিয় স্বয়ং (সম্ভবতঃ পারসরিয় ও পারাপরিয় একই ব্যক্তি) এই সুত্তটি বুদ্ধের নিকট শিক্ষালাভ করে জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন ঘটান।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইল্লীস জাতক

শাস্তা জেতবনে জনৈক কৃপণ ধনীব্যক্তি সম্পর্কে বলার সময় উপরোক্ত জাতকটি বর্ণনা করেছিলেন। এই জাতকটি রাজগহের সক্কর (শর্করা) নিগমের মচ্ছরিকোসিয় (মৎসরী কৌশিক) নামে এক কৃপণ শ্রেষ্ঠীর বুদ্ধশিষ্য মোগ্গল্লানের দ্বারা বৈপরীত্যকরণের আখ্যানবিশেষ। বর্ণিত আছে যে কৃপণ ব্যক্তিটির পিষ্টক ভক্ষণ করার ইচ্ছে জাগলে তার স্ত্রীকে বাসগৃহের সপ্তমতলে পিষ্টক রন্ধন করার নির্দেশ দেন যাতে তার অংশীদার হয়ে কেউ বেশি খরচ করিয়ে দিতে না পারে। কিন্তু শাস্তা ঘটনাটি যোগবলে জানতে পেরে শিষ্য মোগ্গল্লানকে আকাশমার্গে সপ্তমতলে গিয়ে আত্মসংযমের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অতঃপর মোগ্গল্লান শ্রেষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে বিব্রত করে 'দানই যে প্রকৃত যজ্ঞ'—এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে জেতবনে শাস্তার কাছে নিয়ে যান। তখন শাস্তা শ্রেষ্ঠীদম্পতির সঙ্গে আনীত পিষ্টক ঋদ্ধিবলে জেতবনে সম্মিলিত সমস্ত ভিক্ষুবর্গকে আহারের জন্য দান করেন। পরিশেষে শ্রেষ্ঠীদম্পতি শাস্তার চরণবন্দনা করে স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধশাসনের উন্নতিকল্পে মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন।

উক্ত মচ্ছরিকোসিয়াই ছিলেন পূর্বজন্মের ইল্লীস। (জাতক, ১ম খণ্ড, ৩৪৫ ইত্যাদি)। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে ইল্লীস খঞ্জ, কুব্জ ও তির্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, অধার্মিক ও বিভিন্ন দোষযুক্ত হয়ে এক অতিশয় কৃপণ শ্রেষ্ঠীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইল্লীসের একমাত্র কার্য ছিল ধনসঞ্চয় করা, এমনকি তিনি নিজেও কোনপ্রকার ভোগ করতেন না। কিন্তু ইল্লীসের পিতা ও পিতামহরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তারা সর্বদা অকাতরে দান করতেন। যাই হোক, একদিন এক জনপদবাসীকে সুরাপান করতে দেখে লোভবশত ইল্লীসের সুরাপান করার ইচ্ছা জাগলে সে নগরের বাইরে এক নদীর অনতিদূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে লুকিয়ে সুরাপান করতে থাকেন যাতে অপরকে ভাগ দিয়ে ধনক্ষয় না হয়।

অন্যদিকে ইল্লীসের পিতা যিনি দানাদি ইত্যাদি কুশলকর্মের দ্বারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের প্রভাববলে ইল্লীসের কৃপণতার কথা জানতে পেরে ইল্লীসকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং পুত্র ইল্লীসের ন্যায় দেহ পরিগ্রহণ করে বারানসীতে এসে ইল্লীসের গৃহে উপস্থিত হন এবং তিনি কৃপণ ইল্লীসের জমানো ধনসম্পত্তি দেশবাসীর কাছে অকাতরে দান করতে শুরু করেন। এতে জনপদবাসীরা প্রকৃত ইল্লীস যে স্থানে বসে মদ্যপান করছিল সেখান দিয়ে যাবার সময়ও ইল্লীসের দানের পুণ্যকর্মের উচ্চস্বরে প্রশংসা করতে থাকলে ইল্লীস তা শুনে রাজার কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে অপর কেউ ইল্লীসের ছদ্মবেশ ধারণ করে উক্ত দানকার্য করছেন।

অতঃপর প্রকৃত ইল্লীস রাজার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে রাজা দ্বন্দ্বে পরে গিয়ে প্রকৃত ইল্লীস কে তা জানার জন্য এক ক্ষৌরকারকে রাজসভায় ডেকে পাঠান। কারণ প্রকৃত ইল্লীসের মস্তকে কেশের মধ্যে এক আঁচিলের অবস্থানের কথা কেবলমাত্র উক্ত ক্ষৌরকারই জানতো। কিন্তু ছদ্মবেশধারী পিতা ইল্লীস তপোবলে ঠিক একই স্থানে পুত্রের ন্যায় একটি আঁচিলের আনয়ন করেন। ফলস্বরূপ ক্ষৌরকারও প্রকৃত ইল্লীসকে সনাক্ত করতে অসমর্থ হন। এতে ইল্লীস ধনশোকে বিহ্বল হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে ইল্লীসরূপধারী পিতা ছদ্মবেশ

ত্যাগ করে নিজের পরিচয় দেন ও পুত্রকে সৎকার্য ও দানধ্যান করবার নির্দেশ দেন। উপরন্তু পুত্রকে দানকার্য না করলে সকল ধন অন্তর্হিত হবে বলে ভীতি প্রদান করেন। ফলে ইল্লীস ভীত হয়ে দানধ্যান ইত্যাদি সৎকর্ম আরম্ভ করেন ও পুন্যকর্মের দ্বারা দেবলোকপ্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত জাতকটিতে কৃপণ ব্যক্তিটি হলেন ইল্লীস, মোগ্গল্লান হলেন দেবরাজ সক্ক (শক্র), আনন্দ হলেন দেশের রাজা ও বোধিসত্ত্ব হলেন ক্ষৌরকার।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইন্দ্রিয় সংবর

এই শব্দটি ইন্দ্রিয় সংবরশীল নমে অভিহিত। ইন্দ্রিয় সংবর শীল—এই শীল চর্চার পূর্বশর্ত হলো মনোসংযম। প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই মনোসংযমী হওয়া যায়। আর তখনই ইন্দ্রিয় সংযমের পথ সুগম হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের বিপথগমনে বাধা প্রদান করে সংযমের মাধ্যমে সৎপথে চিত্তকে পরিচালনা করাই ইন্দ্রিয় সংবরশীল। (দ্রষ্টব্যঃ—মজ্‌ঝিম নিকায় ১ম খণ্ড, পি. টি. এস. লন্ডন, ১৯৪৮, পৃঃ ৩৫৫) ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়। যেমন—রূপায়তনের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত কিছুই দর্শন করে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এই সত্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইন্দ্রিয় সংবর বলতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করাকে বোঝায়। স্মৃতি সাধনার উন্নতি বিধানের শুরুতেই এই কাজ সম্পাদন করা যায়। যদিও চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবর বা অসংবর নেই। চক্ষু প্রসাদকে আশ্রয় করে স্মৃতি বা বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি রূপাবলম্বন চক্ষুর পথে আসে, তা দুবার ভবাঙ্গ উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়ে ক্রিয়া মনোধাতু আবর্জ্জনকৃত্য উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়। তারপর চক্ষুবিজ্ঞান দর্শনকৃত্য, তারপর বিপাক মনোধাতু সম্প্রতীচ্ছন কৃত্য (গ্রহণ কৃত্য) তারপর বিপাক হেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু সন্তীরণকৃত্য তৎপরে মনোবিজ্ঞান ধাতু ব্যবস্থাপন কৃত্য উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়, তদনুন্তর জবন চিত্ত প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করে। তথাপি সময়ে বা আবর্জ্জনাদির অন্যতম সময়ে সংবর বা অসংবর নেই। জবনক্ষণে কিন্তু যদি দুঃশীল বা স্মৃতি বিভ্রম বা অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে অসংবর হয়ে থাকে। যার এইরূপ হয় সে চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বলে কথিত হয়। সুতরাং জবন অবস্থায় চিত্তের সতর্কতা অপরিহার্য। মূলতঃ এই সংবরদ্বার। যখন একে সংযত করা হয় তখন ইন্দ্রিয়সমূহ সুরক্ষিত ও সুসংযত বলা যায়। এটি একটি সুরক্ষিত ও প্রহরারত নগর সদৃশ্য। এই কারণেই চক্ষু সংবরের উপমার সাহায্যে বলা হয়েছে, যখন যোগী দর্শনীয় বস্তু অবলোকন করেন তখন তিনি আবদ্ধভাবে দর্শন করেন না অথবা এর বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক করে দেখেন না। কারণ তাতে লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অপর ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ ভাবে প্রযোজ্য। (দ্রষ্টব্যঃ— মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পি. টি. এস. লন্ডন, ১৯৪৮, পৃঃ ৩৫৫।

প্রাতিমোক্ষ সংবরোস্থিত আর্যশ্রাবকের (ভিক্ষুর) থাকে ষড়ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতা। চক্ষু বিজ্ঞানে স্ত্রীপুরুষাদি রূপে কলুষ উৎপত্তি জনক শুভ নিমিত্ত ও তাদের হস্তপদাদির শোভা,

হাস্য, আলাপ, অবলোকন, বিলোকন প্রভৃতি অনুব্যঞ্জন পরিত্যাগ করে কেশ লোমাদি অশুভভাবে দর্শন করা। চক্ষুইন্দ্রিয়ে অসংযত ব্যবহারে লোভ বা আসক্তি, দৌর্মনস্য এবং অকুশল ধর্ম-সমূহ অনুসরণ করতে পারে মনে করে তাতে সংযত ধারণ করা। তথা শ্রোত্র-বিজ্ঞানে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানে, জিহ্বা-বিজ্ঞানে, কায়-বিজ্ঞানে। মনো-বিজ্ঞানে সংবর প্রাপ্তি ইন্দ্রিয় সংবর-শীল।

[দ্রষ্টব্য : বিশুদ্ধিমার্গ অনুঃ—শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ও গোপালদাস চৌধুরী, কলিকাতা-১৯২৩, পৃঃ ২৮।

মজ্ঝিমনিকায় ১ম খণ্ড, পি. টি. এস. লন্ডন, ১৯৪৮, পৃঃ ১৮০।

বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব—বেরতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৯৮-৯৯।

মহাপরিনিব্বান সুত্তং—শ্রী ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃঃ ১৮৯-১৯০।]

জিনবোধি ভিক্ষু

ইরিয়াপথ—ঈর্যাপথ

স্থিতি, গমন, উপবেশন ও শয়ন এই চারটি অবস্থাকে বলা হয় ঈর্যাপথ বা দেহের বিন্যাস। এই চারি বিন্যাস চিত্তবশে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। "আমি গমন করছি" এই চিত্তোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সঞ্চালন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় যাতে দেহ এক এক ভাবে বিন্যস্ত হয়। পার্থিব প্রাণী মাত্রেই আপনাপন দেহের এই চারি প্রধান বিন্যাস দ্বারা পরিচালিত হয়। যে কোন মানব, যে কোন জীবজন্তু বা পশুপক্ষী গমন, স্থিতি, উপবেশন, ও শয়ন পর্যায়ক্রমে দেহের এই চারি অবস্থায় বিন্যস্ত না হয়ে জীবনধারণ করতে পারে না। এইভাবে সাধক-সাধিকাগণ স্মৃতি প্রস্থান (সতিপট্‌ঠান) অভ্যাস বশতঃ দাঁড়ানো বা স্থিতি কালে দাঁড়িয়েছি বলে তা প্রকৃষ্টরূপে অবহিত থাকেন। গমনকালে গমন করছি বলে তা সম্যকরূপে অবহিত থাকেন। উপবেশনকালে উপবেশন করছি বলে তা সম্যকরূপে অবহিত থাকেন। শয়নকালে শয়ন করছি বলে তা প্রকৃষ্টরূপে অবহিত থাকেন। এইরূপে দেহ যে অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন তা সাধক মাত্রই বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে থাকেন। এরই নাম ইর্যাপথ স্মৃতি।

সাধকগণ এইরূপে নিজে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। কখনো কখনো "সমুদয়" ধর্মানুদর্শী হয়ে অর্থাৎ আমার এই এই "সংস্কার" ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয়েছে বলে, কখনো কখনো "ব্যয়" ধর্মানুদর্শী হয়ে অর্থাৎ আমার এই এই "সংস্কার ধর্ম" সমূহ বিলুপ্ত হয়েছে বলে, আবার কখনো কখনো "উদয়-ব্যয়" ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। "রূপ-কায়" মাত্র আছে, তাঁর এই স্মৃতি জাগরুক রাখতে হয়। তাঁকে অনাসক্ত ভাবে অবস্থান করতে হয় এবং জগতে কিছুতেই তিনি আসক্তি উৎপাদন করেন না। সাধক-সাধিকাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য ঈর্যাপথকে চারিভাবে দেখানো হয়েছে—যথাক্রমে, স্থিত থাকলে, স্থিত আছি বলে জানা-প্রথম ঈর্যাপথ।

গমন করলে গমন করছি বলে জানা-দ্বিতীয় ঈর্যাপথ। উপবিষ্ট বা উপবেশন থাকলে উপবিষ্ট রয়েছি বলে জানা-তৃতীয় ঈর্যাপথ।

শায়িত থাকলে শায়িত রয়েছি বলে মনে জানা—চতুর্থ ঈর্যাপথ।

বলাবাহুল্য, সাধক-সাধিকাদের মধ্যে কারো গমনে বা চক্রমনে বা পায়চারীতে চিত্ত একাগ্র হয়। কারো শয়নে, কারো, স্থিতিতে ও কারো উপবেশনে চিত্ত স্থিত হয়। যারপক্ষে যে পন্থাবলম্বনে সমাধিসুখ আসয় মনে হয়, তাঁর সেই ঈর্যাপথ গ্রহণ করা উচিত।

সুতরাং ঈর্যাপথ-নীতিই সাধনমর্গের একমাত্র সোপান। এর যথাযথ অনুশীলনে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়। ক্লেশাবর্ত হতে মুক্তিকামী সাধক ঈর্যাপথকে আশ্রয় করে "স্মৃতি-প্রস্থান" ভাবনায় নিরত থেকে শান্তিপদ নির্বাণ অভিমুখে গমন করতে সমর্থ হন। তাই দৈহিক ক্রিয়ার বা প্রণালীর উপর সাধকদের স্মৃতি সাধনা করা অত্যাবশ্যক।

[দ্রষ্টব্য : Patisambhidāmagga. Vol. II. London, 1907. p. 225. Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā. Pt. 1. P. T. S. London. 1970. p. 183

বিদর্শন ভাবনা—প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, (ধর্মবিহারী ভিক্ষু), কলিকাতা-১৯৫০, পৃঃ ৯০-৯১।

বিশুদ্ধিমার্গ—অনুঃ—শ্রমণ পুন্নানন্দ স্বামী ও গোপালদাস চৌধুরী, কলকাতা-১৯২৩, পৃঃ ১২০।]

জিনবোধি ভিক্ষু

ইসিগিলি (ঋষিগিরি)

রাজগহের পাঁচটি পর্বতের মধ্যে একটি। এটি রাজগহের একটি মনোরমদর্শনীয় স্থানবিশেষ। (দীঘনিকায় ২য়, ১১৬) পর্বতটির একপার্শ্বে কালসিলা নামে একটি কালপাথর রয়েছে। এস্থানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বারংবার অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিটকে (২য়, ৭৬ ; ৩য়, ৪১) এটি ভিক্ষুদের বসবাসের যথোপযুক্ত স্থান বলে চিহ্নিত। অন্যদিকে, সংযুক্ত নিকায়ে (১ম, ১২১ ; ৩য়, ১২১ ইত্যাদি) উল্লিখিত যে গোধিক ও বক্কলি নামে দু'ব্যক্তি এস্থানে আত্মহত্যা করেছিলেন যারা পরবর্তী জীবনে বুদ্ধের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাছাড় বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মোগ্গল্লান ডাকাতদের হাতে এস্থানেই নিহত হয়েছিলেন। (জাতক, ৫ম, ১২৫ ; ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৩য়, ৬৫)।

মজ্ঝিম নিকায়ের 'চুলদুক্‌খ খণ্ড'তে বলা আছে যে কালসিলাতে বহুসংখ্যক নিগণ্ঠ নাতপুত্তের শিষ্য বসবাস করতেন। তারা নিগণ্ঠের মতানুযায়ী অত্যন্ত কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিলেন এবং দিবারাত্র দণ্ডায়মান থেকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতেন। মজ্ঝিম নিকায়ে আরও বলা আছে যে বুদ্ধ স্বয়ং নিগণ্ঠবাদীদের ঐরূপ কঠোর আচরণ সম্পর্কে নিগণ্ঠশিষ্যদের জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সংযত হবার পরামর্শ দেন ও 'চুলদুক্‌খ খণ্ড' সুত্তটি তাদের দেশনা করেন।

পরবর্তী সময়ে এই সুত্তটিই বুদ্ধ আবার মহানাম নামে এক ব্রাহ্মণকে দেশনা করেন। (মজ্ঝিম নিকায় ১ম, ৯১)।

বুদ্ধ কালসিলাতে অবস্থানকালে গীতের মাধ্যমে রাজগহের প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি শিষ্য আনন্দকে প্রীত হয়ে এই স্থানেই এক কল্প আয়ুকাল প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। যদিও আনন্দ সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। (দীঘ, ৩য়, ১১৬) স্থানটিকে দীঘনিকায়ে ইসিগিল্লিপস্‌স বলেও বর্ণনা করা হয়েছে যেস্থানে বুদ্ধ বহুবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। এস্থানেই বংগীস থের বুদ্ধের শিষ্য মোগ্গল্লানের প্রশংসা করেছিলেন। (সংযুত্ত, ১ম, ১৯৪ থেরগাথা নং ১২৪৯ ইত্যাদি)।

অন্যদিকে এটি পাঁচশত পচ্চেকবুদ্ধের (প্রত্যেক বুদ্ধ) বাসস্থান ছিল। (পপঞ্চসূদনী, ২য়, ৮৮৯) কথিত আছে, ইসিগিলি পর্বতে বসবাস করবার কালে পচ্চেকবুদ্ধগণ একবার পর্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁদের আর কোন অস্তিত্ব থাকতো না। একারণে পর্বতটির নামকরণ করা হয় ইসিগিলি (ইসী গিলতী তি = ইসিগিলি)।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইসিগিলি সুত্ত

মজ্ঝিম নিকায়ের ১১৬ তম সুত্ত। (মজ্ঝিম, ৩য়, ৬৮ ইত্যাদি)। ইসিগিলিতে অবস্থানকালে বুদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে এটি দেশনা করেছিলেন। এ সুত্ত থেকে জানা যায় যে রাজগহের অন্যান্য পর্বতগুলির নাম যথা—বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল ও গিজ্ঝকূট যখন পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় তখন ইসিগিলি পর্বতটি প্রাচীন নামেই প্রসিদ্ধ থাকে। (ঐ) সুত্তটিতে ইসিগিলি নামের উৎপত্তির কারণও বর্ণিত। (দ্রষ্টব্যঃ পূর্বের প্রবন্ধ) যে সকল পচ্চেকবুদ্ধরা এস্থানে বসবাস করতেন তাদের নামের একটি সুন্দর তালিকা এ সুত্তে দেওয়া আছে যেটি সুত্তটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইসিদত্ত

একজন সুপ্রসিদ্ধ স্থবির, অবন্তীরাজ্যের বড্ঢগাম বা বেলুগামের বাসিন্দা। ইনি পত্রবন্ধু চিত্ত গহপতির (যিনি মচ্ছিকাসণ্ডতে বসবাস করতেন) কাছে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হন ও মহাকচ্চায়নের কাছে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়ে অর্হৎপদ লাভ করেন। (থেরগাথা অট্‌ঠকথা, ১ম, ২৩৮)।

থেরগাথাতে (গাথা নং ১২০) বুদ্ধের সঙ্গে ইসিদত্তের কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিপস্‌সী বুদ্ধের সময়কালে ইসিদত্ত একজন গৃহীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিপস্‌সীবুদ্ধকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি একটি সুমিষ্টফল (আমোদ ফল) দান করেন। উক্ত সুকর্মের ফলে তিনি বুদ্ধের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। (থের অট্‌ঠ, ১ম, ২৩৮) সম্ভবতঃ অপদানের অমোদপলিয় থের ও ইসিদত্ত একই ব্যক্তি। (অপদান, ২য়, ৪৪৭)।

সংযুত্ত নিকায়ে বর্ণিত আছে যে ইসিদত্ত একবার মচ্ছিকাসণ্ডের চিত্ত গহপতির আমন্ত্রণে অম্বাটকতে অন্যান্য বয়স্ক ভিক্ষুবর্গের সঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় চিত্ত কিছু বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে বয়স্ক ভিক্ষুরা উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু যুবক ইসিদত্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন। অতঃপর চিত্ত জানতে পারেন যে তাঁর পত্রবন্ধু ইসিদত্ত ও উত্তরপ্রদানকারী ইসিদত্ত একই ব্যক্তি। পরিচয় পেয়ে চিত্ত গহপতি ইসিদত্তকে ঐ স্থানে বসবাসের জন্য অনুরোধ জানান কিন্তু ইসিদত্ত বন্ধনের আশংকায় সেস্থান পরিত্যাগ করে চলে যান এবং সেস্থানে কখনও ফিরে আসেননা। (মনোরথপূরণী ১ম, ২১০)।

পালি ত্রিপিটক সাহিত্যে আরও দুজন ইসিদত্তের নাম পাওয়া যায়। কোশলের রাজা পসেনদির রাজত্বকালে এক ইসিদত্ত থের সকদাগামী হয়েছিলেন (সারত্থপ্পকাসিনী) ও এক সোরেয্যর রাজা অনোমদস্‌সী বুদ্ধের সময়ে ধর্মদেশনার দ্বারা ৮০ হাজার অনুগামী সমেত অর্হত্বপদলাভ করেছিলেন। (মধুরত্থবিলাসিনী পৃঃ ১৪৩-৪৪) অপর আর একজন ইসিদত্ত শ্রীলংকার ব্রাহ্মণতিস্‌সের রাজার সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের পুরোধা বলে বর্ণিত।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names Vol. I. p. 322]

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইসিদাসী

একজন সুপ্রসিদ্ধ থেরী। থেরীসঙ্ঘের প্রধান প্রধান থেরীগণের অন্যতম। (দীপবংস, ১৮ অধ্যায়, গাথা নং ৯)। প্রথম জীবনে ইনি উজ্জেনীর এক ধনাঢ্য বণিককন্যা ছিলেন। যথাসময়ে সাকেতের এক বণিকের পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত বণিকের ক্রোধভাজন হয়ে তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। পরে ইসিদাসীকে উপর্যুপরি দুবার বিবাহ দেওয়া হয়, দুবারই তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হয়ে পুনরায় অসুখী হন। এরপর তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে পিতার সম্মতি নিয়ে থেরী জিনদত্তার কাছে অভিষেক গ্রহণ করে ভিক্ষুনীসঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং সাধনার ঐকান্তিকতায় তিনি অচিরেই সিদ্ধিলাভ করে অর্হৎপ্রাপ্ত হন। (থেরীগাথা, গাথা নং ৪০০-৪৭)

থেরীগাথা অট্‌ঠকথায় (পরমত্থদীপনী পৃঃ ২৬০ ইত্যাদি) উল্লেখ আছে যে ইসিদাসী সহচরী থেরী বোধি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে ইসিদাসী সর্বগুণ ও যৌবনসম্পন্না হয়েও কেন সংসারে বীতরাগ হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। তাতে ইসিদাসী তাঁর পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা মনোরম গাথায় ব্যক্ত করেন। যদিও জানা যায় যে প্রথম তিনটি শ্লোক গাথা সংকলনকারী কর্তৃক সংযোজিত। (দ্রষ্টব্য : মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, কতৃক প্রকাশিত, ১৩৫৭ সাল বাংলা, ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত 'থেরীগাথা' পৃঃ ১৪৯)

ইসিদাসী পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের সময়েও একাগ্রচিত্তে সৎকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ জন্ম বা সপ্তমজন্মের আগে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাঁর পদস্খলন ঘটে। ঐ পাপের ফলে বহুশতবর্ষ নরকভোগ করে পরে একে একে তিনবার ইতরযোনিতে যথা—বানরীর গর্ভে, একচক্ষুবিশিষ্ট হয়ে খঞ্জছাগীর গর্ভে,

গো-ব্যবসায়ীর গাভীর গর্ভে লাক্ষারক্তবর্ণ বৎসরূপে জন্মগ্রহণ করে অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন ব্যভিচারের ফলস্বরূপ। অনন্তর তিনি এক ক্রীতদাসীর গর্ভে নপুংসকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তারপরের জন্মে এক দরিদ্রের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলে এক ধনী বণিকের পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু সপত্নী থাকায় তিনি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি গৌতমবুদ্ধের সময়কালে ইসিদাসীরূপে জন্মগ্রহণ করে সকল অকুশল কর্মের বিনাশসাধন করেন।

Mrs. Rhys Davids বলেছেন যে কাব্যশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে থেরীগাথার ইসিদাসীর গাথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। দ্রষ্টব্য ঃ Psalms of the Sisters, সূচনা পৃঃ ২২।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইসিপতন

ইসিপতন বা মিগদায় (মৃগদাব) বারাণসীর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। স্থানটি উরুবেলা থেকে ১৮ যোজন দূরে অবস্থিত। (জাতক, ১ম, ৬৮) মৃগদাব হল বর্তমান সারনাথ, বেনারসের দুমাইল দূরে যার অবস্থান। এখানে মৃগগণ সুরক্ষিত থাকতো, কেউ তাদের বধ করতে পারত না, তাই মৃগদাব নাম। পুনরায় হিমালয় থেকে আকাশপথে বারাণসীতে আসার সময় পচ্চেক বুদ্ধেরা বা ঋষিগণ এস্থানে অবতারণ করতেন বলে স্থানটির নাম ইসিপতন (ঋষিপতন)। (ইসয় এথ নিপতন্তি উপ্পতন্তি চাতি—ইসিপতনং—পপঞ্চসূদনী, ১ম, ৩৮৭ ; সারত্থপ্পকাসিনী ১ম, ৩৪৭)।

স্থানটির বিশেষত্ব হল এখানে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম ধর্মোপদেশ করেছিলেন এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে। বুদ্ধের যথার্থ জ্ঞানলাভের পর যে ধর্মোপদেশ তা 'ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত' (ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র) নামে খ্যাত। (সংযুত্ত, ৫ম, ৪২০ ইত্যাদি ; বিনয় ১ম, ১০ ইত্যাদি) এই সুত্ততে বৌদ্ধ ধর্মের সারতত্ত্ব বা মূলাংশ দেশনা করা হয়েছে। কথিত আছে, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌতমের সহচর ছিলেন তারা গৌতমকে চূড়ান্ত কঠোর জীবনযাপন থেকে বিরত হতে দেখে তাকে ছেড়ে গিয়ে ইসিপতনে তখন অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ জ্ঞানলাভের পর উক্ত পাঁচজন বা পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীদের কাছেই সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন। পুনরায় উল্লেখ্য যে এস্থানেই বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুত্বজীবনের প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেন। (মধুরত্থবিলাসিনী পৃঃ ৩) সুতরাং এস্থানটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র।

শুধুমাত্র প্রথম ধর্মপ্রচারই নয়, বুদ্ধের জীবনের বহু উল্লেখ্য ঘটনা ইসিপতনেই সংঘটিত হয়। যেমন—এখানেই সুবিখ্যাত যশথের বুদ্ধের শরণাগামী হন, বুদ্ধ এখানে কতগুলি নতুন বিষয়ের নিয়ম প্রচলন করেন ইত্যাদি। (DPN Vol. I p. 324) বুদ্ধ এখানে অন্যান্য সুত্তও দেশনা করেন। (ঐ)

এখানে দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য ভিক্ষুদের বসবাসের কথাও জানা যায়। মহাবংসে বলা আছে যে অনুরাধপুরে মহাস্তুপ তৈরী করার অনুষ্ঠানে ইসিপতন থেকে থের ধম্মসেনের নেতৃত্বে বার হাজার ভিক্ষু অনুরাধাপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। (মহাবংস, ২৯ অধ্যায়, ৩১)

পুনরায়, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় ইসিপতন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণে ইসিপতনে বুদ্ধমূর্তিসহ একখানি বিহারের বর্ণনা আছে। সম্রাট অশোকের তৈরী একটি স্তূপেরও বিবরণ আছে। (দ্রষ্টব্যঃ—অশোকের শিলালিপি নং ৮ ; দিব্যাবদান পৃঃ ৩৮৯-৯৪) তাছাড়া উপরোক্ত চীনা বিবরণে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মেত্তিয়ের (মৈত্রেয়) উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি মন্দিরেরও উল্লেখ আছে। এস্থলেই মেত্তেয় যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হবেন সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

ইসিপতন প্রাচীনকালে আরও বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। (দ্রষ্টব্য ঃ DPPN Vol. I p. 325)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উক্কট্‌ঠা

হিমালয় সন্নিকটস্থ কোশলরাজ্যের একটি শহর। কোশলরাজ পসেনদি মহাপ্রতাপশালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পোক্‌খরসাতীকে শহরটি সম্পূর্ণ কর্জমুক্তভাবে দান করেন। দীঘনিকায়ের (১ম খণ্ড, ৮৭) বর্ণানুযায়ী স্থানটি শস্যশ্যামলা ঘনলোকবসতিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে বুদ্ধ যখন স্থানীয় ইচ্ছানঙ্গল অরণ্যে বসবাস করছিলেন তখন পোক্‌খরসাতী বুদ্ধের প্রজ্ঞা ও বেদবত্তার পরিচয় জানবার জন্য তার শিষ্য অম্বট্‌ঠকে বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে বুদ্ধের অনুগামী হন। (দ্রষ্টব্য ঃ দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠ সুত্ত)।

সেতব্যা নামক স্থান থেকে উক্কট্‌ঠা হয়ে বেসালি পর্যন্ত একটি রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যে। (পরমত্থদীপনী পৃঃ ২২৯ ; জাতক, ২য়, ২৫৯) মজ্ঝিমনিকায়ের মূলপরিয়ায় সুত্তে উক্কট্‌ঠার 'সুভগবন' নামে এক স্থানের কথা বলা আছে। (মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ১) প্রভূতশালী ব্রাহ্মণ অংগনিক-ভারদ্বাজও উক্কট্‌ঠার বাসিন্দা ছিলেন। (পরমত্থ-দীপনী পৃঃ ৩৩৯)।

বুদ্ধঘোষের মতে উল্কা (উক্কা) বা আলোর যোগহেতু উক্ত স্থানের নামকরণ করা হয়েছে উক্কট্‌ঠা। (পপঞ্চসূদনী, ১ম, পৃঃ ৯ ; মনোরথপূরণী, ২য়, ৫০৪)।

দিব্যাবদানে (পৃঃ ৬২১) স্থানটিকে বর্ণনা করা হয়েছে 'উৎকতা' নামে।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উক্কলা (বা ওক্কলা)

বর্তমান উড়িষ্যা বা উৎকল। উক্কলাদেশ হতে আগত তপস্‌সু (ত্রপুষ) ও ভল্লিক (ভল্লুক) নামে দুজন বণিক হল ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রথম গৃহী উপাসক। কথিত আছে, তপস্‌সু এবং ভল্লিক যখন উক্কলা থেকে মজ্ঝিমদেশে যাচ্ছিলেন, তখন একজন দেবতা তাদের বুদ্ধের সন্ধান দেন। (বিনয় পিটক, ১ম, ৪) বুদ্ধ তখন উরুবেলার নিকটবর্তী রাজায়তনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বণিকদ্বয় বুদ্ধকে প্রথম ভোজ্যদ্রব্য দান করেন। (ঐ)

পরমথদীপনীতে (১ম খণ্ড, ৪৮) পোক্করবতী নামে উক্কলার এক শহরের নামোল্লেখ আছে। উক্কলার অধিবাসীরা পালি সাহিত্যে 'অহেতুবাদা', 'অকিরিয়বাদা' ও 'নত্থিকবাদা' নামে পরিচিত, যারা কর্মফল এবং বাস্তবতাবিরোধী ছিলেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, ৩১ ; সংযুত্ত, ৩য়, ৭২ ; মজ্ঝিম, ৩য়, ৭৮ ; কথাবত্থু, পৃঃ ৬০ ইত্যাদি)।

মহাবস্তু অবদান (৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০৩) নামে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বলা আছে যে উক্কলা উত্তরাপথে অবস্থিত ছিল এবং তপস্‌সু এবং ভল্লিক 'অধিষ্ঠান' নামক স্থান থেকে বুদ্ধকে দর্শন করতে এসেছিলেন।

হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের উপজাতির তালিকায় উক্কলবাসীদের নামোল্লেখ আছে। (ভীষ্মপর্ব, নবম অধ্যায়, ৩৬৫)।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উক্কচেলা

বা উক্কাবেলা। বেসালির নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রাম। (উদান অট্‌ঠকথা পৃঃ ৩২২) এটি রাজগৃহ থেকে বেসালি যাবার পথে অবস্থিত ছিল। সংযুত্ত নিকায়ে (৪র্থ, ২৬১-২) বর্ণিত আছে যে সারিপুত্তের সঙ্গে এক পরিব্রাজকের উক্কবেলাতে নির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ স্বয়ং বেসালি যাবার পথে উক্কবেলাতে এসেছিলেন এবং সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। এস্থানেই সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের জীবনাবসানে বৌদ্ধ সংঘের ক্ষতির কথা উত্থাপন করেছিলেন। (ঐ)

বুদ্ধ ঘোষের মজ্ঝিমনিকায় অট্‌ঠকথাতে (পপঞ্চসূদনী, ১ম খণ্ড, ৪৪৭) উক্কবেলা নামকরণের বিবরণ রয়েছে। মজ্ঝিমনিকায়ের চূলগোপালক সুত্তও উচ্চচেলাতেই দেশনা করা হয়। (১ম খণ্ড, ২২৫)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উক্কেখপকটবচ্ছ থের

ইনি বচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। কোশলের এক গ্রামে ইনি বসবাস করতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের বহুপূর্ব থেকেই ইনি বিভিন্ন ভিক্ষুদের কাছে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতেন। অতঃপর সারিপুত্তের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে ত্রিপিটকের বিভাগগুলো তিনি অনুধাবন করেন। উক্ত আছে যে ইনি প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বানের পূর্বেই ত্রিপিটকে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন (Psalms of the Brethren p. 66. n. 1) এবং ধর্মের অন্যতম শিক্ষাদাতাও হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি অর্হৎ হন।

পরমত্থদীপনীতে (১ম, ১৪৯) বলা আছে যে ইনি সমগ্র ত্রিপিটকসাহিত্য ক্রমানুসারে অবলীলাক্রমে উৎক্ষেপন করতে পারতেন, তাই 'উক্কেখপকট'।

অপদান অনুসারে পূর্বাপূর্ব জন্মে ইনি রাজা যসোধর (যশোধর) ও উদেনরূপেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ অপদানের একথম্ভিক থের ও উক্কেখপকট থের একই ব্যক্তি।

মণিকুন্তলা হালদারর (দে)

উক্কেখপনীয় কম্ম

উৎক্ষেপনীয় কর্ম। কোন গুরুতর কর্মের জন্য অপরাধী ভিক্ষুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার যে আদেশ ভিক্ষুসঙ্ঘ দিয়ে থাকেন তাকেই বলে উক্কেখপনীয় কম্ম। দ্রঃ-বিনয় ১ম খণ্ড (P.T.S) পৃঃ ৪৯, ৫৩, ৯৮, ১৪৩, ১৬৮।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

উচ্ছংগ জাতক (উৎসঙ্গ জাতক)

এই জাতকটি বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে এক জনপদবাসী রমণীর উদ্দেশ্যে বিবৃত করেছিলেন। একবার রমনীটির স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা—এই তিনজন মিথ্যাপবাদে রাজা কর্তৃক ধৃত হলে রমণীটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনজনকেই মুক্ত করেন। এতে ভিক্ষুসংঘ রমণীর গুণকীর্তন করলে বুদ্ধ বলেন যে উক্ত রমণী অতীতকালেও অর্থাৎ পূর্বজন্মে স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতাকে একই উপায়ে মিথ্যারাজরোষ থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে কয়েকজন তস্কর পথিকদের যথাসর্বস্ব হরণ করে নিয়ে যায়। অতঃপর পথিকেরা পিছু ধাওয়া করলে তস্কররা বনের ধারে এক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর পথিকরা ক্ষেত্রে কর্ষণরত তিনজন ব্যক্তিকেই তস্কর মনে করে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যায়। রাজা তিনজনকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে রমণীটি রাজার নিকটে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে নিজের জন্য আচ্ছাদন প্রার্থনা করে। তখন রাজা রমণীকে বস্ত্রাচ্ছাদন দিলে রমণী তা প্রত্যাখ্যান করে বলে যে স্বামীই স্ত্রীদের প্রকৃত আচ্ছাদন এবং ধৃত তিনজন ব্যক্তি যে তারই আত্মীয় তাও তিনি নিবেদন করেন। তখন রাজা রমণীর বক্তব্য অনুধাবন করে যে কোন একজনকে মুক্তি দিতে চান। রমণীটি কিন্তু ভ্রাতার মুক্তিই প্রার্থনা করলে রাজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন স্বামীপুত্রের মুক্তি প্রার্থনা না করে কেন রমণীটি ভ্রাতাকে মুক্ত করতে চাইছে। তখন কারণ হিসেবে নারীটি বিবৃত করে যে স্বামী বা পুত্র যে কেউ পুনর্বিবাহের দ্বারা লাভ করতে সক্ষম কিন্তু ভ্রাতার পুনর্প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। অনন্তর বোধিসত্ত্বরূপী রাজা তিনজনকেই মুক্তি দেন। (জাতক নং ৬৭, ১ম খণ্ড)।

এস্থলে উল্লেখ্য যে বিধবাবিবাহ প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উচ্ছিট্‌ঠভত্ত জাতক (উচ্ছিষ্টভক্ত জাতক)

এই জাতকটিতে এক ভিক্ষু তার গৃহস্থাশ্রমের স্ত্রীর বিরহে কাতর হলে বুদ্ধ ভিক্ষুকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিভাবে সঠিক মার্গে স্থাপন করেছিলেন তাই বিবৃত রয়েছে। ভিক্ষুপত্নী পূর্বজন্মে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে কিরকম অনর্থকারী হয়েছিল বুদ্ধ তা

বর্ণনা করে বলেন যে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব একবার দীনদরিদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন। একবার কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা করতে গেলে তিনি সেস্থানে এক ব্রাহ্মণ পত্নীর কুকর্মের সাক্ষী হয়ে যান। ব্রাহ্মণপত্নী স্বামী গৃহ থেকে নির্গত হলে এক প্রণয়ীকে গৃহে আহ্বান করে আমোদ প্রমোদের দ্বারা কাল অতিবাহিত করে প্রণয়ীকে স্বহস্তে পাক করা খাদ্য পরিবেশন করেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ ফিরে এলে ব্রাহ্মণী প্রণয়ীকে ভাণ্ডারগৃহে লুকিয়ে রেখে উচ্ছিষ্ট অন্নের সঙ্গে তাজা অন্য মিশ্রণ করে ব্রাহ্মণকে খেতে দেন। ব্রাহ্মণ অন্ন গ্রহণ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে সমস্ত অন্ন তাজা নয়, মিশ্রণ আছে। বারংবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ব্রাহ্মণী কোন উত্তর দিতে পারেন না। তখন বোধিসত্ত্বরূপী ভিক্ষু দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে যা অবলোকন করেছেন ব্রাহ্মণকে তা যথাযথভাবে নিবেদন করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ উভয়কেই প্রহারের দ্বারা উচিত শাস্তিদান করেন। (জাতক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭)।

অতঃপর শাস্তা দুঃশীলা পত্নীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করলে সেই ভিক্ষু অচিরেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন।

বুদ্ধ বিবৃত করেন যে অতীতজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন পত্নীর বিরহকাতর ভিক্ষু, ব্রাহ্মণী ছিলেন অনর্থকারী ব্রাহ্মণপত্নী এবং দীনদরিদ্র ভিক্ষুক ছিলেন বোধিসত্ত্বরূপী বুদ্ধ।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উচ্ছুবিমান

বিমানবত্থুর এক আখ্যান, অন্য নাম উচ্ছুদায়িকবিমান। আখ্যানটিতে এক ধার্মিক রমণীর কাহিনী বিবৃত। ইনি রাজগহের এক ধর্মপরায়ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, কন্যাটি সর্বদা তার প্রাপ্ত জিনিষের অর্ধেক সাধু ব্যক্তিদিগকে দান করত। যথাসময়ে কন্যাটির এমন এক পরিবারে বিবাহ হয় যেখানে ধর্মাচরণ ছিল না।

একদিন উক্ত রমণী বুদ্ধশিষ্য মোগ্গল্লানকে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে দেখে মোগ্গল্লানকে স্বগৃহে আহ্বান করেন এবং নিজের শাশুড়ীমাতার জন্য রক্ষিত এক ইক্ষুদণ্ড দান করেন। এতে শাশুড়ীমাতা অত্যন্ত রুষ্ট হন ও বধূটিকে প্রহার করলে কন্যাটির জীবনাবসান ঘটে। অতঃপর কন্যাটি মোগ্গল্লানকে ভোজ্য দ্রব্য দান করার সুফলহেতু তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাবতিংস স্বর্গে কন্যাটির বাসস্থান উচ্চবিমান বা উচ্চুদায়িকবিমান নামে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করে। (বিমানবত্থু পৃঃ ৪৪ ; বিমানবত্থু অট্ঠকথা পৃঃ ২০৩) উপোরক্ত নামে বিমানবত্থুতে অপর একটি কাহিনীও পাওয়া যায়। (PPN Vol. I p. 342)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উচ্ছেদবাদ

উচ্ছেদবাদ অর্থ আত্মার উচ্ছেদ বা বিনাশ বিশ্বাস।

পালি দীঘনিকায়ের প্রথম সূত্র 'ব্রহ্মজালসুত্তে' বুদ্ধের সময় প্রচলিত যে বাষট্টি প্রকার ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে 'উচ্ছেদবাদ' সেগুলির মধ্যে একটি। এই মতবাদের

অনুরাগীরা মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশে বিশ্বাসী। এই মতবাদের প্রচারক অজিত কেশকম্বলী। তাঁর মতে মাটি, জল, বায়ু, আগুন ও আকাশ এই পাঁচ বস্তুর সংযোগে সত্ত্বের গঠন। মৃত্যুর পর মাটি, জল, বায়ু ও আগুন চতুর্মহাভূতের সঙ্গে মিশে যায় আর ইন্দ্রিয় মিশে যায় বায়ুতে। যারা উচ্ছেদবাদী তারা সাতটি কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ বা বিনাশ ঘোষণা করেন। যথা :—

(১) প্রথম প্রকারের উচ্ছেদবাদে আত্মরূপী, চাতুর্মহাভূতিক, মাতা পিতা থেকে সম্ভূত। মৃত্যুর পর এর বিনাশ হয়, এর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের উচ্ছেদবাদে দিব্য, রূপী, কামাবচর, কবলিঙ্কার (শরীরের পুষ্টসাধক) আহারভোজী আত্মার মৃত্যুর পর বিনাশ হয়।

(৩) তৃতীয় প্রকার উচ্ছেদবাদে দিব্য, রূপী, মনোময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত এবং অহীনেন্দ্রিয় আত্মার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

(৪) চতুর্থ প্রকার উচ্ছেদবাদে রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করে, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হয়ে 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সঙ্গে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমনকারী আত্মার সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

(৫) পঞ্চমপ্রকার উচ্ছেদবাদে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে' সর্বতোভাবে অতিক্রম করে 'কিছুই নেই' এই অনুভূতির সঙ্গে 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমনকারী আত্মার বিনাশ হয়।

(৬) ষষ্ঠ প্রকার উচ্ছেদবাদে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করে 'কিছুই নেই' এই অনুভূতির সঙ্গে 'অকিঞ্চন-আয়তন' স্তরে গমনকারী আত্মা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

(৭) সপ্তম প্রকার উচ্ছেদবাদে 'অকিঞ্চন আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করে শান্ত ও প্রণীত 'নৈব-সংজ্ঞায়তন' স্তরে গমনকারী আত্মা মৃত্যুর পর বিনষ্ট হয়।

যে সব শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উচ্ছেদবাদী, তাঁরা সকলেই এই মতবাদ পোষণ করেন যে এই সাতটি কারণ অথবা এদের মধ্যে এক কিংম্বা অপর কারণে আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মরনান্তে এর কোন অস্তিত্ব থাকে না, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

[দ্রষ্টব্য : দীঘনিকায়—ব্রহ্মজালসুত্ত]

শুভ্রা বড়ুয়া

উজ্জয় থের

রাজগহের সোত্থিয়ব্রাহ্মণপুত্র উজ্জয় একজন ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পরবর্তীসময়কালে বেদশাস্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কে মনে অসন্তোষ জন্মালে ইনি বেণুবনে বুদ্ধের নিকটে গিয়ে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। পরে ইনি সংঘে প্রবেশের দ্বারা এবং বিশেষ ধ্যান সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে একাকী অরণ্যে বসবাস করতে থাকেন ও অর্হৎপদ লাভ করেন।

কথিত আছে, পূর্ববর্তীজীবনে ইনি বুদ্ধকে এক কর্ণিকার ফুল দান করেছিলেন। (থেরগাথা গাথা নং ৬৭ ; পরমত্থদীপনী ১ম খণ্ড, ১১৮) ইনি বহু কল্প আগে 'অরুণকাল' নামে এক নৃপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ঐ) অপদানে বর্ণিত কনিকারপুপ্ফিয় ও উজ্জয় থের একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। (অপদান ১ম, ২০৩)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উজ্জেনী

প্রাচীন ভারতবর্ষের অবন্তীরাজ্যের রাজধানী, বর্তমান নাম উজ্জয়িনী। গৌতম বুদ্ধের সময়ে উজ্জেনীর রাজা ছিলেন চণ্ডপজ্জোত যাঁর সঙ্গে মগধের রাজা বিম্বিসারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

উজ্জেনী থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিশেষ একটি বাণিজ্যপথ ছিল যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও হয়েছিল। সোণকোটিকন্ন (পরে যিনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে অর্হৎ হয়েছিল) তাঁর ব্যবসা-পণ্যাদি নিয়ে যখন উজ্জেনী যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একটি প্রেত তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন।

ঋষি বাবরীর শিষ্যরাও বুদ্ধ-সন্দর্শনে যাবার সময় উজ্জেনী হয়েই গিয়েছিলেন। উজ্জেনী থের মহাকচ্চায়ন, ইসিদাসী, অভয় এবং অভয়মাতা গণিকা পদ্মাবতীর জন্মস্থান।

সম্রাট অশোক রাজা হওয়ায় পূর্বে বহুকাল উজ্জেনীর রাজ্যপাল ছিলেন। এখানেই তাঁর ছেলে মহিন্দ এবং কন্যা সংঘমিত্রার জন্ম হয়। মহিন্দ শ্রীলংকা যাওয়ার পূর্বে ছয় মাস উজ্জেনীর দক্ষিণাগিরি-বিহারে অবস্থান করেছিলেন।

যখন শ্রীলংকায় অনুরাধপুরে মহাথূপের (থূপারাম) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তখন উজ্জেনী থেকে থের মহাসংঘরক্খিতের নেতৃত্বে ৪০ হাজার ভিক্ষু যোগদান করেছিলেন।

জাতক থেকে জানা যায় যে উজ্জেনী বহু প্রাচীন কাল থেকেই অবন্তীরাজ্যের রাজধানী ছিল। কিন্তু পালি দীঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত থেকে জানা যায় যে মহিস্সতী ছিল অবন্তীর রাজধানী। সম্ভবতঃ মাহিস্সতীর প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার পরে উজ্জেনীকেই রাজধানী করা হয়েছিল।

Ref : DPPN, ১ম, ৩৪৪-৩৪৫ ; বিনয় ১ম, ২৭৬ ; ধম্মপদ-অট্ঠকথা, ১ম, ১৯২ ; জাতক, ২য়, ২৪৮-২৫০, ৪র্থ, ৩৯১ ; উদান-অট্ঠকথা, ৩০৭ ; সুত্তনিপাত, পারায়ণবগ্গ ; মহাবংস, ১৩শ, ৫-১১ ; ২৯শ, ৩৫ ; মহাবোধিবংস ৯৯।

সুকোমল চৌধুরী

উট্ঠান সুত্ত

ইহা সুত্তনিপাতের অন্তর্গত একটি সূত্র (নং ২২)। একবার বুদ্ধ মিগারমাতা বিশাখার প্রাসাদের উপরিভাগে অবস্থান করেছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রসাদের নীচে নবপ্রব্রজিত ভিক্ষুদের সোরগোল হৈ-চৈ শুনতে পেলেন এবং স্থবির মোগ্গল্লানকে ডেকে বলেন ঋদ্ধি প্রদর্শন করে

তাদের ভীতিপ্রদর্শন করতে। মোগ্গল্লানের ঋদ্ধির প্রভাবে সমগ্র প্রাসাদ এমনই দুলতে লাগল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভয় পেয়ে ঐ ভিক্ষুরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হলে বুদ্ধ তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন হেলায় সময় নষ্ট না করে বীর্যবত্তা সহকারে সাধনায় নিমগ্ন হতে। ঐ ভিক্ষুরা বুদ্ধের উপদেশে তাই করেছিলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

সুকোমল চৌধুরী

উড্ডিয়ান (বা ওড্ডিয়ান)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে শব্দটি পরিচিত ছিল, যেমন—সুবাস্তু, উদ্যান, উড্ডিয়ান বা ওড্ডিয়ান ইত্যাদি। গ্রীক বিবরণ অনুযায়ী অশ্মক রাজ্য (অস্সকেনস) ওড্ডিয়ান উপজাতি অধ্যুষিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় বলা আছে যে অশ্মকরাজ্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। (হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীকৃত 'Political History of Ancient India p. 217) পুনরায়, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণে উড্ডিয়ান বা ওড্ডিয়ান হল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে ফা-হিয়েন যখন ভারতবর্ষ পর্যটনে আসেন, তখন স্থানটিতে বৌদ্ধধর্ম প্রভূত বিস্তারলাভ করেছিল। (P.V. Bapat ed. 2500 years of Buddhism p. 65) পরবর্তী চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণেও উড্ডিয়ানের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বিবৃত করেছেন যে উড্ডিয়ান বা উদ্যান এক পার্বত্যময় দেশ ছিল এবং এস্থানে গন্ধাররাজ্য অপেক্ষা বেশিসংখ্যক হুণ আক্রমণ সংঘটিত হয়। তিনি আরও বলেছেন যে পূর্বে এস্থানে ১,৪০০টি বিহারে ১৮,০০০ ভিক্ষু বসবাস করত। কিন্তু হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায় ও ধর্ম দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে মহাযান থেকে সৃষ্টি তন্ত্রযানই প্রাধান্য পায়। (ঐ পৃঃ ২৬৮) আবার খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ঔ-কোন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন উড্ডিয়ান বৌদ্ধশিক্ষাদীক্ষার এক অন্যতম কেন্দ্র ছিল। (B.N. Chowdhury 'Buddhist Centres in Ancient India' p. 136)

পরবর্তীকালে, ষোড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা তারনাথের তান্ত্রিক গুরু বুদ্ধগুপ্তও উড্ডিয়ানকে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থান বলে অভিহিত করেছেন। (ঐ)

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

উতু সমুট্ঠান (ঋতু সমুত্থান) অর্থাৎ ঋতু থেকে উৎপন্ন

কর্ম, চিত্ত, ঋতু, আহার—এই চার বিষয় আমাদের দেহের পক্ষে হেতু প্রত্যয়। এরা প্রতি মুহূর্তে এইরূপে কায়ের অবস্থান্তর ঘটাচ্ছে। রূপের এই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনকেই রূপ সমুট্ঠান বলে। এর মধ্যে কম্ম, চিত্ত ও আহার সমুট্ঠান শুধু জীব দেহেই রূপের অবস্থান্তর ঘটায়। কিন্তু ঋতু বা উতু সমুট্ঠান কিন্তু জীব দেহে এবং দেহ ছাড়া অন্যান্য বাহ্যিক রূপেরও অবস্থার পরিবর্তন করে। শীত ও উষ্ণ নামধারী তেজ ধাতু যখন স্থিতিক্ষণ প্রাপ্ত হয় তখনই অবস্থা অনুসারে দেহস্থ বা বাহ্যিক ঋতু সমুত্থানরূপ উৎপন্ন করে। আকাশের নীলিমা, ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্য, সমুদ্রের উচ্ছলতা, দূর্বাদলের শ্যামলতা ইত্যাদি সবই ঋতু সমুত্থান রূপ।

উতুসমুট্‌ঠান রূপ—(১৩টি)

(১) শুদ্ধাষ্টক বা অবিনিভাজ্যরূপ (৮টি)—প্রত্যেক জড় পদার্থে ৪টি মহাভূত অর্থাৎ পঠবী, আপ, তেজ, বায়ু এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ ; এই ৮টি গুণ অবিনিভাজ্যভাবে বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য এই ৮টি গুণের সাধারণ নাম 'অবিনিভাজ্য রূপ।'

পৃথিবী বা পঠবী ধাতু—স্থানাবরোধকতা বা বিস্তৃতি জুড়ে একটি মৌলিক গুণ। এর লক্ষণ বা অবস্থা কঠিনত্ব, ঘনত্ব ও কর্কশ স্বভাব। অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে কোমলত্ব-নমনীয়ত্বভাবও ধারণ করে। জড়ের এই বিস্তৃতি ও কঠিনতা কোমলতা গুণের পরিভাষা 'পৃথিবী ধাতু'। জড়ের এই বিস্তৃতি গুণকে 'ধাতু' বলা হয়েছে, কারণ সর্বাবস্থায় জড় তার এই বিশিষ্ট গুণ বা স্বভাব ধারণ করে।

অপ ধাতু—জলীয় ধাতু। জড়ের আর একটি মৌলিক গুণ 'সংসক্তি'। এই গুণ জড় বস্তুকে সংযোগ, বর্ধন, ঘন, তরল ও ক্ষরিত করে। আপ অর্থ বন্ধন। এই আপ ধাতু বা সংসক্তি জলে, লোহার টুকরো প্রভৃতি সবকিছুতেই বিদ্যমান।

তেজোধাতু—জড়ের আর একটি মৌলিক গুণ 'তাপ'। ঠাণ্ডা, গরম প্রভৃতি অবস্থারই পরিভাষা 'তেজ ধাতু'। উষ্ণতেজ বলতে তাপ, সূর্যকিরণ প্রভৃতি বোঝায়। শৈততেজ বলতে বরফ, কুয়াশা মেঘ প্রভৃতি বোঝায়।

বায়ু ধাতু—জড়ের চতুর্থ মৌলিক গুণ 'গতিশীলতা' এবং এর পরিভাষা 'বায়ু ধাতু' জড় পদার্থের এই চারটি গুণ পরস্পর আশ্রিত, সহজাত ও সম্বন্ধযুক্ত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযোগের মাত্রাধিকতানুসারে জড়ের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন আকার। জড়ের এই চারটি শক্তির মিলিত নাম 'মহাভূত রূপ', কারণ এই চারটি থেকেই জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে।

(২) শব্দ (১টি)

(৩) পরিচ্ছেদ রূপ বা আকাশ ধাতু (১টি) সচ্ছিদ্রতাই আকাশ ধাতু। পদার্থ যতই অণু-পরমাণু বিশিষ্ট হোক, যতই নিরেট হোক, কিন্তু তা আকাশ ধাতু অর্থাৎ ছিদ্র বর্জিত হতে পারে না। এই গুণ আছে বলে পদার্থকে ভাঙ্গা যায়।

(৪) বিকার রূপ (৩টি) যে সব রূপ উৎপন্ন অবস্থায় আছে, তাদের বিশেষ অবস্থায় নাম 'বিকার'। এটি ৩ প্রকার—লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা। জড় পদার্থের হালকা ভাবেই 'লঘুতা'। কায়-ক্রিয়ায় বিরোধিতা না করে ইচ্ছার অনুরূপ সঞ্চালনশীলতাই 'মৃদুতা'। শারীরিক ক্রিয়ার অনুকূল অবস্থাপন্নতা, কর্মোপযোগিতাই 'কর্মন্যতা'।

[দ্রষ্টব্য : অভিধম্মত্থসংগহ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উত্তমা থেরী[১]

শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠিকুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। থেরী পটাচারার, নিকট ধর্মোপদেশ শুনে তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

'অপদান' অনুসারে তিনি শত বৎসর বয়সে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং এক পক্ষকালের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

বিপশ্যি বুদ্ধের সময় তিনি বন্ধুমতী নগরে একটি গৃহে দাসীবৃত্তি করতেন। বিপশ্যী বুদ্ধের পিতা রাজা বন্ধুমা উপোসেথ পালন করতেন। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভিক্ষা দান করতেন এবং তাঁদের উপদেশ শ্রবণ করতেন। উত্তমাও এইভাবে উপোসথাদি সম্যকভাবে পালন করে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৪ বার দেবলোকে দেবরাজের প্রধানা মহিষী হয়েছিলেন এবং ৬৩ বার চক্রবর্তীর কৃপায় মহিষী হয়েছিলেন। অপদানের অকৃপসথিকা এবং উত্তমা থেরী একই বলে মনে হয়।

Ref. থেরীগাথা শ্লোক ৪২-৪৪

সুকোমল চৌধুরী

উত্তমা থেরী[২]

কোশলের এক ব্রাহ্মণগৃহে তাঁর জন্ম। একদিন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বলাভ করেন। তিনিও বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে বসুমতী নগরে একটি গৃহে দাসীবৃত্তি করতেন। একদিন তিনি জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখে শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁকে পিঠে দান করেছিলেন। অপদানে বর্ণিত মোদকদায়িকাই উত্তমা থেরী বলে মনে হয়।

Ref. থেরীগাথা, শ্লোক ৪৫-৪৭

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরকুরু

যে চারিটি মহাদ্বীপ নিয়ে পৃথিবী গঠিত তার মধ্যে উত্তরদিকের মহাদ্বীপের নাম উত্তরকুরু। ইহার দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য (পালি এবং সংস্কৃত) এবং পুরাণে উত্তরকুরুর নাম পাওয়া যায়।

দীঘনিকায়ের আটানাটিয়সুত্তে (সুত্ত নং ৩২) উত্তরকুরু সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে। উত্তরকুরু স্বতোজাত শস্যসমৃদ্ধ, চাষবাদের প্রয়োজনীয়তা নেই, সুগন্ধি শালিধানের চাল সবসময় পাওয়া যায়। এই দ্বীপের অধিপতির নাম কুবের, তাঁকে বৈশ্রবণও বলা হয়।

উত্তরকুরু সহ কয়টি দ্বীপ নিয়ে এই মহাপৃথিবী যার মধ্যস্থলে আছে মেরু পর্বত। চক্রবর্তী রাজা এই চতুর্দ্বীপসমন্বিত পৃথিবীকে শাসন করেন। তাঁর প্রধান মহিষী হন মদ্ররাজার বংশোদ্ভূতা অথবা উত্তরকুরুবাসিনী।

চারটি বিষয়ে উত্তরকুরুবাসীরা তাবতিংস দেবালোকের দেবতাদেরও ছাড়িয়ে যান—(১) তাঁরা নির্লোভ (অমমা) (২) ব্যক্তিগত ধনসম্পদ কারও নেই (অপরিগ্গহা), (৩) নির্দিষ্ট আয়ুসম্পন্ন (নিয়তায়ুক) এবং (৪) সৌষ্ঠবপূর্ণ। তাঁরা অবশ্য সাহসিকতা, স্মৃতি এবং ধর্মীয়জীবন যাপনের ক্ষেত্রে জম্বুদ্বীপবাসী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর।

গৌতম বুদ্ধ কয়েকবার উত্তরকুরুতে ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি উত্তরকুরুতে ভিক্ষা করে হিমালয়ের অনবতপ্ত হ্রদে স্নান করতেন এবং ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে ঐ হ্রদেরই তীরে দিবাবিহার করতেন। বলা হয় যে, বিশেষ ঋদ্ধি না থাকলে উত্তরকুরুতে যাওয়া যায়না। কিন্তু বুদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ এবং অনেক ঋদ্ধিমান তপস্বী উত্তরকুরুতে গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন।

উত্তরকুরুতে এখনও খাদ্যের অভাব হয় না। একবার বেরঞ্জাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বুদ্ধ এবং ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা দুর্লভ হয়। তখন ঋদ্ধিমান মোগ্গল্লান উত্তরকুরুতে সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরকুরুর অধিবাসীদের পরিধেয় বস্ত্র দিব্যবস্ত্রসদৃশ।

রাজগৃহের ধনবান শ্রেষ্ঠী জ্যোতিকের জন্য দেবতারা উত্তরকুরু থেকে একটি স্ত্রীরত্ন আনয়ন করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল সতুলকায়ী। সতুলকায়ী উত্তরকুরু থেকে আসার সময় ছোট একটি পাত্রে সামান্য ধান এবং তিনটি স্ফটিকদণ্ড নিয়ে এসেছিলেন। সেই চালের পাত্র কখনই শূন্য হোত না। যতই খরচ করা হোক না কেন। আর রান্না করার জন্য কোন আগুনের প্রয়োজন হোত না। অন্ন বা ব্যঞ্জন রান্না করার সময় পাত্রটি ঐ তিনটি স্ফটিকদণ্ডের উপর বসিয়ে দেওয়া হোত। নিমেষে রান্না হয়ে যেত এবং রান্না হয়ে গেলে স্ফটিকদণ্ড আবার নিস্তেজ হয়ে যেত।

শেষজীবনে জ্যোতিক ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। আর তিনি অর্হৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত ধনদৌলত অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁর ভার্যা সতুলকায়ীও উত্তরকুরুতে ফিরে যান।

ঋগ্বেদে বর্ণিত কুরুদেশ উত্তরকুরু বলে অনেকে মনে করেন।

Ref. DPPN. T ১ম, ৩৫৫-৩৫৬ দীঘ ২য়, ১৭৩, ৩য় ১৯৯-২০০, অঙ্গুত্তর, ১ম, ২২৭ ; ৫ম, ৫৯ ; বিনয়, ১ম ২৭-২৮ ; জাতক, ৫ম, ৩১৬ ; যষ্ঠ ১০০.

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরপঞ্চাল—একটি নগরের নাম। যখন চেতিরাজ্যের রাজা অপচর (মতান্তরে উপচর) তাঁর মিথ্যাভাষণের জন্য অবীচিনরকে গমন করেন তখন তাঁর পাঁচপুত্র কপিল ব্রাহ্মণের নিকট এসে তাঁদের রক্ষা প্রার্থনা করেন। কপিল ব্রাহ্মণ তাঁদের প্রত্যেককে এক একটি নতুন নগর নির্মাণ করতে বলেন। চতুর্থপুত্র যে নগর নির্মাণ করেন তারই নাম উত্তরপঞ্চাল। ইহা চেতি রাজ্যের উত্তরদিকে নির্মিত হয়েছিল যেখানে রাজপুত্র রত্নখচিত একটি চক্রপঞ্জর দেখতে পেয়েছিলেন। কামনীত জাতক (নং ২২৮) এবং কুম্ভকার জাতক (নং ৪০৮) অনুসারে পঞ্চাল বা উত্তরপঞ্চাল হচ্ছে রাজ্যের নাম যার রাজধানী ছিল কম্পিল্ল। কিন্তু ব্রহ্মদত্ত জাতক (নং ৩২৩), সত্তিগুম্বজাতক (নং ৫০৩), জয়দ্দিস জাতক (নং ৫১৩) গণ্ডতিন্দু জাতক (নং ৫২০) অনুসারে উত্তরপঞ্চাল হচ্ছে কম্পিল্লরাজ্যের একটি নগরীর নাম। পঞ্চাল নামক

রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। আবার সোমনস্স জাতক (নং ৫০৫) অনুসারে উত্তরপঞ্চাল ছিল কুরুরাজ্যের একটি নগরী, যেখানে রাজা রেণু রাজত্ব করতেন।

Ref. জাতক, ২/২১৪ ; ৩য়, ৭৯ ; ৩৭৯-৮০ ; ৪৬১ ; ৪র্থ, ৩৯৬ ; ৪৩০ ৫ম, ২১, ৯৮

সুকোমল চৌধুরী

উত্তর থের[১]

তিনি রেবতস্থবিরের অন্তেবাসী ছিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘে বিশ বৎসর কাটিয়েছিলেন। বৈশালীর বৃজ্জিগণ বারবার অনুরোধ করে তাঁকে একটি চীবর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তার বিনিময়ে তিনি সঙ্ঘে বলেছিলেন যে, পাচীনক ভিক্ষুরাই বুদ্ধের প্রকৃতি ধর্মবাণী ধারণ করে আছেন, পাথেয্যক ভিক্ষুরা নয়। এরপর উত্তর রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলে রেবত তাঁর উক্ত অপ্রিয় বচনের জন্য তাঁকে তার অন্তেবাসী পদ থেকে বরখাস্ত করেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা এ খবর জানতে পেরে রেবত স্থবিরের নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

Ref. বিনয়, ২য়, ৩০২-৩০৩

সুকোমল চৌধুরী

উত্তর থের[২]

তিনি অর্হৎ ছিলেন। অশোক শ্রীলংকায় যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ৫জনের প্রচারক দল পাঠিয়েছিলেন উত্তর থের গিয়েছিলেন সোণস্থবিরের সঙ্গে। তাঁরা শ্রীলংকায় গিয়ে সেই রাক্ষসীকে দমন করেছিলেন যে সমুদ্র থেকে উঠে এসে শ্রীলংকার-রাজার ছেলেদের খেয়ে ফেলত রাক্ষসীকে দমন করার পর তাঁরা সপারিষদ রাজার নিকট 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' দেশনা করেছিলেন। এই সূত্র শ্রবণ করে ষাট হাজার লোক বুদ্ধের ধর্মের অনুরাগী হয়েছিল। পাঁচশত কুলীন বংশীয় যুবক ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। একহাজার পাঁচশত কুলীন বংশীয়া যুবতী ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। এরপর থেকে রাজপরিবারে জাত সকল রাজকুমারকে সোণুত্তর নাম দেওয়া হোত।

Ref. মহাবংস, ৪র্থ, ৬ ; ৪৪-৪৫ ; মহাবোধিবংস ১১৫

সুকোমল চৌধুরী

উত্তর থের[৩]

তিনি ছিলেন রাজগৃহের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বৈদিক সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন এবং তাঁর দেহ-সৌন্দর্য, প্রজ্ঞা ও অন্যান্য গুণাবলী জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মগধামাত্য বস্সকার ব্রাহ্মণ উত্তরের অসাধারণ গুণাবলী দেখে নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্থবির শারিপুত্রের নিকট ধর্মোপদেশ শুনে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন এবং শারিপুত্রের নিকট বাস করতে থাকেন।

একদিন শারিপুত্র অসুস্থ হলে উত্তর চিকিৎসকের সন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে এক সরোবরের তীরে ভিক্ষাপাত্রটি রেখে মুখ ধুতে নামলেন সরোবরে। ইতিমধ্যে একজন চোর

পুলিশের দ্বারা তাড়িত হয়ে সেখানে এল এবং তার চুরিকরা রত্নরাজি ঐ ভিক্ষাপাত্রে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ উত্তরের পাত্রে চুরিকরা জিনিস পেয়ে তাঁকে বেঁধে অমাত্য বস্সকারের নিকট নিয়ে এল। বস্সকার তাঁকে চিনতে পেরে পূর্বের প্রতিশোধ নেবার জন্য বললেন—'একে শূলে বিদ্ধ কর'। কিন্তু উত্তরের হেতুসম্পত্তি (অর্থাৎ অচিরেই তিনি অর্হত্ত্বলাভ করবেন) জেনে বুদ্ধ অদৃশ্যে উত্তরের নিকট এসে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শেই উত্তর ষড়ভিজ্ঞা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। উত্তরকে শূলে চড়ান হ'ল। কিন্তু তিনি কোন প্রকার দৈহিক দুঃখবেদনা অনুভব করলেন না। তিনি ঊর্ধ্বাকাশে শূন্যে স্থিত হলেন।

কিন্তু থের-অপদান অনুসারে ৭ বৎসর বয়সেই উত্তর অর্হৎ হন। সম্ভব এই উত্তর এবং এখানে আলোচ্য উত্তর এক নহেন।

Ref. থেরগাথা শ্লোক, ১২১-১২২

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরা থেরী[১]

কপিলাবস্তুর শাক্য রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি রাজঅন্তঃপুরে বোধিসত্ত্ব গৌতমের সেবায় নিযুক্ত ললনাজনের মধ্যে একজন ছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করার পরে মহাপজাপতি গৌতমীর সঙ্গে তিনিও ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিতা হন। বুদ্ধের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Ref. থেরীগাথা, শ্লোক, ১৫ ; থেরী-অট্ঠকথা, ২১-২২

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরা থেরী[২]

শ্রাবস্তীর বিশিষ্ট এক ধনীবংশে তাঁর জন্ম। তিনি ভিক্ষুণী পটাচারার মুখে ধর্মশ্রবণ করে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

থেরীগাথাতে তাঁর নমে ৭টি গাথা আছে যেগুলি তিনি অর্হৎ হওয়ার পরে ভাষণ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ়সংকল্প ছিল এই যে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না।

Ref. থেরীগাথা, শ্লোক ১৭৫-১৮১ ; থেরী-অট্ঠকথা। ১৬১-৬২

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরা নন্দমাতা

বুদ্ধের উপাসিকাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায়ের অট্ঠকথা অনুসারে রাজগৃহ নগরবাসী সুমন শ্রেষ্ঠীর পরিচারকের কন্যা ছিলেন উত্তরা নন্দমাতা। তাঁর পিতার নাম ছিল পুন্নসীহ (বা পুন্নক)। বুদ্ধের ধর্মসেনাপতি শারিপুত্রকে ভিক্ষাদানের ফলস্বরূপ পুন্নসীহ বিশাল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ৭দিন ধরে ভিক্ষাদান এবং

অন্যান্য প্রত্যয়াদি (ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি) দান করেছিলেন। সপ্তমদিবসে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণান্তে পুগ্নসীহ, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা উত্তরা স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন।

সুমন শ্রেষ্ঠী উত্তরাকে তাঁর পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিলে পুগ্নসীহ তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ সুমন শ্রেষ্ঠী শাক্যবংশীয় ছিলেন না। পরে অবশ্য তিনি একটি শর্ত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর কন্যা প্রত্যহ বুদ্ধের পূজার জন্য এক কার্ষাপণ মূল্যের ফুল পাঠিয়ে থাকেন, যদি সুমন শ্রেষ্ঠী তা দিতে স্বীকৃত হন, তাহলে তিনি তাঁর মেয়েকে দান করবেন। সুমন বলে পাঠালেন যে তিনি উত্তরাকে প্রত্যহ দুই কার্ষাপণ দেবেন। পুগ্নসীহ রাজী হয়ে কন্যাকে সুমনের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের আগে উত্তরা উপোসথ দিনে উপোসথ পালন করতেন। কিন্তু স্বামী তাঁকে উপোসথ পালন করতে দেবেন না। তখন উত্তরা পিতার কাছ থেকে ১৫ হাজার কার্ষাপণ নিয়ে তদ্দ্বারা সিরিমা নামক গণিকাকে পতির সেবার জন্য নিযুক্ত করে ১৫ দিনের জন্য উপোসথ করতে শুরু করলেন। উপোসথের শেষ দিনে উত্তরা বুদ্ধের জন্য আহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে লাগলেন। উত্তরা এবং তাঁর স্বামী পরস্পরকে দেখে মৃদু হাসলেন, যদিও উভয়ের হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। স্বামী ভাবলেন—উত্তরা এত ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েও তা ভোগ করতে জানল না। আর উত্তরা ভাবলেন—স্বামীর এত ধন আছে কিন্তু সেগুলোকে সৎকাজে ব্যয় করতে জানল না। কিন্তু সিরিমা গণিকা পতিপত্নীকে মৃদু হাসতে দেখে ভুল বুঝলেন এবং ফুটন্ত তেল উত্তরার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু উত্তরার তখন সিরিমার প্রতি ছিল অসীম করুণা। ফলে সেই ফুটন্ত তেলে উত্তরার কোন ক্ষতি হল না। সিরিমা নিজেকে অপরাধিনী ভেবে ক্ষমা চাইলেন উত্তরার কাছে। উত্তরা সিরিমাকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে সিরিমা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

বিমানবত্থু অট্ঠকথা এবং ধম্মপদ অট্ঠকথা অনুসারে সিরিমাকে বুদ্ধের ধর্মদেশনার পরে উত্তরা হয়েছিলেন সকৃদাগামী এবং উত্তরার স্বামী ও শ্বশুর হয়েছিলেন স্রোতাপন্ন।

মৃত্যুর পরে উত্তরা তাবতিংসে দেবলোকের এক বিমানে উৎপন্ন হন। মোগ্গল্লান স্থবির একবার তাবতিংসে দেবলোকে গিয়ে উত্তরাকে দেখে এসে বুদ্ধের কাছে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করেছিলেন।

উত্তরাকে নন্দমাতা কেন বলা হয়েছে তার কোন উল্লেখ কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন যে, বেলুকণ্টকী নন্দমাতা এবং উত্তরা নন্দমাতা একই। কিন্তু এই সাদৃশ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধঘোষের 'বিসুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থেও উত্তরা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

Ref. DPPN, ১ম ৩৬১-৩৬২

সুকোমল চৌধুরী

উত্তরাপথ

জম্বুদ্বীপের উত্তরাংশের নাম। পূর্বে অঙ্গদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিমে গন্ধার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণ বিন্ধ্যপর্বত—এই সীমানা নিয়েই উত্তরাপথ। শ্রাবস্তী থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যপথের জন্য উত্তরাপথ বিখ্যাত।

মহাবস্তু অবদানের মতে তপস্সু ও ভল্লুকের নিবাস ছিল উক্কলে (উৎকল = উড়িষ্যা)। এই উক্কল এবং তক্ষশিলা উত্তরাপথের অন্তর্গত।

উত্তরাপথে কংসভোগ নামক রাজ্য ছিল। মহাকংস ছিলেন কংসভোগ রাজ্যের রাজা এবং তাঁর রাজধানী ছিল অসিতঞ্জন।

Ref. বিনয়, ৩য়, ৬ ; জাতক, ২য়, ২৮৭ ; ৪র্থ, ৭৯ ; মহাবস্তু, ২য়, ১৬৬

সুকোমল চৌধুরী

উত্তিয় থের[১]

উত্তিয়, গোধিক, সুবাহু এবং বল্লিয় পাবাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মল্লরাজার পুত্ররূপে। তাঁরা চার জনেই ছিলেন পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। একবার তাঁরা বিশেষ কার্যব্যপদেশে কপিলাবস্তু গিয়ে বুদ্ধের সাক্ষাৎ পান। সেখানে তাঁরা বুদ্ধপ্রদর্শিত যমজ-প্রাতিহার্য্য দেখে মুগ্ধ হন এবং বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অত্যল্পকালের মধ্যে অর্হত্ব লাভ করেন।

অতীতে বুদ্ধ সিদ্ধার্থের সময়ও তাঁরা চারজন পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়েও তাঁরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন।

Ref. থেরগাথা, শ্লোক, ৫১-৫৪, থের-অট্ঠকথা ১ম, ১২৩-১২৬

সুকোমল চৌধুরী

উদঞ্চনী জাতক

জাতক নং ১০৬। বোধিসত্ত্ব এবং তাঁর পুত্র একটি আশ্রমে বাস করতেন। একদিন সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্ব ফলমূল নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর পুত্র কাষ্ঠাদি আহরণ করে নি এবং আগুনও জ্বালেন নি। পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করলে পুত্র বললেন—'আপনার অনুপস্থিতি কালে একটি মেয়ে এসে আমাকে প্রলুব্ধ করেছে এবং আপনার অনুমতি পেলে সে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।' পিতা শুনে বললেন—'পুত্র, তুমি যেতে পার। তবে যদি ইচ্ছা হয় আবার এখানে ফিরে আসতে পার।' পুত্র সেই মেয়েটির সঙ্গে চলে গেল এবং গিয়ে দেখল যে মেয়েটি তাঁর বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্যই শুধু তাকে চেয়েছে। সে তার প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে আবার আশ্রমে তার পিতার নিকট ফিরে এল।

সুকোমল চৌধুরী

উদপানদূস জাতক (উদপান-দূসক জাতক—২৭১)

একটা শৃগাল কোন তপস্বীর কূপের জল দূষিত করেছিল। তাকে উপলক্ষ্য করে ঋষিপতনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলেছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে এই ঋষিপতন এবং এই কূপই ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরের কোন ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ঋষিগণের

সঙ্গে ঋষিপতনে বাস করতেন, ঐ সময়ে একটা শৃগাল এই কূপটার জল দূষিত করে যেত। অনন্তর একদিন তাপসেরা তাকে ঘিরে এবং কোনরূপে ধরে বোধিসত্ত্বের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব শৃগালের সহিত আলাপ করার সময় একটি গাথার সাহায্যে বলেছিলেন যে, 'ঋষিগণ অনেক কষ্ট করে কূপ খনন করেছে তার জল তুমি অকারণ নষ্ট কর কেন?' শৃগালও একটি গাথার সাহায্যে বলেছিল যে, 'শৃগালের রীতিই হল যেখানে জল খায় সেখানেই মল-মূত্র ত্যাগ করে। পিতা-পিতামহ হতে এ ধর্ম তারা পেয়েছে।' তখন বোধিসত্ত্ব আরও একটি গাথার সাহায্যে বলেছিলেন যে, 'শৃগাল সমাজের এরকম ধর্মাধর্ম আর যেন এখানে দেখা না যায়।' মহাসত্ত্ব এরূপে শৃগালকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'শৃগাল যেন এদিকে আর না আসে।' সেই থেকে সে শৃগাল আর সে দিকে ফিরে তাকাত না।

সমাধান হল—তখন এই শৃগালই সেই কূপ দূষিত করেছিল এবং আমি ছিলাম সেই গণশাস্তা।

বেলা ভট্টাচার্য

উদয় জাতক

জাতক নং ৪৫৮। এই জাতক উদয়ভদ্র এবং উদয়ভদ্রার কাহিনী-সম্বলিত। বোধিসত্ত্ব উদয়ভদ্র একবার বারাণসীর রাজা হয়েছিলেন। উদয়ভদ্রা নামে তাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিল। পিতামাতা উদয়ভদ্রকে বিয়ে করতে বললে তিনি পরপর প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুতেই যখন পিতামাতাকে বোঝাতে পারলেন না তখন তিনি একটি কাঞ্চনময় নারীমূর্তি তৈরী করে বললে—'এরকম সুন্দরী যদি কোন নারী পাও, তাহলে আমি বিয়ে করতে রাজী।' একমাত্র উদয়ভদ্রাই ঐ নারীমূর্তিসদৃশ সুন্দরী ছিলেন। অগত্যা উদয়ভদ্রার সঙ্গেই উদয়ভদ্রের বিয়ে হল। বিয়ের পর তাঁরা সহবাস করলেও ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতেন। একদিন উদয়ভদ্র মারা গেলেন। উদয়ভদ্রা রাণী হলেন। রাজা উদয়ভদ্র মৃত্যুর পর শক্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। মৃত্যুর আগে তিনি উদয়ভদ্রাকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি আবার জন্ম নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু দেখা দেওয়ার পূর্বে তিনি উদয়ভদ্রার সতীত্ব পরীক্ষা করলেন নানাভাবে। উদয়ভদ্রা শুদ্ধভাবে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করছেন দেখে তিনি তাঁকে দেখা দিলেন এবং তাঁকে নানা ধর্মোপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। এর পরে রাণী উদয়ভদ্রা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে বোধিসত্ত্বের পরিচারিকা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

এই জাতক-কাহিনী পথভ্রষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ এক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। এই জাতকের সঙ্গে কুস জাতক (নং ৫৩১) এবং অননুসোচিয় জাতকের (নং ৩২৮) বহু মিল আছে।

সুকোমল চৌধুরী

উদান

পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। ৮টি বর্গে ৮০টি গল্প এখানে আছে। 'উদান' শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধ মুখনিঃসৃত উদাত্ত বাণী। কয়েকটি গল্পমাত্র গদ্যে আছে। বেশীরভাগ গল্পই পদ্যে। প্রত্যেকটি উদানের পরে গদ্যে তার গল্পটি দেওয়া আছে।

উদান গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ জীবনের অনেক ঘটনা জানা যায় যেগুলোর সঙ্গে মহাপরিনিব্বান সুত্ত এবং বিনয়পিটকে বর্ণিত ঘটনাবলীর মিল আছে। উদানের আলোচ্য বিষয়গুলো বৌদ্ধ জীবনাদর্শ সম্বলিত। জাতিবাদের নিরর্থকতা, বিষয় বাসনায় অনাসক্তি, বিমুক্তি, প্রতীত্যসমুৎপাদ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ প্রভৃতি বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে আছে।

সুকোমল চৌধুরী

উদায়িভদ্দ

মগধের রাজা অজাতশত্রুর পুত্র। পিতাকে হত্যা করার পর অজাতশত্রুর মনে একদিন এই চিন্তা হয়েছিল—"আমি যেমন আমার পিতাকে হত্যা করেছি। আমার পুত্রও আমাকে হত্যা করবে না তো?" অজাতশত্রুর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারণ উদায়িভদ্র পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন এবং ১৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। উদায়িভদ্র আবার তৎপুত্র অনুরুদ্ধকের দ্বারা হত হয়েছিলেন। এজন্য মগধের রাজা বিম্বিসারের বংশ ইতিহাসে পিতৃহন্তা বংশরূপে চিহ্নিত।

Ref. দীঘ, ১ম, ৫৩ ; মহাবংস, ৪র্থ, ১-৩ ; দীপবংস, ৪র্থ, ৩৮ ; ৫ম, ৯৭ ; ১১শ, ৮ মহাবোধিবংস, ৯৬

সুকোমল চৌধুরী

উদায়ী থের

উদায়ী নামে আরও ভিক্ষু ছিলেন, সেজন্য এই উদায়ী থেরকে মহা উদায়ী বা পণ্ডিত উদায়ী বলা হোত। কপিলাবস্তুর এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়। বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ যখন প্রথম জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলনের জন্য কপিলাবস্তু এসেছিলেন তখন উদায়ী বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ভিক্ষু হয়েছিলেন এবং অচিরেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

'সর্বালংকারে প্রতিমণ্ডিত শ্বেতহস্তীকে মহাজনসঙ্ঘ প্রশংসা করে থাকে' দেখে একদা বুদ্ধ হস্তীর উপমা গ্রহণ করে নানোপম সুত্ত (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪) দেশনা করেন। দেশনাবসানে উদায়ী স্বীয় জ্ঞানানুরূপ বুদ্ধের গুণ অনুস্মরণ পূর্বক প্রীতি সমুৎসাহিত চিত্তে বললেন—"এই জনসঙ্ঘ পশুনাগকে কতই প্রশংসা করে, অথচ বুদ্ধনাগকে তেমন প্রশংসা করেন না। বুদ্ধরূপ মহাগন্ধহস্তীর কি যে গুণ, আমি আজ তা প্রশংসা করব"—এই বলে তিনি ১৬টি শ্লোকে বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করেন।

Ref. থেরগাথা, শ্লোক ৬৮৯-৭০৪ ; সংযুক্ত ৪র্থ, ১২১-১২৪ ; ১৬৬

সুকোমল চৌধুরী

উদুম্বর জাতক

জাতক নং ২৯৮। ২টি বানরের গল্প নিয়ে এই জাতক। ছোট আকারের লালমুখো একটি বানর একটি পর্ব্বত গুহায় থাকত। একদিন ভীষণ বৃষ্টিপাত শুরু হলে বড় আকারের কালমুখো অন্য বানরটি দেখল যে ছোট বানরটি পর্ব্বতগুহায় কত আরামে আছে। তার সে গুহাটি দখল করার জন্য বড় বানরটি ছোট বানরকে বলল—"বাইরে বনে অনেক খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। তুমি এই গুহায় অনাহারে মরবে কেন?" শুনে ছোট বানরটি গুহা থেকে বেরিয়ে বনে খাদ্যের সন্ধানে বের হল। ফিরে এসে দেখে যে বড় বানরটি সপরিবারে এসে তার গুহাটি দখল করে নিয়েছে।

গ্রামের একটি আশ্রমে একজন ভিক্ষু খুব সুখে দিন যাপন করছিলেন। একজন আগন্তুক ভিক্ষু এসে ছলেবলে কৌশলে তাঁকে গ্রামছাড়া করে দিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতকের অবতারণা।

সুকোমল চৌধুরী

উদুম্বরিক সীহনাদ সুত্ত

ইহা দীঘনিকায়ের ২৫নং সূত্র। উদুম্বরিক-পরিব্রাজকারামে এই সূত্র দেশিত হয়েছিল বলে ইহার ঐ নাম। পরিব্রাজক নিগ্রোধ প্রায়শই বুদ্ধের নিন্দা করে বেড়াতেন, বুদ্ধের নির্জনতাপ্রিয়তাকে অশ্রদ্ধা করতেন। একবার বুদ্ধ সুমাগধা নদীর তীরে ময়ূরনিবাপে বিচরণ করছিলেন। দেখতে পেয়ে নিগ্রোধ তাঁকে তাঁর আশ্রমে ডেকে এনে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বুদ্ধ অবাস্তব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরপাত করা এবং তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, ইত্যাদি নিয়ে ধর্মদেশনা করলেন। সপরিবার নিগ্রোধ বুদ্ধের ভাষণের প্রশংসা করলেও তিনি কিন্তু বুদ্ধের শরণাগত হলেন না।

বুদ্ধ উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে সিংহনাদ করে আকাশে উত্থিত হয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে আবির্ভূত হলেন।

সুকোমল চৌধুরী

উদেন

কৌশাম্বীর রাজা। পিতার নাম ছিল পরন্তপ। তাঁর জন্মের প্রাক্‌কালে একটি বাজপাখী তাঁর মাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অল্লকপ্পের (পূর্বে তিনি রাজা ছিলেন) আশ্রমে নিকটবর্তী একটি বৃক্ষোপরি স্থাপন করে। ইতিমধ্যে উদেনের জন্ম হয়। অল্লকপ্প দেখতে পেয়ে মাতা ও শিশুকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জানতেন না। ইতিমধ্যে উদেন বড় হতে থাকে। একদিন অল্লকপ্প জানতে পারলেন যে কৌশাম্বীর রাজা পরন্তপ দেহত্যাগ করেছেন। শুনে উদেনের মাতা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে উদেনই কৌশাম্বী রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অল্লকপ্প উদেনকে বহুপ্রকার হস্তী-বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়েছিলেন এবং একদিন বহু হস্তীসহ উদেনকে কৌশাম্বী পাঠালেন রাজ্য দাবী করবার জন্য। উদেন রাজা হয়ে ঘোষককে তাঁর কোষাধ্যক্ষ করলেন এবং ঘোষকের পালিতা কন্যা শ্যামাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। পরে তিনি অবশ্য উজ্জেনীর রাজা চণ্ডপজ্জোতের কন্যা বাসুলদত্তাকে বিয়ে করেন। উদেনের প্রধানা রাণী ছিলেন মাগন্দিয়া। মাগন্দিয়ার সঙ্গে বুদ্ধের বিয়ে দেবার

জন্য তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ মাগন্দিয় চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে বুদ্ধের প্রতি মাগন্দিয়ার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে এবং তিনি নানাভাবে বুদ্ধের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এদিকে শ্যামাবতী তাঁর পরিচারিকা খুজ্জুত্তরার চেষ্টায় বুদ্ধের শরণাগত হন। মাগন্দিয়া এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্যামাবতীর বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙানোর চেষ্টা করেন এবং নানা অপকৌশল প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হন। রাজা সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে জ্ঞাতিমিত্রসহ মাগন্দিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং শ্যামাবতীর প্রতি অবিচার হওয়াতে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হন। শ্যামাবতী এই সুযোগে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রত্যহ রাজপ্রসাদে ভিক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে নেন। বুদ্ধ নিজে না গিয়ে প্রত্যেকদিন আনন্দসহ পাঁচশত ভিক্ষুকে রাজবাড়ীতে পাঠাতেন। রাজবাড়ীর অন্তঃপুরবাসিনীরা প্রত্যহ আনন্দের নিকট ধর্মদেশনা শুনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্ত উৎপাদন করেন এবং আনন্দকে পাঁচশত মূল্যবান চীবর দান করেন। এতে রাজা উদেন অসন্তোষ প্রকাশ করলে আনন্দ তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে কোন দানই বৃথা যায় না। মূলতঃ কোন ধর্মের প্রতিই রাজার কোন শ্রদ্ধা ছিল না।

অর্হৎ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ (রাজ উদেনের পুরোহিতপুত্র) প্রায়ই প্রমোদোদ্যানে দিবাবিহারের জন্য যেতেন। একদিন উদেনও দিবাহারের জন্য সেখানে যান অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে নিয়ে। উদেন ঘুমিয়ে পড়লে অন্তঃপুরবাসিনীরা ধর্মকথা শোনার জন্য পিণ্ডোলের চারদিকে ভিড় করেন। ঘুম থেকে জেগে ঐ দৃশ্য দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পিণ্ডোলকে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পিণ্ডোল সেখানে অন্তর্ধান করে শ্রাবস্তীতে চলে যান। পরে অবশ্য পিণ্ডোলের গুণের কথা শুনে তিনিও তাঁর ভক্ত হন এবং ইন্দ্রিয়দমন বিষয়ে বহু উপদেশ গ্রহণ করেন।

উদেনের বোধি নামক এক পুত্র ছিল। বোধি 'কোকনদ' নামক বিখ্যাত প্রাসাদ তৈরী করার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

উদেনকে বংসরাজ (বৎসরাজ) অর্থাৎ কৌশাম্বীর অধিবাসী বংশ (বৎস) বা বচ্ছদের রাজা বলা হোত। উদেন অট্ঠকথাতে তাঁকে বজ্জিরাজা বলা হয়েছে। মিলিন্দপ্রশ্ন অনুসারে গোপালমাতাও উদেনের ছিলেন। দরিদ্র কৃষকের কন্যা গোপালমাতা তাঁর মাথা চুলের বিনিময়ে ৮ পেনি লাভ করে তার সাহায্যে অর্হৎ মহাকচ্চানকে এবং তাঁর ৭ জন সঙ্গীকে পিণ্ডদান করেছিলেন। তারই পুণ্যের ফলে তিনি উদেনের ভার্যা হতে পেরেছিলেন।

Ref. DPPN, ১ম, ৩৭৯-৩৮০

সুকোমল চৌধুরী

উদেন-চেতিয়

বৈশালীর পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাক্ বৌদ্ধযুগীয় একটি চৈত্য। বৈশালীর যে ৬টি বিখ্যাত চৈত্যে বুদ্ধ প্রায়ই অবস্থান করতেন তাদের মধ্যে উদেন-চেতিয় একটি। অপরগুলির নাম গোতমক, সারন্দদ, সত্তম্ব, চাপাল এবং বহুপুত্ত-চেতিয়।

Ref. দীঘ, ২য়, ১০২ ; সংযুত্ত ৫ম, ২৬০ ; অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, ৩০৯

সুকোমল চৌধুরী

উদ্দক-রামপুত্ত (= রুদ্রক-রামপুত্র)

বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে গৌতম তাঁর কাছে অনেক কিছু শিক্ষা করেছিলেন বলে একে গৌতমের দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু বলা হয়। উদ্দকের পিতা ঋষি রাম যা উদ্দককে শিখিয়েছিলেন, উদ্দকও গৌতমকে তাই শিখিয়েছিলেন। ঋষি রাম সাধনায় উন্নত হয়ে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। গৌতম অল্পদিনের মধ্যেই এই ধ্যানস্তরে উন্নীত হন। তখন উদ্দক তাঁকে বললেন—'চল আমরা উভয়ে আমার পিতার এই শিষ্যদের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করি।' কিন্তু গৌতম তাতে সম্মত না হয়ে ফিরে চলে যান।

উদ্দকের প্রতি গৌতমের শ্রদ্ধা ছিল, তাই বুদ্ধত্বলাভের পরে তিনি তাঁর খোঁজ করেছিলেন। কারণ উদ্দক যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তাতে বুদ্ধের ধর্মমত বুঝতে তাঁর কষ্ট হবে না। কিন্তু গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেই উদ্দক কালগত হয়েছেন।

Ref. জাতক, ১ম, ৬৬, ৮১ ; মজ্ঝিম ১ম, ১৬৫-১৬৬ ; ২৪০-২৪১ ; বিনয়, ১ম, ৭

সুকোমল চৌধুরী

উদ্দালক জাতক

উদ্দালক জাতকটি আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত জাতকট্‌ঠথার ৪৮৭ সংখ্যক জাতক-কাহিনী বা বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্ম-কথা। জাতকট্‌ঠকথা-বর্ণনার সকল আঙ্গিকেই এই জাতক রক্ষিত। প্রত্যুৎপন্নবস্তু (পচ্চুপ্পন্নবত্থু)-র বিবরণ থেকে জানা যায় ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক প্রবঞ্চক ভিক্ষু সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যবর্গকে সতর্ক করতে এই জাতকের অবতারণা। অতীত-বত্থু বা মূল জাতক কাহিনীর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ।

প্রাচীনকালে কোন এক সময় বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের শাসনকালে বোধিসত্ত্ব বহুশাস্ত্রে পারঙ্গম সুপণ্ডিত পুরোহিত রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি এক উদ্যানে এক রূপবতী গণিকার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের এই মিলনের পলে গণিকাটির গর্ভসঞ্চার হয়। ভাবী সন্তানটির কি নাম রাখা যায় এই প্রশ্নোত্তরে সম্মুখস্থ উদ্দাল বৃক্ষকে সাক্ষী রেখে উদ্দালক নাম রাখার প্রস্তাব করা হয়। তারপর বর্ণদাসীকে একটি অঙ্গুরীয়ক প্রদান করে রাজপুরোহিত পুত্র সন্তান জন্মালে পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তিকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁর নিকট পাঠাবার নির্দ্দেশ দেন।

যথাসময়ে গণিকা পুত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম হ'ল উদ্দালক। উদ্দালক বয়ঃপ্রাপ্তকালে পিতার পরিচয় অবগত হন এবং পিতার ইচ্ছানুযায়ী বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার জন্য তক্ষশিলা নগরে গমন করেন এবং আচার্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থী হন। শাস্ত্রগ্রহণকালে এক তপস্বীসম্প্রদায় দর্শনে বিমুগ্ধ হন এবং তদধিগত উৎকৃষ্ট বিদ্যাগ্রহণের জন্য প্রব্রজিত জীবন গ্রহণ করেন। কালক্রমে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অর্জন করে এই পাঁচশত তপস্বী দলের আচার্য ও নেতা রূপে বৃত হন। এক সময় ধর্মব্রতী গৃহস্থগণের নিয়ত সেবা ও দান লাভে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর শিষ্যদল সহ উদ্দালক বারাণসী নগরে উপস্থিত হন এবং গৃহস্থগণপ্রদত্ত প্রচুর

ভিক্ষাদ্রব্য লাভান্তে তাঁদের ধর্মকথা প্রচার ও ধর্মীয় জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করে সেই স্থানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্রমশঃ আচার্য উদ্দালকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় বারাণসীরাজ উদ্দালক ও তাঁর তপস্বী শিষ্যদের দর্শন করার বাসনা প্রকাশ করেন। উদ্দালকও রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভেচ্ছু হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যগণকে বিভিন্ন যৌগিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনের দ্বারা রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরামর্শ দেন। তদনুসারে তপস্বীদলের কতিপয় 'বল্গুলিব্রত' (অধোশির ও ঊর্ধ্বপদে যোগাসন) প্রদর্শন, কতিপয় 'কণ্টকাসনে' অথবা পঞ্চতপাসনে উপবিষ্ট রইলেন। বারাণসীরাজ তাঁর পুরোহিতসহ উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের ভণ্ড তপস্যার আয়োজনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গাথার দ্বারা অভিনন্দিত করলেন। বারাণসীরাজার পুরোহিত রাজার ভ্রান্তি নিরসনে একটি গাথার সাহায্যে জানান যে সদাচার রক্ষাকারীই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। কেবল বেদাধ্যয়ন বা শাস্ত্রপাঠের দ্বারা পাপাচার নিরস্ত করা যায় না। উদ্দালক রাজ পুরোহিতের মনোভাব বুঝতে পেরে রাজাকে তার দাক্ষিণ্যলাভের আশায় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত সদাচার রক্ষিত হয় না বলে এক বিতর্কের সৃষ্টি করেন। রাজপুরোহিত ও প্রত্যুত্তরী গাথায় প্রতিষ্ঠা করেন যে বেদাধ্যয়নের সংযম নিষ্ফল হয় না। বেদাধ্যয়নে কীর্তি ও সংযমনপালন দ্বারাই শান্তিই লাভ করা যায়। অতঃপর উদ্দালক যুক্তির দ্বারা রাজ-পুরোহিতকে জব্দ করা সম্ভব নয় বলে আর একটি গাথার মাধ্যমে নিজ পরিচয় প্রদানান্তে পুরোহিত বাৎসল্য ও কৃপালাভ করার চেষ্টা করেন। পুরোহিত তখন তপস্বী আচার্যের প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য তাঁর গর্ভধারিণী প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কটি দেখাতে বলেন। অঙ্গুরীয়কটি দর্শনের পর রাজপুরোহিত উদ্দালককে প্রকৃত ব্রাহ্মণধর্ম ব্যক্ত করতে বলেন। উদ্দালক ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আচরিত নিত্যস্নান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও লৌকিক ধর্মকেই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ জানালে রাজপুরোহিত তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে জানান নিত্যস্নানাদির দ্বারা নির্বাণের বিশুদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। ক্রমশঃ গাথায় গাথায় পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তর দানের মাধ্যমে পুরোহিত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, যে কোন বর্ণের লোকই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন ক্ষান্তিধর্ম ও সংযম আচরণের দ্বারা। আবার কুশলধর্ম পালন, অকিঞ্চনতা ও বাসনারহিততার দ্বারাই যে কোন জাতি বা বর্ণের লোকই নির্বাণ তথা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। উদ্দালক এই যুক্তির বিরোধিতা করলে রাজপুরোহিত দুটি সুন্দর উপমার দ্বারা তাঁর মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—বিভিন্ন বর্ণ বা বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত মণ্ডপের ছায়া একই হয় অতএব বর্ণভেদ ব্রাহ্মণত্বের পরিপন্থী নয়। শুদ্ধশীল ব্যক্তির কোন জাতি বা বর্ণভেদ থাকে না। তাঁর অর্জিত গুণগ্রামের দ্বারাই তিনি বন্দিত হন।

উদ্দালক রাজপুরোহিতের যুক্তিজালে আচ্ছন্ন হলে তিনি উদ্দালক ও তাঁর দলের ধূর্ততা ও তস্করতার রূপটি প্রকাশ করলেন। উদ্দালককে প্রব্রজিত বেশ পরিত্যাগ করিয়ে তিনি তাঁকে রাজার উপ-পুরোহিত পদে নিযুক্ত করার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন এবং উদ্দালকের শিষ্যদের প্রব্রজিত বেশ পরিত্যাগ করিয়ে তাঁদের রাজার সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

গল্পটির সমোধান অংশেবুদ্ধ ধূর্ত ভিক্ষুককে উদ্দালক, আনন্দকে রাজা এবং নিজেকে রাজপুরোহিত বলে চিহ্নিত করেন। এই জাতক কাহিনীটিতে বৌদ্ধধর্মকে সত্য-সনাতন-প্রকৃত ধর্ম বলা হয়েছে এবং নিরর্থক জাতিবাদের নিন্দা করা হয়েছে।

জাতকটির গুরুত্ব অপরিসীম কারণ, বৌদ্ধধর্মই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কথা ব্যক্ত করে এবং সজ্জন সাধু পণ্ডিত যে কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করেও অধিগত গুণগ্রামের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বাসের কথা এই জাতকে উপদিষ্ট।

ব্যবহৃত গ্রন্থতালিকা।

Fausböll—Jātaka vol. iv P. T. S., London.

ঈশানচন্দ্রঘোষ—জাতক, খণ্ড ৪, করুণাপ্রকাশনী। কলিকাতা

Dictionary of Pali Proper Names, I. G. P. Malalasekera,

সাধনচন্দ্র সরকার

উদ্ধগ্ন লোম (ঊর্দ্ধ + অগ্র)

উদ্ধগ্ন লোম অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখী লোম এটি বুদ্ধের বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণের একটি। এটির অর্থ 'লোমসমূহের অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী'। তাঁর বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ এবং আশিটি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ পূর্ব পূর্বজন্মের কৃত পুণ্যফলেই প্রকটিত হয়েছিল। কোন্ পুণ্যকর্মের ফলে কোন্ লক্ষণ প্রকটিত, তার বিস্তৃত কাহিনী 'জিনালংকার বর্ণনায়' বর্ণিত আছে। এই লক্ষণগুলি বুদ্ধ ছাড়া কারও কাছে থাকে না।

[দ্রষ্টব্য ঃ দীঘনিকায় লক্খন সুত্ত]

শুভ্রা বড়ুয়া

উদ্ধচ্চ কুক্কুচ্চ (ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য)

যে চৈতসিক বা মনোবৃত্তির জন্য অনুৎপন্ন কুশলচিত্ত বা কুশলধ্যানচিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না এবং উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পেতে পারে না, তাদের সাধারণ নাম নীবরণ। "চিত্তং নীবরন্তীতি নীবরণা'। চিত্ত স্বভাবত ক্লেশমুক্ত, কিন্তু নীবরণাদির সংস্পর্শে চিত্ত কলুষিত হয়ে যায়। নীবরণ পাঁচটি। উদ্ধচ্চকুক্কুচ্চ পঞ্চনীবরণের চতুর্থটি এবং দশটি সংযোজনের নবম।

আলম্বন থেকে চিত্তের উৎক্ষেপনই উদ্ধচ্চ। চিত্তের অশান্তি এর লক্ষণ, অস্থিরতা সম্পাদন এর কৃত্য। এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে দোষী মনে করে ভীত হয়।

কৌকৃত্য অর্থে বোঝায় অনুশোচনা, অনুতাপ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ইত্যাদি। এই উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ দুভাবে চিত্তে উৎপন্ন হয়—(১) কুশল কর্ম করা হল না, (২) অকুশল কর্ম করা হল। এই দৌর্মনস্য বেদনাযুক্ত কেবল দ্বেষ চিত্তেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈর্ষা ও মাৎসর্য বিবর্জিত হয়ে উৎপন্ন হয়। 'প্রশ্রব্ধি' অর্থাৎ প্রশান্তি উভয়ের প্রতিপক্ষ।

অভিধম্মত্থসংগহ - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভ্রা বড়ুয়া

উদ্ধমাঘাতনিকা (উর্দ্ধং + আঘাতনিকা)

দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচলিত যে বাষট্টি প্রকার দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় উদ্ধমাঘাতনিকা তার মধ্যে একটি। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এই মতবাদকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। বত্রিশ প্রকার উদ্ধমাঘাতনিকবাদকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ—

(ক) সংজ্ঞাবাদ (সঞ্ঞাবাদ) মৃত্যুর পর আত্মার চেতনায় বিশ্বাস। একে ষোল প্রকারে দেখানো হয়েছে ঃ— (১) মরণান্তে আত্মা, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। (২) মরণান্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় থাকে। (৩) আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী (৪) রূপীও নয় অরূপীও নয়। (৫) সান্ত (৬) অনন্ত (৭) সান্ত ও অনন্ত (৮) সান্তও নয় অনন্তও নয়। (৯) একাত্ম সংজ্ঞী (১০) নানাত্ব সংজ্ঞী (১১) পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন (১২) অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন (১৩) একান্ত সুখী (১৪) একান্ত দুঃখী (১৫) একাধারে সুখী ও দুঃখী (১৬) সুখ দুঃখহীন, সরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় মরণান্তে বিদ্যমান।

(খ) অসংজ্ঞাবাদ (অসঞ্ঞাবাদ) (৮টি)—মৃত্যুর পর আত্মার সচেতনতায় বিশ্বাস। (১) মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। (২) মরণান্তে আত্মা অরূপী (৩) একাধারে রূপী ও অরূপী (৪) রূপীও নয়, অরূপীও নয় (৫) সান্ত (৬) অনন্ত (৭) একাধার সান্ত ও অনন্ত (৮) সান্তও নয়, অনন্তও নয়। মরণান্তে এর অরোগ অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে।

(গ) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাবাদ (নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাবাদ) (৮টি) মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা অচেতনা কিছুই থাকে না, এই বিশ্বাস। (১) মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং নৈব-সংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে (২) মরণান্তে আত্মা অরূপী (৩) একাধারে রূপী ও অরূপী (৪) রূপীও নয়, অরূপীও নয় (৫) সান্ত (৬) অনন্ত (৭) একাধারে সান্ত ও অনন্ত (৮) সান্তও নয় অনন্তও নয়। মরণান্তে এর অরোগ নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে।

[দ্রষ্টব্য ঃ দীঘনিকায়-ব্রহ্মজালসুত্ত]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপক

পালি জাতক, বিনয় পিটক, মধ্যমনিকায়, ধম্মপদট্‌ঠকথা, থেরীগাথা প্রভৃতিতে উপকের কথা বর্ণিত রয়েছে।

প্রথম জীবনে উপক ছিলেন আজীবক সম্প্রদায়-ভুক্ত জনৈক প্রব্রজিত সন্ন্যাসী। ভগবান গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে উপকের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বোধিবৃক্ষ ও গয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এক চলার পথে। বুদ্ধকে উপকের প্রথম প্রশ্ন তাঁর অর্হত্ব বা সিদ্ধিলাভ বিষয়ক। ভগবান্ বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে তাঁর পরমপ্রাপ্তির বিষয়টি ব্যক্ত করলেও তিনি পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করেন যে বুদ্ধ 'অনন্তজিন' কিনা। সদর্থক উত্তর লাভেও সন্দিগ্ধ হয়ে ভিন্নপথমার্গী হন। ভগবান বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষিত

করার জন্য বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ স্থানটি থেকে বারাণসীর ইসিপতন পর্যন্ত আকাশমার্গে গমন না করে অন্যান্য বুদ্ধগণের মত পদব্রজেই উপস্থিত হন। উপক ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভান্তে 'বঙ্কহার' নামক এক প্রদেশে গমন করেন এবং সেখানে এক চাঁপা নামক এক ব্যাধকন্যার প্রেমাসক্ত হন। তাঁদের বিবাহের পর চাঁপার গর্ভে সুভদ্দ নামক এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। চাঁপা তাঁর ক্রন্দনরত পুত্রকে শান্ত করার জন্য উপককে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় আক্রমণ করলে তার কথায় বিরক্ত হয়ে শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব দূর থেকে উপককে আসতে দেখে তাঁর শিষ্যদের উপককে কাছে পাঠাতে বলেন। বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁকে বুদ্ধের নিকট পাঠালে ভগবান বুদ্ধ উপককে বৌদ্ধসংঘে প্রব্রজিত করেন। ধ্যান ও শীল চর্চার দ্বারা উপক অনাগামী ফল লাভান্তে 'অবিহ' নামক স্বর্গে জন্মলাভ করেন। সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত যে উপক ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করার পর অন্য ছয়জন শিষ্যের সঙ্গে জন্মলাভ করেন। মজ্ঝিমনিকায়ের টীকাগ্রন্থ পপঞ্চসূদনী অনুযায়ী উপক 'অবিহ' স্বর্গে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্ব লাভ করেন। 'থেরগাথায়' তিনি 'কাল' নামে বর্ণিত। তাঁর জন্মস্থানটি ছিল বোধিবৃক্ষের সন্নিকটস্থ। 'দিব্যাবদান' গ্রন্থে তাঁর নাম উপক। তাঁর স্ত্রী চাঁপাও পরবর্তী কালে গৃহত্যাগ করে ভগবান গৌতমবুদ্ধের আশ্রিতা হন এবং সাধনার গুণে থেরী হয়ে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

ব্যবহৃত গ্রন্থ তালিকা

জাতক—পূর্ববৎ

থের গাথা—P. T. S. সংস্করণ, London

পপঞ্চসূদনী ১ P. T. S. সংস্করণ, London

সংযুক্ত নিকায় ১ P. T. S. সংস্করণ, London

দিব্যাবদান—Ed. by P. L. Vaidya, Mithila Institute, 1959

Dictionary of Pali Proper Names vol. I

সাধনচন্দ্র সরকার

উপকমণ্ডিকাপুত্ত

উপকমণ্ডিকাপুত্তের জীবনকথা পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ের অর্থকথা মনোরথপূরণী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। তিনি এক নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই অঙ্গুত্তর নিকায়গ্রন্থে উল্লিখিত (অঙ্গুত্তর ২, ১৮২)। মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁকে 'লোণকারকদারক' রূপে সম্ভাষিত করতেন। সম্ভবতঃ তিনি লবণ তৈরীর পেশায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট (গিজ্ঝকূট) পর্বতে তিনি প্রথম ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। বুদ্ধকে সাক্ষাত করার সময়-ই তিনি তাঁর দর্শন-বিষয়ক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কর্কশ ও নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহারকারী মাত্র স্বয়ং দোষযুক্ত ও নিন্দনীয়। ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁর কথার মর্মার্থ সহজেই উপলব্ধি করে বলেন উপক নিজেই উক্ত দোষে দুষ্ট। বুদ্ধের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উপক বুদ্ধদেবকে বলেন যে তিনি তাঁর কথার যুক্তিজালেই তাকে বদ্ধ করতে পারেন। যেমন কোন জলের উপর সশীর্ষ ভাসমান মৎস্যকে বড়শী দিয়ে অতি

সহজেই বদ্ধ করা যায়। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব বলেন যে তিনি তুলনা ও উদাহরণের পদ্ধতির মাধ্যমেই কথাচ্ছলে ধর্মোপদেশ বা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। উপক ভগবান্ বুদ্ধের কথায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং তিনি রাজা অজাতশত্রুকে সকল কথা নিবেদন করেন। অজাতশত্রু ভগবান বুদ্ধের সংগে অসংগত ও অসমীচীন বাক্যালাপের জন্য উপকের নিন্দা করেন এবং অবশেষে তাকে অর্দ্ধচন্দ্রাদান করে ভূতলে নিক্ষেপ করেন (অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, ১৮১)। মনোরথপূরণী গ্রন্থে বর্ণিত যে একসময় উপক ভগবান্ বুদ্ধের সাক্ষাতান্তে জানতে চান যে তিনি দেবদত্তের সমর্থক হয়েও ভগবান বুদ্ধের নিকট নিন্দনীয় হবেন কিনা। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় যে দেবদত্তকে নরকে প্রেরণ করার অভিযোগেই বুদ্ধের নিকট উপক গমন করেছিলেন।

গ্রন্থতালিকা

অঙ্গুত্তর নিকায়, ২, পি. টি. এস. সংস্করণ ; মনোরথপূরণী ২ ; পি. টি. এস. সংস্করণ Dictionary of Pali, Proper names vol. I.

সাধনচন্দ্র সরকার

উপক্কিলেস (উপক্লেশ)

উপক্লেশ অর্থ প্রতিবন্ধক। ত্রিবিধ লক্ষণ অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম. অনুভবের স্তর থেকে উপলব্ধি করতে না পারলে যথার্থ জ্ঞান হয় না। চিত্ত উপক্লেশ মুক্ত হলে ত্রিলক্ষণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। চিত্ত নীবরণশূন্য হয়ে নির্মল হতে থাকলে তিনি বুঝতে পারেন যে এই নামরূপ উৎপত্তি বিলয়শীল ও হেতু সমুৎপন্ন। সেই সময় অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা, প্রীতি ইত্যাদি দশটি গুণধর্ম উৎপন্ন হয়। কিন্তু যেহেতু এগুলি উৎপন্ন হলে সাধক এগুলিতে আসক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর মার্গফল লাভ হয়েছে বলে ভ্রম হয়, তাই এগুলিকে লোকোত্তর মার্গফল লাভের উপক্লেশ বা প্রতিবন্ধক বলা হয়। এগুলি থেকে মুক্ত হলে সাধক নামরূপের উদয়-ব্যয়-জ্ঞান লাভ করেন। এই দশটি বিদর্শন উপক্লেশ—

'ওভাসো-পীতি-পস্‌সদ্ধি-অধিমোক্‌খো চ পগ্গহো
সুখং-ঞাণং-উপট্‌ঠানং-উপেক্‌খা চ নিকন্তি তি।'

(১) ওভাস (অভভাস বা আলোক)—'ওভাসো'তি বিপস্‌সনোভাসো'—ধ্যান গভীর হলে সাধকের চিত্ত যখন পঞ্চনীবরণ (কামচ্ছন্দ, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, অশান্তি-অনুতাপ, সংশয়) থেকে মুক্ত হয় তখন তাঁর শরীরে আলোর আবির্ভাব হয়। যেহেতু তিনি এই আলো আগে কখনও দেখেননি, তাই ভাবনাকারীর এতে মার্গফল লাভ হয়েছে বলে ভ্রম হয়। এই আলোক দর্শনে দৃষ্টি বিভ্রম হয়, আলোর মনোহারিত্বে মানের উদয় হয় এবং আলোকস্বাদ গ্রহণে তৃষ্ণার সঞ্চার হয়। এই আলোক লৌকিক ঋদ্ধি 'তৃষ্ণাদৃষ্টি মান সম্প্রযুক্ত' বলে ধ্যানের অন্তরায় হয়।

(২) পীতি (প্রীতি)—'পীতী'তি বিপস্‌সনা পীতি'। এটি তরুণ বিদর্শনজনিত প্রীতি। আলম্বনে শঙ্কাহীন চিত্তেই প্রীতি উৎপন্ন হয়। 'প্রীতি' প্রফুল্ল স্বভাব-সম্পন্ন। এই প্রীতি সঞ্চারে সাধকের মার্গফল লাভ হয়েছে মনে হয়। প্রীতি পাঁচ প্রকার :—

(ক) খুদ্দিকা (ক্ষুদ্রিকা)—সাধক যখন পঞ্চনীবরণশূন্য উপচার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আলো দর্শন করে তখন তাঁর শরীরে রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগে। (খ) খণিকা (ক্ষণিকা)—এই প্রীতি বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। (গ) ওক্কন্তিকা (অবক্রন্তিকা)—এই প্রীতির প্রভাব চিত্তকে তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত করে। (ঘ) উব্বেগা (উদ্বেগা)—এই প্রীতি এত বলবান যে তার প্রভাবে সাধক অনেক সময় আত্মসংবরণ করতে পারে না। (ঙ) ফরণা (স্ফুরণা)—প্রীতিরস সঞ্চারিত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো সমস্ত শরীরকে কাঁপিয়ে দেয়, অবশ করে দেয়।

(৩) **পস্সদ্ধি** (প্রশ্রব্ধি বা প্রশান্তি)—"পস্সদ্ধী'তি বিপস্সনা পস্সদ্ধি"। এটি বিদর্শনজনিত প্রশান্তি। এটি চিত্তে উৎপন্ন হলে দেহের সমস্ত অস্বস্তিকর অবস্থা চলে যায়। শরীরে ও মনে কোন ব্যথা, বেদনা, ভারবোধ, কর্কশতা, অসুস্থতা ইত্যাদি কোন অস্বস্তিই আর অনুভূত হয় না। চিত্ত শান্ত হয়। প্রশান্ত মনে উদয়-ব্যয় দর্শনে সাধক প্রীতি-প্রমোদ অনুভব করেন। কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ না হলে বিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(৪) **অধিমোক্খ** (অধি + মোক্ষ = বলবতী শ্রদ্ধা)—"অধিমোক্খো'তি সদ্ধা"। বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে উৎপন্ন বলবতী শ্রদ্ধা। বিদর্শকের চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের সম্প্রসাদের কারণে এই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এর যথাযথ প্রয়োগ না হলে বিদর্শনের প্রতিবন্ধক হয়ে যায়।

(৫) **পগ্গহ** (প্রগ্রহ = বীর্য)—"পগ্গহো'তি বিরিয়ং"। প্রকৃষ্টভাবে গ্রহণের জন্য প্রগ্রহ বা বীর্য। বিদর্শন-জ্ঞান প্রযুক্ত বীর্যের প্রভাবে যোগীর নাতি দৃঢ়, নাতি শিথিল কর্মশক্তি উৎপন্ন হয়। তিনি অত্যুৎসাহে অধীর হয়ে পড়েন এবং তার ফলে এটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(৬) **সুখ**—'সুখন্তি বিপস্সনা সুখং'। তরুণ বিদর্শনজনিত সুখানুভূতিতে সাধকের সমস্ত শরীর আপ্লুত হয়ে ওঠে। প্রীতির নিত্য সহচর 'সুখ'। 'যত্থ পীতি, তত্থ সুখং'। 'প্রীতি' সংস্কার স্কন্ধ, 'সুখ' বেদনা স্কন্ধ। সুখ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দূর করে। তৃষ্ণার্ত পথিকের জল দেখে যে আনন্দ তাই প্রীতি। জল পান করে, ছায়ায় বিশ্রামে দেহ মনের যে আরাম তাই সুখ। এই সুখ বেদনাস্কন্ধের অন্তর্গত বলে পরিণামও দুঃখজনক। ইহা বিদর্শনের অন্তরায়কর।

(৭) **ঞাণ** (জ্ঞান)—"ঞাণন্তি বিপস্সনা ঞাণং'। এটি তরুণ বিদর্শনজনিত জ্ঞান। সাধকের এই জ্ঞান স্তরে নামরূপের যথার্থ দর্শন ইন্দ্র-বজ্রের মতো অতি তীক্ষ্ণও বিশদভাবে প্রকটিত হয়। অতি অল্প জ্ঞান ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ জ্ঞান দুটি বিদর্শন সাধনার অন্তরায়।

(৮) **উপট্ঠান** (উপস্থান বা স্মৃতিশীলতা)—'উপট্ঠানন্তি সতি'-স্মৃতির নামান্তর উপস্থান। পর্বতের মতো অচল, অটল, সুদৃঢ় স্মৃতি উৎপন্ন হলে এই অবিচ্ছেদ্য স্মৃতিই সংস্কারগুলি ধ্বংস করার জন্য প্রজ্ঞা উৎপন্ন করে। স্মৃতির যথাযোগ্য প্রয়োগ না জানলে এটিও বিদর্শন উপক্লেশ উৎপন্ন করে।

(৯) **উপেক্খা** (উপেক্ষা (—"উপেক্খা'তি বিপস্সনুপেক্খা চেব আবজ্জনুপেক্খা চ"। ষড়্দ্বারের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন) যে কোনটির সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শ ঘটলে, ভাবনাকারী তাতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। সংস্কার ধর্মগুলির প্রতি তাঁর কোন আসক্তিও থাকে না, আবার বিরাগও থাকে না। বিদর্শন-ভাবনা প্রভাবে উৎপন্ন মধ্যস্থভাবসূচক উপেক্ষা

ও আবর্তনোপেক্ষা এত বলবতী হয় যে সাধকের মূল কর্মস্থানের পরিহানি ঘটে অর্থাৎ তখন এই উপেক্ষা বিদর্শন উপক্লেশে পরিণত হয়।

(১০) **নিকন্তি** (নি + কান্তি = সূক্ষ্ম তৃষ্ণা)—"নিকন্তী'তি বিপস্‌সনা নিকন্তি"। উপরের উল্লিখিত নয়টি বিদর্শন ক্লেশ উৎপন্ন হলে সাধকের মনে তার প্রতি যে শান্ত ও সূক্ষ্ম অনুরাগ জন্মায় তাই নিকন্তি। এটিও বিদর্শন জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

এই উপক্লেশ গুলি তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান ভেদে ৩০টি। এগুলির প্রতি আসক্ত হয়ে সাধক তা উপভোগ করতে থাকলে তার মার্গফল লাভ অসম্ভব। উপক্লেশ ধর্মের উদ্ভবে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করতে যিনি দক্ষ, তিনিই মার্গ-অমার্গ বিচার করে সাধনায় এগিয়ে যেতে পারেন।

[দ্রষ্টব্য : বিসুদ্ধিমগ্‌গ, পি. টি. এস., ৬৩৩]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপক্কিলেস সুত্ত

পালি-নিকায়গ্রন্থে 'উপক্কিলেস সুত্ত' নামে তিনটি সুত্ত দেখা যায়। প্রথমটি মজ্ঝিম নিকায়ে (মজ্ঝিমনিকায়, ৩, ১৫২), দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অঙ্গুত্তরনিকায়ে (অঙ্গুত্তর ২, ৫৩ এবং ৩, ১৬-১৯), তৃতীয়টি দীঘনিকায়ে।

দীঘনিকায়ের উপক্কিলেস সুত্তানুসারে বিবাদপ্রিয় ও কলহানুরক্ত বিভেদপন্থী একদল ভিক্ষু পরস্পর পরুষবাক্য ব্যবহার করতেন। ভগবান্ বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষু থেকে বিষয়টি অবগত হয়ে উক্ত কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের পরস্পর কলহ থেকে নিরত হওয়ার জন্য বারম্বার উপদেশ প্রদান করেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের কথা অগ্রাহ্য করে বিবাদে লিপ্ত হন। ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁদের মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য সেই ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গাথা উচ্চারণ করেন। উক্ত গাথাগুলির বিষয় ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ক্রোধ ও বৈরতা পোষণে মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং পরস্পরের মৈত্রীভাব আবদ্ধতার দ্বারা কল্যাণময় চিন্তাই প্রকৃত সুখ বা নির্বাণ প্রাপ্তিকে সহজ করে তোলে। গাথা ভাষণান্তে ভগবান্ বুদ্ধ বালকলোণক গ্রামে আয়ুষ্মান ভগুর নিকট গমন করেন। বালকলোণক গ্রামবাসী ভগু কর্তৃক পরমযত্নে পূজিত ও সেবিত হন। ভগুকে উপদেশ দানান্তে তিনি প্রাচীনবংসদায়ে গমন করেন। যেখানে আয়ুষ্মান্ নন্দিয়, অনুরুদ্ধ ও কিমিল বাস করতেন। বনরক্ষক বুদ্ধকে প্রাচীনবংসদায়ে প্রবেশে বাধা দান করলেও অবশেষে অনুরুদ্ধের হস্তক্ষেপে বুদ্ধ তাঁদের নিবাসস্থলে প্রবেশে সক্ষম হন। অনুরুদ্ধ ও অন্যান্যরা বুদ্ধের সেবায় প্রত্যুদ্গমন করে ভগবানের পাত্রচীবর, পাদপ্রক্ষালনাদি কার্যদ্বারা সম্বর্ধিত করেন। তাঁদের ব্যবহারে প্রীত হয়ে বুদ্ধদেব অনুরুদ্ধকে সহনশীল হয়ে পরস্পরকে আহার্য প্রদান এবং বিবাদশূন্য হয়ে একাত্ম ভাবে থাকার উপদেশ দেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে তাঁরা পরস্পর বিবাদ কলহ ত্যাগ করে সহৃদয় চিত্তে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও মিলে মিশে একত্র থাকার প্রতিশ্রুতি ভগবানকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেব তাদের প্রতিশ্রুতিদানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ বুদ্ধ অনন্তর অনুরুদ্ধকে সর্বদা সত্যানুসন্ধানে তৎপর, অপ্রমত্ত ও সুসংযত থাকার উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তাঁরা সকলেই তাঁদের

জীবনচর্যায় অপ্রমত্ততা, মৈত্রীভাব অবলম্বন করে সারারাত্রিদিন ধর্মকথা শ্রবণে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। সুত্তটির অন্তিমাংশে ভগবান বুদ্ধ অনুরুদ্ধকে চিত্তের উপক্লেশ বা মালিন্য প্রহাণ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রহাণ বা বর্জনগুলি হল বিচিকিৎসা বা সন্দিগ্ধতা, থীনমিদ্ধ বা অলসতা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, স্তম্ভিতত্ব বা মূঢ়তা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, দোট্‌ঠল্ল বা মানসিক কপটতা, উৎপীড়নতা প্রভৃতি। চিত্তের এইসকল উপক্লেশ বা পাপচারিতা বর্জনের দ্বারাই চিত্তের সমাধি লাভান্তেই চিত্ত ও চৈতসিকের বিমুক্তি অর্জিত হয় এবং ফলে প্রাণীর পুনর্জন্ম আর হয় না।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অন্তর্গত (অঙ্গুত্তর ৩য়, ১৬-১৯) উপক্কিলেস সুত্তে চিত্তের ক্লেশ বা আস্রব দূরীকরণের জন্য করণীয় বিষয়টি সুন্দর উপমার সাহায্যে বিবৃত হয়েছে। তার একটি হল সোনার অলংকার তৈরী করার জন্য আগে যেমন সোনা থেকে অসার বস্তুকে বর্জন করতে হয় তদ্রূপ মন বা চিত্তকে পঞ্চনীবরণ মূলক পাপধর্ম থেকে মুক্ত করা আবশ্যক। 'পঞ্চনীবরণ' রহিত চিত্তই উচ্চতর জ্ঞান বা বোধিলাভের যোগ্য হয়। অঙ্গুত্তরনিকায়ের (২, ৫৩) দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত উপক্কিলেস সুত্তে আকর্ষণীয় উদাহরণ সহকারে প্রব্রজিত বা মুনিজনের অপবিত্রতা ও চরিত্রহানির কারণগুলি প্রদর্শিত হয়েছে ঃ

এগুলি হল মদ্যপানজনিত প্রমত্ততা, কামেন্দ্রিয়-সেবনা, অর্থগৃধ্নুতা মিথ্যাচার বা ব্যবহারিক জীবনে স্বেচ্ছাচারিতা। সূর্য চন্দ্রের কিরণ যেমন চারপ্রকার অর্থাৎ মেঘ, কুয়াশা, ধূম্রজাল ও ধূলিকণা দ্বারা আবৃত হয়ে মালিন্যযুক্ত হয় তদ্রূপ পূর্বে উল্লিখিত দোষ বা চারটি পাপ-দ্বারাই মুনি ও প্রব্রজিতের জীবন কলুষিত হয়।

গ্রন্থ তালিকা ঃ—

দীঘনিকায়-৩য়, পি. টি. এস. সংস্করণ।

অঙ্গুত্তরনিকায়, ২য়, ৩য়, পি. টি. এস. সংস্করণ।

Dictionary of Pali Proper Names vol. I.

সাধনচন্দ্র সরকার

উপঘাতক কম্ম (উপঘাতক কর্ম)

আঘাত করে বিধ্বংসী করে এই অর্থে উপঘাতক।

কৃত্যানুসারে কর্ম চার প্রকার—

(১) জনক কর্ম (২) উপত্তম্ভক (উপথম্ভক) কর্ম (৩) উপপীড়ক কর্ম (৪) উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্ম।

অন্য কর্ম ও অন্য কর্মের দ্বারা উৎপন্ন স্কন্ধ সন্ততি বা প্রবাহকে ছেদন করে যে কুশল অকুশল বিপাক চেতনা উৎপন্ন হয় তার নাম উপঘাতক। এই উপঘাতক কর্মকে উপচ্ছেদক কর্মও বলা হয়। এই কর্ম দুর্বল, কুশল-অকুশল দু-প্রকার কর্মের ফলকে বিধ্বংস করে নিজের বিপাকই প্রদান করে। অকালে অথবা আকস্মিকভাবে যে মৃত্যু ঘটে, সে মৃত্যুকে উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্মজনিত মৃত্যু বলে। আয়ু শেষ হবার আগে কর্মশক্তির বিদ্যমান কালে অর্থাৎ

আয়ু-কর্ম উভয় থাকা সত্ত্বেও কোন বিরুদ্ধ কর্মশক্তির প্রভাবে জীবনের অবসান হয়। কুশল কর্মের বিপাক দানের সময় অকুশল কর্মের বিপাক দান ও অকুশল কর্মের বিপাক দানের সময় কুশল কর্মের বিপাক দান, তাই এটিকে উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্ম বলে। অজাতশত্রু ও অঙ্গুলিমাল স্থবিরের কর্ম অকুশল উপচ্ছেদক কর্ম। উপপীড়ক কর্মের মতো এর কাজও জনক কর্মের (যে কর্ম প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম বিপাক স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক, কুশলাকুশল চেতনামূলক, তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল) বিপাককে বাধা দেওয়া। উপঘাতক কর্ম, উপপীড়ক কর্মের মতো এর বিপরীত জাতীয় কর্মকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু উপপীড়ক কর্মের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এটি উপপীড়ক কর্মের মতো শুধু বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, জনক কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে ফল উৎপন্ন করা এর কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ কোন ব্যক্তি জনক কর্মের প্রভাবে কোন ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। সম্পদশালী হয়ে সুখসম্পদ ভোগ করা উপত্থম্ভক কর্মের প্রভাব। ধনহানি জনিত যে দুঃখ দুর্দশাভোগ তা উপপীড়ক কর্মের প্রভাব। সব ধননাশ, জীবননাশ উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্মের প্রভাব।

[দ্রষ্টব্য ঃ অভিধম্মত্থসংগহ—পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপচার সমাধি

'উপচার' শব্দটির অর্থ সমীপে, নিকটে, কাছাকাছি। সমাধির নিকটে এই অর্থে 'উপচার সমাধি'। সমাধি অর্থে একাগ্রতা। একাগ্রচিত্তে আলম্বনে নিবিষ্ট থাকাই সমাধি। বিশুদ্ধিমার্গে বলা হয়েছে 'সমাধানট্‌ঠেন সমাধি' অর্থাৎ সমাধান এই অর্থে সমাধি। এখানে নিষ্পত্তি অর্থে 'সমাধি' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাধিচর্চাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় ভাবনা। চিত্তের নীবরণাদি স্থূল অকুশল বৃত্তির শান্ত অবস্থার নাম 'সমথ'। এটি চিত্তের একাগ্রতা প্রসূত। এই অবস্থার উৎপাদন ও বর্ধনের নাম 'সমথ ভাবনা' বা 'সমাধি ভাবনা'।

স্তরভেদে সমাধি তিন প্রকার। পরিকম্ম, উপচার ও অর্পণা সমাধি। কর্মস্থানের প্রারম্ভের সমাধিকে 'পরিকম্ম সমাধি' আর ধ্যান প্রাপ্তিকে 'অর্পণা সমাধি' বলা হয়। উপচার ক্ষেত্রে বা ধ্যানচিত্তলাভের আসন্ন অবস্থায় সাময়িকভাবে কাম (কামচ্ছন্দ), হিংসা (ব্যাপাদ), আলস্য-তন্দ্রা (থীন-মিদ্ধ), অশান্তি-অনুতাপ (উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ) ও সংশয় (বিচিকিচ্ছা), এই পঞ্চনীবরণ বা ধ্যানের বাধা অপসারিত হলে 'উপচার সমাধি' উৎপন্ন হয়। অর্পণা সমাধির কাছাকাছি বলে একে উপচার সমাধি বলে। এই সমাধিতে ছয় ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির আলম্বনে চিত্ত নিবিষ্ট থাকে। অন্য দ্বারগুলিতে কোন আলম্বন এলে তা বুঝতে পারলেও সেদিকে মন আকৃষ্ট হয় না। অনুস্মৃতিস্থানের অর্থাৎ বুদ্ধকে অবলম্বন করে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মকে অবলম্বন করে ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘকে অবলম্বন করে সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলকে অবলম্বন করে শীলানুস্মৃতি, ত্যাগ অবলম্বনে ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতাকে অবলম্বনে দেবতানুস্মৃতি, মরণ অবলম্বনে মরণানুস্মৃতি, উপশম অর্থাৎ নির্বাণকে অবলম্বন করে উপশমানুস্মৃতি এবং চার ধাতু (পৃথিবী, আপ, তেজ,

বায়ু) ব্যবস্থাপনের দ্বারা লব্ধ চিত্তের একাগ্রতা ও অর্পণা সমাধির পূর্বভাগে যে একাগ্রতা তা উপচার সমাধি। দশটি অনুস্মৃতি ভাবনার মধ্যে উপরে উল্লিখিত আটটি বাদে আর দুটি অনুস্মৃতি 'কায়গতানুস্মৃতি' ও 'আনাপানস্মৃতি'তে অর্পণা ধ্যান লাভ হয়। উপচার সমাধিতে যে ধ্যান হয়, তা নিশ্চল নয়, শিশুর মত অস্থির ও দুর্বল। চিত্ত কখনও নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং কখনও ভবাঙ্গে পড়ে যায়। এই সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা এই পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ দুর্বলভাবে উৎপন্ন হয়। এটি কামাবচর সমাধি। এর দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি লাভ হয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ— বিসুদ্ধিমগ্গ ৪/৩২, ৩৩, ৭/১-১২৮, ৮/১-২৫১]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপচ্ছেদক কর্ম—উপঘাতক কর্ম দ্রষ্টব্য

শুভ্রা বড়ুয়া

উপথম্ভক (উপস্তম্ভক = উপ + স্তম্ভক) কম্ম

যে কর্ম 'স্তম্ভের মতো দৃঢ় করে', সাহায্য করে এই অর্থে উপথম্ভক বা উপস্তম্ভক কর্ম।

কৃত্য অনুসারে কর্ম চার প্রকার ঃ—

(১) জনক কম্ম (২) উপথম্ভক কম্ম (৩) উপপীড়ক কম্ম (৪) উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কম্ম।

অন্য কর্ম ও অন্য কর্মের দ্বারা উৎপন্ন স্কন্ধ প্রবাহ বা সন্ততির সাহায্যকারী কুশলাকুশল চেতনাকে উপথম্ভক বা উপস্তম্ভক কর্ম বলে। এই কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে, পরিপোষণ করে, যেন এটি ফল প্রদান করতে পারে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে জনককর্ম প্রভাবে, বেঁচে থাকে উপস্তম্ভক কর্ম প্রভাবে। উপস্তম্ভক কর্ম বর্তমান জীবনের কর্ম ভব। এটি কুশল অকুশল উভয় কর্মেই ফল প্রদান করে। জীব কুশল কর্মের প্রভাবে সুখময় জীবনযাপন করে এবং সেই জীবনে আবার কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পূর্বের কৃত কুশল কর্মকে উপস্তম্ভিত অর্থাৎ দৃঢ় করে। তার দ্বারা সে বহু বছর সুগতিতে সুখে অবস্থান করে। কিন্তু অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে জীব দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করে, সেখানেও বার বার অকুশল কর্ম সম্পাদন করে পূর্বকৃত অকুশলকে আরও শক্তিশালী করে বহু সহস্র বছর চার অপায় (পশুযোনি, প্রেতযোনি, অসুরযোনি, নরক) দুঃখ ভোগ করে থাকে। কুশলপক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম সমস্ত বাধা দূর করে এবং অকুশলপক্ষীয় উপস্তম্ভক কর্ম বহু দুঃখবিপাক নিয়ে আসে। উপপীড়ক ও উপঘাতক কর্মের মতো উপস্তম্ভক কর্মও মানুষের জীবনের সক্রিয় অংশ, এটি জবন-স্থানেই সম্পাদিত হয়। এই সক্রিয় অংশ অতীত-সংস্কারের প্রভাবে যেমন বলবান, দুর্বল বা ধ্বংস হয়, তেমনি বর্তমান কর্মভবের প্রভাবেও বলবান, দুর্বল বা ধ্বংস হয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ— অভিধম্মত্থসংগহ—পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপধি (উপাধি)

এই শব্দটির অর্থ 'মূল উপাদান'। কাম উপাদানাদির দ্বারা গৃহীত হয় বলে পঞ্চস্কন্ধের অন্য নাম উপধি। (উপাদিয়তি কম্মুনা তি উপাধি। কিং তং? খন্ধপঞ্চকং)। উপধি চার প্রকার :— (১) স্কন্ধ উপধি (খন্ধ উপধি), (২) ক্লেশ উপধি (কিলেস উপধি), (৩) কর্ম উপধি (কম্ম উপধি) (৪) কাম উপধি। উপধিহীন অর্থাৎ স্কন্ধ, ক্লেশ, কর্ম ও কাম থেকে মুক্ত। সউপধিশেষ ও অনুপধিশেষ পর্যায়ক্রমে নির্বাণ দুভাবে হয়। এই উপধি অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ অবশেষ থাকা অবস্থায় কর্মক্লেশের যে নিরোধ হয়, তাই সোপধিশেষ নির্বাণ। আর জীবন্মুক্তের মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের যে নিঃশেষ নিরোধ হয় তা অনুপধিশেষ নির্বাণ। 'সোপধিশেষ নির্বাণ ধাতু' বুদ্ধের ও অর্হতের চ্যুতির পূর্বের অবস্থা এবং 'অনুপধিশেষ নির্বাণ ধাতু' চ্যুতির পরের অবস্থা। প্রথম অবস্থা জীবদ্দশায় ক্লেশের নির্বাণ, পরের অবস্থা স্কন্ধের নির্বাণ। গয়ার বোধিমূলে সাধনায় সিদ্ধিলাভের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের 'সোপধিশেষ নির্বাণ' হয়, আর আশি বছর বয়সে কুশিনগরে মল্লরাজের শালবনে যে মহাপরিনির্বাণ হয় তা অনুপধিশেষ নির্বাণ।

[দ্রষ্টব্য : অভিধর্মার্থসংগ্রহ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপনন্দ'

বৌদ্ধ সাহিত্যে উপনন্দ জনৈক স্থবির ভিক্ষুরূপে বর্ণিত। তিনি প্রাক্-ভিক্ষু-জীবনে শাক্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। উপনন্দ ভিক্ষুর চরিত্রটি একটি লোভী, স্বার্থপরায়ণ ও খল ভিক্ষুরূপে চিত্রিত। পালি বিনয়পিটক, জাতক, সমন্তপাসাদিকা পপঞ্চসূদনী, বিসুদ্ধিমগ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্র তিনি চতুর ও নীচমনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি রূপে বর্ণিত।

বিনয়পিটক গ্রন্থে উপনন্দের অশালীনতা, চাতুরী ও কপটতার কথা বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্ট (বিনয়পিটক, ১, ১৫৩ ; ১, ৩০০ ; ২,১৬৫, ১৬৮ ; ৩,২৩৬, ২৪০, ২৫৪ ; ৪,৩০, ৯২, ৯৪-৯৭, ৯৯)

বিনয়পিটকের মহাবগ্গে (১,১৫৩) বর্ণিত যে তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট বর্ষাবাস যাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও লোভবশতঃ দুটি বিহারাবাসে বর্ষাবাসকালীন চীবর ও খাদ্যের অতিরিক্ত সম্ভার নিয়ে রাজা প্রসেনজিতকে পরিত্যাগ করে অন্যাবাসে গমন করেন। প্রসেনজিৎ তার ঐ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। উপনন্দের এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা ভগবান বুদ্ধেরও কর্ণগোচর হয়। উপনন্দের ব্যবহারে রুষ্ট গৌতম বুদ্ধ বিনয়ের বিশেষ বিধি প্রবর্তন করেন—এই বিধির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় যে বর্ষাবাসকালীন অবস্থায় প্রদত্ত কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ শাস্তিযোগ্য হবেন।

মহাবগ্গের উপনন্দসক্যবত্থু (পৃঃ ৩০০) অংশে এই উপনন্দই সাবত্থীতে (শ্রাবস্তী) এক সময় বর্ষাবাস যাপন সুরু করেন কিন্তু 'কঠিন' উৎসবে চীবর-বণ্টনকালে তিনি অন্য গ্রামে গিয়েও সেখানে নিজের চীবরের অংশ পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। ভগবান বুদ্ধ এই কথা শুনে সাংঘিক নিয়ম ভঙ্গের জন্য তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। তবুও তিনি একাধিক চীবরের

লাভের আশায় বর্ষাবাস দুটি বিহারেই কাটান। বুদ্ধ তখন তাঁকে কেবল একটি বিহার থেকেই বর্ষাকালীন চীবর সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করেন।

উপনন্দের এই লোলুপতা কেবলমাত্র চীবর-সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। চুল্লবগ্গে (পৃঃ ১৬৫) দেখা যায় যে আজীবিকসম্প্রদায়ের জনৈক ভক্ত মহামাত্য পিণ্ডপাত দানের ব্যবস্থা করলে তিনি পিণ্ডপাতপ্রদানস্থানে বিলম্বে গমন করেও খাদ্যগ্রহণের অনবকাশ সত্ত্বেও এক তরুণ ভিক্ষুকে বঞ্চিত করে তিনি পিণ্ডপাত বা ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেব এই ঘটনা শুনে বিনয়ের বিশেষ বিধি প্রবর্তন করেন যার ফলে কোন ভিক্ষুকে অন্যায়ভাবে আসনচ্যুত করে পিণ্ড বা ভিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়। অন্যত্র দেখা যায় যে উপনন্দ শ্রাবস্তীর একই প্রদেশে বিনয়বিধিভঙ্গ করে বসবাস করার সুযোগ গ্রহণ করেন। ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করতে তিনি সদাই তৎপর থাকতেন।

চুল্লবগ্গে মণিচূড়কগামনীকথায় উপনন্দের আর একটি চারিত্রিক দোষের কথা বিবৃত রয়েছে। উপনন্দ অর্থ লোভাতুরও ছিলেন। ভিক্ষুগণের স্বর্ণ রৌপ্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও তিনি উপাসক বা ভক্তদের নিকট স্বহস্তে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি গ্রহণ করতেন। ভগবান্ বুদ্ধ উপনন্দের এই নিন্দিত কার্যটি অবগত হলে শ্রমণগণকর্তৃক জাতরূপরজত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ প্রবর্তন করেন। বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৬) উপনন্দ কর্তৃক কার্যাপণ (কহাপন) অর্জনের লোলুপতার কথা বিবৃত। উপনন্দ কোন গৃহস্থের বাড়ীতে নিত্য ভোজন করতেন। একদিন তাঁর জন্য গৃহস্থটি মাংস রন্ধন করেন। কিন্তু গৃহস্থের এক শিশু পুত্র সেই মাংস খাওয়ার জন্য রোদন করায় গৃহস্থটি শিশুকে উপনন্দের জন্য প্রস্তুত মাংস শিশুটিকে দেন। উপনন্দ গৃহস্থের ঐ ব্যবহারের ক্ষুব্ধ হয়ে মাংসের পরিবর্তে 'কহাপন' দাবী করেন।

উপনন্দের আরও একটি লুব্ধতার কাহিনী বিনয়-পারাজিকায় উল্লিখিত। কোন এক সময়ে উপনন্দ ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে জেতবনে সমাগত জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। ধর্মশ্রবণে প্রীত হয়ে জনৈক শ্রেষ্ঠী উপনন্দকে কিছু উপঢৌকন দেবার অভিপ্রায় নিবেদন করলে উপনন্দ বণিককর্তৃক পরিহিত সুদৃশ্য বসনটিই প্রার্থনা করেন। বণিক্ তাঁর পরিহিত বস্ত্র থেকে অধিকতর মূল্যবান্ অনুরূপ বস্ত্র প্রদানের অঙ্গীকার করলেও উপনন্দ বণিক্ পরিহিত বস্ত্রটিই পাইবার জন্য বারম্বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরুপায় হয়ে বণিক্ তাঁর পরিহিত বস্ত্রটি প্রদান করে উপনন্দকে নিরস্ত করেন। এ ছাড়াও নানা প্রকারে নির্লজ্জভাবে তাঁর বস্ত্র আদায়ের কাহিনীর কথা পারাজিকায় (পৃঃ ২১৫, ২৪) উল্লিখিত।

বিনয়-পাচিত্তিয়া বিভাগের 'উপনন্দ-হৃত্থিয়-ভণ্ডন-বত্থু'-তে বৌদ্ধসংঘের নিন্দিত ছব্বগীয় ভিক্ষুদের সঙ্গেও উপনন্দের কলহপরায়ণতার কথা বর্ণিত রয়েছে।

পাচিত্তিয়ায় (৩০ সংখ্যক) আরও বর্ণিত যে তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যলাভের বণ্টনেও তাঁর সহযোগী ভিক্ষুগণের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন।

উপনন্দ শুধুমাত্র অর্থ ও দ্রব্য লাভের জন্য লুব্ধ ছিলেন না ; তিনি ব্রহ্মচর্য বা শীলাচরণেও উদাসীন ছিলেন। বিনয়পিটকের পাচিত্তিয় অংশে (বিনয় পিটক ৪/১৪-১৭, ১২১, ১২৭, ১৬৮)

বিবৃত যে তিনি প্রায়ই তাঁর পরিচিত কুটুম্বিকের শয়নকক্ষে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অবাধে এবং অশোভনভাবে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি গৃহস্বামীকে ঘর থেকে বাইরে পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করতেন। ভগবান বুদ্ধের এই ঘটনাটি কর্ণগোচর হলে তিনি উপনন্দকে তিরস্কার করে দোষী সাব্যস্ত করেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা বা সঙ্গোপনে বসার সুযোগ ছাড়তেন না। এত দোষে দুষ্ট থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের নিকট তিনি প্রিয়ই ছিলেন। ভোজ্যদ্রব্য বন্টন কালে বা সংঘে প্রেরণ কালে পিণ্ড বা অন্নদাতারা উপনন্দকে গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতেন (বিনয় পিটক, ৪,৯৮)।

বিনয়পিটক ব্যতীত উপনন্দের অপকীর্তির কথা দত্তপুপ্ফ ও সমুদ্দজাতকে বর্ণিত। দত্তপুপ্ফ (জাতক, ৩,৩৩২) থেকে জানা যায় যে জনসাধারণকে শীলচর্চা এবং জাগতিক লাভে অল্পে সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দিতেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তাঁদের দ্বারা পরিত্যক্ত মূল্যবান বস্ত্র ও বস্তুসমূহ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। মহামূল্য কম্বল লাভের জন্য তিনি তার সহবাসী ভিক্ষুকেও বঞ্চিত করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তাঁর এই দুর্ব্যবহারের কথা ভগবান্ বুদ্ধ অতীতবস্তুর কাহিনীর দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন শ্রোতৃবর্গকে।

সমুদ্দজাতকের (২,৪৪১), প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে উপনন্দ খাদ্য-পানীয়-লোভাতুর ব্যক্তি রূপেও চিত্রিত। বিবিধ বস্তুলাভের লোভই বহু ভিক্ষুকে তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে নিজে শকটভর্তি দ্রব্য নিয়ে ফিরতেন। ভগবান বুদ্ধ উপনন্দের এই দুর্ব্যবহারকে নিন্দা করে সমুদ্দজাতকের অতীতবস্তুটি উল্লেখ করেন। ঐ কাহিনীতে আছে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক জল-দেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। উপনন্দ তখন জল-বায়স (Water-Crow) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন সকল প্রাণীকে জলপানে বিরত থাকতে বলতেন। অবশেষে লুব্ধ বায়সকে জলদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব ভয় দেখিয়ে জলক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর টীকাগ্রন্থে উপনন্দকে 'লোলজাতিক' বলে বিশেষিত করেছেন। তিনি অন্যান্য শাক্যগণ কর্তৃক তাঁর লোলুপতার জন্য অত্যন্ত নিন্দিত ও ঘৃণিত ছিলেন (সমন্তপাসাদিকা ৩,৬৬৫)। মনোরথপূরণী (১,৯২) পপঞ্চসূদনী (১,৩৪৮), বিসুদ্ধিমগ্গ (১,৮১) গ্রন্থ সমূহে সর্বত্র উপদেশ ও আচরণের পার্থক্যের কথা বিবৃত হয়েছে একাধিকবার, তবে তিনি তাঁর চাতুরীদ্বারা কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারেন নি।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপনন্দ[২]

পালি অপদান গ্রন্থের (অপদান ১,২০১) বিবরণানুযায়ী তিনি ৫৭ কল্প পূর্বে এক রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিন্দুকদায়ক স্থবিরের পূর্বজীবন-ই তাঁর ঐ নরপতিরূপ গ্রহণ বলে অপদান গ্রন্থে বর্ণিত।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপনন্দ*

উপনন্দ ছিলেন চারজন প্রত্যেক বুদ্ধের অন্যতম। মজ্ঝিমনিকায়ের (৩,৭০) ইসিগিলি সুত্তে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপনন্দ*

মধ্যম নিকায়ের (মজ্ঝিম-নিকায়, ৩) গোপকমোগ্গল্লানসুত্তে উপনন্দকে মগধরাজের সেনাধ্যক্ষ রূপে বলা হয়েছে। আনন্দ এবং বস্‌সকারের মধ্যে কথোপকথনের সময় তিনি উপস্থিত সাক্ষী ছিলেন বলে গোপকমোগ্গল্লান সুত্তে বর্ণিত।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপনিস্সয় পচ্চয় (উপনিশ্রয় প্রত্যয়)

উপ + নিস্সয় অর্থাৎ প্রধান উপায় বা কারণ। অভিধম্মপিটকের সপ্তম গ্রন্থ পট্‌ঠানের 'পচ্চয় নিদ্দেস' অংশে উল্লিখিত চব্বিশটি প্রত্যয়ের মধ্যে এটি নবম। পট্‌ঠান অর্থ প্রধান কারণ, প্রকৃত কারণ, 'প্রত্যয়' অর্থও কারণ, হেতু, নিদান, সাহায্যকারী ইত্যাদি।

নিশ্রয় ও আশ্রয় একার্থবোধক শব্দ। যেমন জল মাছের নিশ্রয়। এবং বলবান নিশ্রয়ই 'উপনিশ্রয়'। 'উপ' উপসর্গের সংযোগ করে 'প্রধান উপায়', 'বলবান কারণ' বোঝানো হয়েছে। উপনিশ্রয় প্রত্যয় ৩টি :—

(১) আরম্মণূপনিস্সয় (আলম্বন উপনিশ্রয়)—'তথ আরম্মণমেব গরুকতং আরম্মণূপনিস্সয়ো'। আলম্বনের গুরুত্ব বুঝে যখন এটি গ্রহণ করা হয়, তখন এটিকে আলম্বন উপনিশ্রয় বলে। দান, শীল, ভাবনাদি সম্পাদনের পর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ সব কাজ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। এই প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম, এর প্রত্যয় সেই দান, শীল, ভাবনাদি আলম্বন। এই অর্থে এরা আলম্বন উপনিশ্রয়।

(২) অনন্তরূপনিস্সয় (অনন্তর উপনিশ্রয়)—'অনন্তরনিরুদ্ধা চিত্তচেতসিকা ধম্মা অনন্তরূপনিস্সয়া'। এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিকই অনন্তরূপনিশ্রয়। কোন এক চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে গেলে, তার অবিচ্ছেদে অন্য এক চিত্ত উৎপন্ন হয়। পূর্বের নিরুদ্ধ চিত্তটি অনন্তর প্রত্যয় ধর্ম এবং পরবর্তী উৎপন্ন চিত্তটি প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম এবং এদের মধ্যে সম্বন্ধ মা ও সন্তানের সম্বন্ধের মতো। এই অনন্তর সম্বন্ধ একই বীথিস্থ চিত্তসমূহের মধ্যে, অথবা বীথিতে ভবাঙ্গে, কিংবা ভবাঙ্গে-বীথিতে বা চ্যুতি প্রতিসন্ধি চিত্তে।

(৩) পকতূপনিস্সয়ো (প্রকৃতি-উপনিশ্রয়)—'রাগাদয়ো পন ধম্মা, সদ্ধাদয়ো চ, সুখং, দুক্খং, পুগ্‌গলো, ভোজনং, উতু, সেনাসনঞ্চ যথারহং বহিদ্ধা কুসলাদি ধম্মানং, কম্মং বিপাকানং তি বহুধা হোতি পকতূপনিস্সয়ো।' রাগাদি, শ্রদ্ধাদি, সুখ, দুঃখ, পুদ্‌গল, আহার, ঋতু, শয্যাসন ইত্যাদি যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক সমস্তই কুশলাদি ধর্মের প্রকৃতি-

উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। কর্মও এর বিপাকের প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। এইভাবে প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বহুপ্রকারের।

প্রাকৃতিক উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের প্রভাব দূরবর্তী চিত্ত-বীথিতেও উৎপন্ন হয়। যেমন বহু বছর আগে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্ম সম্পাদনের স্মৃতি জাগলে সেই স্মৃতিকে উপনিশ্রয় করে আবার অন্য কোন স্থানে দান, শীল ভাবনাদি কুশল কর্ম করা হল। সেক্ষেত্রে এটি উপনিশ্রয় প্রত্যয়, অনন্তর প্রত্যয় নয়, কারণ এই দুটি পৃথক সময়ে কর্ম এবং পূর্বের সময়ের স্মৃতিকে আশ্রয় করে পরেরটি সম্পন্ন হয়েছে। আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক হিসাবে বিচার করতে গেলে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং লোভ-দ্বেষাদি, শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞাদির সঙ্গে সম্পর্কিত উপনিশ্রয় প্রত্যয় আধ্যাত্মিক। বহিরায়তন, পুদ্গল, ঋতু, আহারাদির সঙ্গে সম্পর্কিত উপনিশ্রয় প্রত্যয় বাহ্যিক। উপনিশ্রয় প্রত্যয় হয় কর্মে কর্মে, কর্মে বিপাকে, বিপাকে কর্মে, কালান্তরে ও ভবান্তরে। কালানুসারে বিচার করতে গেলে উপনিশ্রয় প্রত্যয় ত্রৈকালিক ও কাল বিমুক্ত আলম্বন গ্রহণ করে। নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি (মনের ধারণা, অনুমান, সর্ববিদিত বিশ্বাস) কাল বিমুক্ত। ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমানের নিজের ও পরের ৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ প্রকার রূপ, নির্বাণ প্রজ্ঞপ্তি এই সমস্তই প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় ধর্ম। এরা আলাদা আলাদাভাবে, অবস্থানুসারে বর্তমানকালীয় সবরকম চিত্ত-চৈতসিকের প্রত্যয় হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ক্লেশচক্র। সংস্কার, ভব কর্মচক্র। বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা—এইগুলি উৎপত্তি বা বিপাকচক্র। ক্লেশচক্র কর্মচক্রের উপনিশ্রয় প্রত্যয়, কর্মচক্র বিপাকচক্রের উপনিশ্রয় প্রত্যয় এবং এগুলি প্রত্যয়াকারে প্রবর্তিত হচ্ছে। এই চক্র প্রবর্তনের বিরাম নেই, অন্ত নেই।

[দ্রষ্টব্য :— অভিধম্মত্থসংগহ ৮/১২-১৬]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপপজ্জবেদনীয় কম্ম (উপপদ্য বেদনীয় কর্ম)

অর্থাৎ পরবর্তী জন্মে ফল প্রদানকারী কর্ম।

ফল প্রদানের কাল অনুসারে কর্ম চার প্রকার :—

(১) দিট্ঠধম্মবেদনীয় কম্ম (দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম)

(২) উপপজ্জবেদনীয় কম্ম (উপপদ্যবেদনীয় কর্ম)

(৩) অপরাপরিয়বেদনীয় কম্ম (অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম)

(৪) অহোসি কম্ম (ভূতপূর্ব কর্ম)

উপপজ্জবেদনীয় কর্ম ঠিক পরবর্তী জীবনে ফল প্রদানকারী কর্ম। এই কর্ম বিরুদ্ধ কোন কর্মের প্রভাবে বাধা পেয়ে ঠিক পরবর্তী জীবনে ফলদান করতে না পারলে তা ভূতপূর্ব কর্মে বা অহোসি কর্মে (যে কর্মের ফল প্রদানকারী শক্তি এক সময় ছিল, কিন্তু এখন আর নেই) পরিণত হয়। যখন এই কর্ম ফলদান করে তখন জনক কর্ম (যে কর্ম প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম বিপাকস্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক, কুশলাকুশল চেতনা মূলক, তাই জনক কর্ম) রূপে ফল দান করে।

সপ্তম জাবনিক চেতনাকে উপপজ্জবেদনীয় কর্ম বলে। এটি কুশলপক্ষে অষ্ট সমাপত্তি (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ধ্যানলাভী, আকাশানন্তায়তনলাভী, বিজ্ঞানানন্তায়তনলাভী, আকিঞ্চন্যায়তনলাভী, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনলাভী) আর অকুশলপক্ষে পাঁচ আনন্তরিক কর্মবশে (মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ-হত্যা, বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তপাত ও আর্যসঙ্ঘভেদ এই পাঁচপ্রকার কর্মকে আনন্তরিক কর্ম বলে—অন্তর বা ফাঁক নেই, এই অর্থেই অনন্তর) অব্যবহিত পরজন্মে ফল প্রদান করে। অষ্ট সমাপত্তিলাভীকে এক সমাপত্তিই ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন করে, আর সাত সমাপত্তি ফলদানে অসমর্থ হয়ে অহোসি বা বন্ধ্যা হয়ে যায়। দেবদত্ত সংঘভেদ ও বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তপাত, আন্তরিক কর্ম দুটির একটির ফলেই নরকে পতিত হয়েছিল এবং অন্যটা অহোসি কর্মে পরিণত হয়েছিল।

'গুরু কর্ম', 'মরণাসন্ন কর্ম' ও রোজকার জীবনে নিয়মিতভাবে করা 'আচরিত কর্ম এই জীবনের কর্ম। এই তিনশ্রেণীর কর্ম ছাড়া যে কুশলাকুশল কর্ম এই জীবনে এবং অতীত জীবন-পরম্পরায় সম্পন্ন হয়ে থাকে তা 'কৃতত্ত কর্ম' বা 'উপচিত কর্ম'। গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্মের বিপাক উপপজ্জবেদনীয় কর্ম। কিন্তু উপচিত কর্মের বিপাক অপরাপরিয়বেদনীয় কর্ম এবং উপপজ্জবেদনীয় কর্ম। উপচিত কর্ম গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্ম তিনটি থেকে অল্প শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু এর সংখ্যাধিক্যের জন্য এটি সবচেয়ে ফলবান কর্ম গঠন করে।

[দ্রষ্টব্য : অভিধম্মত্থসংগহ—পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপচালা[১]

পালি থেরীগাথায়, থেরীগাথা অট্‌ঠকথায় এবং সংযুক্তনিকায়ে (১ম খণ্ড ১৩৩) উপচালার কথা বর্ণিত। ভগবান গৌতম বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের ভগিনী ছিলেন উপচালা। সারিপুত্রের অন্য দুটি ভগিনী ছিলেন চালা ও শিশূপচালা। গৃহত্যাগ করে সারিপুত্র বৌদ্ধ সংঘে প্রব্রজিত হওয়ার কালে উপচালা, চালা এবং শিশূপচালা এই তিন ভগিনীও গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীসংঘে প্রব্রজিত হন। এক সময় উপচালা অন্ধবনে নিদ্রার জন্য বিশ্রাম গ্রহণকালে মার তার কামেন্দ্রিয় উদ্রেক করার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন কিন্তু মারের ঐ হীন প্রচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট ও ব্যর্থ হয়। উপচালা ধ্যান ও শীলসাধনার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন। মারের সঙ্গে উপচালার আলাপচারিতা থেরীগাথায় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপচালা[২]

বুদ্ধবংসে (১৯/২০) ও জাতক (১,৪১) গ্রন্থে উপচালা নামক ফুস্স বুদ্ধের এক শিষ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধবংসের টীকাগ্রন্থে ইহার নাম উপসালা রূপে বর্ণিত। তাঁর অপর ভগিনীর নাম ছিল সালা। কিন্তু মূলগ্রন্থ অর্থাৎ বুদ্ধবংসে উহারা চালা ও উপচালা রূপে বর্ণিত।

থেরীগাথা, পি. টি. এস. সংস্করণ ; জাতক—১ পি. টি. এস. সংস্করণ ; সংযুক্ত নিকায়, ১, পি. টি. এস. সংস্করণ।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপবাণ[১]

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্থবিরগণের অন্যতম উপবাণ স্থবির। প্রাক্ ভিক্ষু-জীবনে শ্রাবস্তীর এক অর্থশালী ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক ভগবান্ গৌতমবুদ্ধকে জেতবন উৎসর্গ করার সময় গৌতমবুদ্ধের মহিমা দেখে অভিভূত হন এবং পরে বৌদ্ধ সংঘে প্রব্রজিত হয়ে ক্রমে অর্হত্ব লাভ এবং ষড়বিধ অঞ্ঞা বা বিশেষ পরিপূর্ণ বিদর্শন জ্ঞান লাভ করেন উপবাণ। বুদ্ধশিষ্য আনন্দের আগে বুদ্ধের সেবক (উপট্‌ঠাপক) রূপে নিযুক্ত হয়ে বুদ্ধের দেখাশুনোর ভার গ্রহণ করেন। একদা ভগবান বুদ্ধ পেশী-সংকোচন রোগে আক্রান্ত হলে উপবাণ তাঁর উপাসকবন্ধু দেবহিতের সহায়তায় বুদ্ধকে উষ্ণ জল সেচন ও বিবিধ ঔষধ দিয়ে সেবা করে রোগের উপশম ঘটান। ভগবান্ বুদ্ধ উপবাণের ওই বদান্যতার জন্য উপবাণের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। থেরগাথা অট্‌ঠকথা (১,৩০৮), সংযুক্ত নিকায় (১,১৭৪) এবং ধম্মপদ অট্‌ঠকথায় (৪,৩৩২) বুদ্ধের এই অসুস্থতার কথা সবিস্তারে উল্লিখিত।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় মহাপরিনির্বাণ গ্রহণ শয্যায় বীজন হাতে সেবারতের বিষয়টি তৎকালীন বৌদ্ধশিল্প ও ভাস্কর্যে বিধৃত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ গ্রহণকালে দেবতাগণ সমবেত হয়ে শূন্যে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধশরীর দর্শনে তাঁদের দৃষ্টিপথে উপবাণ বাধা হলে ভগবান্ উপবাণকে স্থানান্তরে যাওয়ার নির্দ্দেশ দেন। [দীঘনিকায় (২, ১৩৮) সংযুক্ত নিকায় (২, ৪১-৪২) ও (৪, ৪১)] উক্ত যে উপবাণ দুঃখের উৎস এবং সন্দিট্‌ঠিক ধম্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করেন। কৌশম্বী নগরের ঘোষিতারামে থাকার সময় সারিপুত্তের (শারিপুত্র) সঙ্গে উপবাণের বোধ্যঙ্গ (বোজ্ঝঙ্গ) সমূহের স্বভাব ও প্রকৃতি বিষয়ে কথোপকথন হয় (সংযুক্তনিকায় ৪,৪১ ; ৫,৭৬)। আবার অঙ্গুত্তর নিকায়ে (২,৬৩) সারিপুত্তের সঙ্গে উপবাণের বৌদ্ধধর্মের 'অন্তকর' বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। অঙ্গুত্তরনিকায় (৩,১৯৫) গ্রন্থে কালুদায়ীর সঙ্গে সারিপুত্তের বাদানুবাদ বিবৃত। উপবাণই তখন ভগবান বুদ্ধের অভিমতানুসারে সারিপুত্তকে সমর্থন করতে স্বীকৃত হন। উক্তদিন সন্ধ্যাবেলায় বস্তুর পাঁচপ্রকার গুণধর্ম বিষয়ে ধর্মোপদেশ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর পঞ্চধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যা শুনে ভগবান্ বুদ্ধও তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পদ্মোত্তর বুদ্ধের শাসনে উপবাণ এক দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় জনসাধারণকে বৌদ্ধ স্তূপ বন্দনা করতে দেখে তিনি বিশেষভাবে অভিভূত হন এবং তাঁর পরিহিত উত্তরীয়টি স্তূপের উপরিদেশে পতাকা রূপে স্থাপন করেন। ঐ স্তূপ চৈত্যের রক্ষণকারী অধিদেবতা অভিসম্মত নামক যক্ষ অদৃশ্য থেকে উপবাণ প্রদত্ত উত্তরীয়টি চৈত্যটির চারিদিকে তিনবার প্রদর্শন করান।

কিংবদন্তী অনুযায়ী ত্রিশহাজার কল্পযুগ ধরে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অশীতিবার দেবরাজ হন। সহস্রবার তিনি চক্রবর্তী নৃপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অন্তিমজীবনে তিনি অশীতিক্রোড় মুদ্রার অধিপতি হন। উপবাণের কথা তিনটি উপবাণ সুত্ত থেকে জানা যায়।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপবাণ²

পালি ত্রিপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত বুদ্ধবংস গ্রন্থে অন্যতম পূর্বতন বুদ্ধ অণোমদস্সীর পুত্র ছিলেন উপবাণ (বুদ্ধবংসে ৮,১৯)।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপসম্পদা

বৌদ্ধ সঙেঘ প্রবেশের দুটি ধাপ—প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা। বৌদ্ধদের কাছে এই দুটি অতি শুভ মঙ্গলকর্ম। বৌদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সঙেঘ যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে 'এস ভিক্ষু' (এহি ভিক্খু উপসম্পদা) বলে সঙ্ঘভুক্ত করে নেওয়া হত। সঙেঘ প্রবেশের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছিল।

সঙেঘ প্রথম প্রবেশের নাম 'প্রব্রজ্যা'। সাত বছরের আগে কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারে না। প্রব্রজিতকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'শ্রমণ' বলা হয়। শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হবার যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাকে 'উপসম্পদা' বলে। কুড়ি বছরের আগে কেউ উপসম্পদা লাভ করতে পারে না। উপসম্পদা লাভের পর তিনি পূর্ণ ভিক্ষুত্ব ও সঙেঘর সব অধিকার লাভ করেন। উপাধ্যায় না থাকলে কোন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দেওয়া হয় না। উপসম্পদা গ্রহণ প্রার্থী ব্যক্তি মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য আটটি প্রয়োজনীয় জিনিস (সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূঁচ, কোমরবন্ধনী এবং জলছাকনী) সংগ্রহ করে যেখানে কমপক্ষে দশ জন ভিক্ষু আছেন (দসবগ্‌গেন গণেন উপসম্পদা) সেখানে সঙেঘর কাছে উপস্থিত হয়ে উপসম্পদার জন্য প্রার্থনা করতে হয় (প্রত্যন্ত জনপদে পাঁচজন ভিক্ষু দিয়েও উপসম্পদা সম্পাদন করা যায়, তাকে বলে পঞ্চবগ্‌গেন গণেন উপসম্পদা)। ভিক্ষুসঙেঘর মধ্যে অভিজ্ঞ ভিক্ষু তাঁকে উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয় ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সঙ্ঘ সম্মত থাকলে তাকে চারটি আশ্রয় (নিস্সয়—পিণ্ডিয়ালোপ-ভোজনং, পংসুকুলচীবরং, রুক্খমূলসেনাসনং, পূতিমুত্তভেসজ্জং —ভিক্ষান্ন গ্রহণ, ছেঁড়া কাপড় পরা, গাছের তলায় শোয়া, গোমূত্র ওষধি হিসাবে সেবন—বিনয় পিটক ১১. ২৭৪, ২৭৮) ও চারটি অকরণীয় (অব্রহ্মচর্য, চৌর্য, প্রাণীবধ ও অলৌকিক ধর্মারোপ) আজীবন পালন করতে বলা হয়। অবশেষে সংঘ তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করে এবং তখন থেকেই তিনি পান সঙেঘর পূর্ণ অধিকার। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও রোগগ্রস্ত এবং অর্হৎঘাতক, মাতৃ-পিতৃঘাতক, সঙ্ঘভেদক, বুদ্ধের রক্তপাতকারক, ভিক্ষুণীদূষক, নপুংসক, পাত্রচীবরহীন, চোর, রাজভৃত্য ও সৈনিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙেঘ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

Ref. (i) মহাবগ্গ ১/৪/১-৯

Ref. (ii) Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms by C. S. Upasak, p. 46.

শুভ্রা বড়ুয়া

উপসালহ জাতক (উপষাঢ়-জাতক)

জাতকট্‌ঠকথার ১৬৬ সংখ্যক জাতক। শ্মশানশুদ্ধিক এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ভিন্নজাতির দ্বারা সমৃষ্ট দূষিত স্থানে তাঁর মৃতদেহকে দাহ করতে পুত্রকে নিষেধ করেন। বস্তুতঃ ঐরূপ কোন শুদ্ধস্থান জগতে দুর্লভ বলেই ভগবান্ বুদ্ধের বিমর্শ।

জাতকটির প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে শ্মশানস্থানটি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিষয়ে শংকী উপসাঢ় নামক এক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ জেতবনে এই কাহিনীটির অবতারণা করেন। সঙ্গতিসম্পন্ন উপসাঢ় ব্রাহ্মণ ছিলেন পরম বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং অহংমন্য। কিন্তু তাঁর পুত্র ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী পণ্ডিত।

উপসাঢ় পরিণত বয়সে উপনীত। কোন শূদ্র জাতির শবদেহ দগ্ধ দূষিত কোন শ্মশানে তাঁর দেহ-সংকার করতে পুত্রকে বারণ করেন। অনুচ্ছিষ্ট শ্মশানেই তাঁর মৃত-দেহের সংকারের বিধান পুত্রকে প্রদান করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণপুত্র পিতাকে ঐরূপ উপযুক্ত স্থানটি সন্ধানের জন্য গৃধ্রকূটস্থ শিখরদেশে একটি ইঙ্গিত স্থান পুত্রকে দেখান। উক্ত পর্বত থেকে অবতরণকালে পর্বতের পাদদেশে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে পিতাপুত্র মিলিত হন। বুদ্ধ সেইস্থানে পিতাপুত্রের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসার দ্বারা অবগত হন। ভগবান বুদ্ধ তখন তাঁদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য পিতাপুত্রকে নিয়ে ঐ শ্মশানশুদ্ধিক স্থানটি দর্শনে গমন করেন। উক্ত প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণকুমারের পিতার পূর্বজন্মেও অনুরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণ কুমারের প্রার্থনায় বুদ্ধ তাঁদের অতীতজীবনের যে কাহিনী বিবৃত করেন তাই উপসাঢ় জাতকের কথাবস্তু।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপায়কৌশল্য

উপায়কৌশল্য অর্থাৎ উপায়কুশলতা। উপায়কৌশল্য শব্দটি একমাত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতেই পাওয়া যায়। মহাযানীদের মতে স্বমোক্ষ হীনযানীদের কাম্য ; তাঁরা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার দ্বারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। পরন্তু সর্বজীবের মুক্তিই হল মহাযানীদের কাম্য। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিই তাঁদের পরম ধ্যেয়। এর জন্য তাঁদেরকে বোধিসত্ত্বব্রত গ্রহণ করে সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য, সুখের জন্য নিজের শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়, এটাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপায়। মহাযানীদের আদর্শ অর্হত্ব নয়, বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর হওয়া। বোধিসত্ত্ব তাঁকেই বলা হয়, যিনি সম্যক্ সম্বোধিপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, যাঁতে বোধিবীজ নিহিত এবং যাঁর চিত্তে প্রাণী জগতের প্রতি অসীম করুণা বিদ্যমান।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক নামক আদি মহাযান সূত্রগ্রন্থে দেখা যায় যে বুদ্ধ স্বীয় উপায়কুশলতার দ্বারা দ্বিবিধাকারে ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন—এক গূঢ়, অপর প্রকট। গূঢ়ধর্মোপদেশ বুদ্ধ কিছু অত্যন্ত প্রতিভাশালী নির্বাচিত শিষ্যদের প্রতি দিয়েছিলেন, যাঁদেরকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। এই বোধিসত্ত্বদের মার্গকেই মহাযান বা বোধিসত্ত্বযান বলা হয়। একে বুদ্ধযান অথবা তথাগত যানও বলা হয়। বোধিসত্ত্বযানের শাব্দিক অর্থ বোধি বা জ্ঞান প্রাপ্তির মার্গ। সংসারে আবদ্ধ প্রাণীদের মুক্তির জন্য তিনি তিন যানের (শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং বোধিসত্ত্বযান) উপদেশ দিয়েছেন এবং এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপায়কৌশল—

উপায়কৌশল্য মমতেদগ্রং ভাষামি ধর্মং বহু যেন লোকে
তহিং তহিং লগ্ন প্রমোচয়ামি ত্রীণী চ যানান্যুপদর্শয়ামি

(উপায়কৌশল্য পরিবর্ত ... শ্লোক ২১)

যে সব মানুষ নম্র এবং পবিত্র তথা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর প্রত্যয়শীল, তাদেরকে পূর্ণ কুশলতার সঙ্গে এই এক যানের অর্থাৎ বুদ্ধযানের উপদেশ দেওয়া হয়। এবং এটাই বুদ্ধদের শ্রেষ্ঠ উপায়কৌশল। অজ্ঞমানুষদের কাছে উপদেশ প্রসঙ্গে উপায়কৌশল্যপরিবর্তে আমরা আরও পাই—

বয়ং পি বুদ্ধায় পরং তদা পদং তৃধা চ কৃত্বান প্রকাশয়ামঃ
হীনাধিমুক্তা হি অবিদ্বসূ নরা ভবিষ্যথা বুদ্ধ ন শ্রদ্ধধেয়ুঃ
ততো বয়ং কারণসংগ্রহেণ উপায়কৌশল্য নিষেবমানাঃ
ফলাভিলাষং পরিকীর্তয়ন্তঃ সমাদপেমো বহুবোধিসত্ত্বান্।

(উপায়কৌশল্য পরিবর্ত, শ্লোক ১২১, ১২২)

"বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করে প্রকাশ করছি, কেননা নীচুমানের মূর্খ মানুষদের যদি বলি 'তুমি বুদ্ধ হয়ে যাবে' তাহলে ওরা সেই কথায় বিশ্বাস করবে না। তাই এই কারণকে সামনে রেখেই উপায়কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিজের অভীষ্ট চর্চা করতে করতে অনেক বোধিসত্ত্বকে জ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছি।"

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের মতে বস্তুত যান একই (একং হি যানং দ্বিতীয়ং ন বিদ্যতে, তৃতীয়ং হি নৈবাস্তি কদাচি লোকে—উপায়কৌশল্য পরিবর্ত শ্লোক ৫৪) তা ছিল বুদ্ধযান, পরন্তু এর সাধনাতে বহু সময় লাগে বলে তথাগত সত্ত্বদের রুচি অনুযায়ী অনেক যানের উপদেশ দিয়েছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা শুধু অজ্ঞ মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য তথাগতের উপায় কৌশল মাত্র। তথাগতের উপদেশের মূল স্বরূপ এক হলেও সাধকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী, তাদের নানা চরিত্র, তাদের পূর্বজন্মের আশয়, তাদের বল এবং ধৈর্য তথা প্রবৃত্তিকে বুঝে তার অনুকূল যানের উপদেশ দিয়েছেন।

[দ্রষ্টব্য : সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র—উপায়কৌশল্যপরিবর্ত]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপালি

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অন্যতম প্রধান ও প্রিয়শিষ্য হলেন উপালি। প্রাক্ ভিক্ষুজীবনে তিনি কপিলাবস্তুতে এক ক্ষৌরকারকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে শাক্যরাজপুত্রগণের সেবকরূপে নিযুক্ত হন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধের জ্ঞাতি ভাই অনুরুদ্ধ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণ অনুপ্রিয়া উদ্যানারামে বুদ্ধের শাসনে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে উপালি তাঁদের অনুগমন করেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে শাক্যরাজপুত্রগণ তাঁদের সকল মূল্যবান অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি উপালিকে উপহার স্বরূপ প্রদান করতে চাইলে তিনি সেগুলি গ্রহণ না করে তাঁদের সঙ্গেই বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুরূপে প্রবেশ করেন।

বিনয়পিটকের বিবরণ অনুযায়ী (বিনয় পিটক ২,১৮২) শাক্যপুত্রগণের অনুরোধেই বুদ্ধ উপালিকে সঙ্ঘে প্রব্রজিত করেন শাক্যগণের অতিমানিতা খর্ব করার জন্য। বৌদ্ধসংস্কৃতগ্রন্থ মহাবস্তুতে (৩,১৭৯) উপালি ভগবান্ বুদ্ধের ক্ষৌরকার রূপে বর্ণিত। তিব্বতী গ্রন্থে উপালির পরিচয় একটু ভিন্নধারার। (তুলনীয় Rockhill, Life of Buddha, পৃঃ ৫৫-৫৬) পালি বিনয়পিটকের পাচিত্তিয় অংশে কপ্পিতক ছব্বগ্গিয়া কলহ বত্থুতে উপালির শিক্ষকরূপে কপ্পিতক চিত্রিত।

উপালি ধ্যানচর্চার জন্য ভগবান্ বুদ্ধের নিকট নির্জন বনস্থলে বাস করার অনুমতি প্রার্থনা জানালে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁকে ধ্যান চর্চার সঙ্গে ধর্মোপদেশ শিক্ষাগ্রহণের জন্য লোকালয়েই বাস করতে বলেন। ভগবান বুদ্ধের কথামত তিনি জনকোলাহলের মধ্যে বাস করেই ধ্যান চর্চা আরম্ভ করেন এবং অবশেষে অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হন। থেরগাথার অর্থকথায় (১,৩৬০-৩৭০) এবং অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা মনোরথপূরণীগ্রন্থে (১,১৭২) বর্ণিত যে গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং উপালিকে সমগ্র বিনয়পিটকটি বিবৃত করেছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায় (১,২৪) গ্রন্থে উল্লিখিত যে ভগবান্ বুদ্ধ সমগ্র সঙ্ঘের নিকট উপালিকে 'বিনয়ধরানং অগ্গো' বা বিনয়পিটকধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে নির্দ্দিষ্ট করেন (বিনয়পিটক ৪,১১২)। সিংহল রাজবংশপঞ্জী দীপবংসে (৪,৩-৫ ; ৫, ৭-৯) উপালিকে বিনয়বাদীদের মধ্যে অগ্রেস্থিত (বিনয়ে অগ্‌গনিক্খিত্তো) ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলা হয়েছে। অজ্জুক, ভারুকচ্ছের ভিক্ষু ও কুমারকস্‌সপ সম্পর্কিত বিনয়শীলাচরণের স্খলন বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রশংসা অর্জন করেন (বিনয় ৩,৬৬,৩৯ ; মনোরথপূরণী, ১,১৫৮ ; পপঞ্চসূদনী ১,৩৩৬ ; জাতক ১,১৪৮ ; ধম্মপদট্‌ঠকথা ৩,১৪৫)।

বিনয় চুল্লবগ্গে বর্ণিত যে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠানের কালে বিনয়-পিটকসংকলনে উপালির মুখ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ভিক্ষু মহাকাশ্যপ কর্তৃক বিনয়-নিয়মের উৎস ও নিদান সম্পর্কে নানাভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে যথাযথ উত্তরদানে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন (চুল্লবগ্গ, পঞ্চসতি বিনয়সংগীতি, বিনয়পিটক ২,২৮৬)। পালি মহাবংস গ্রন্থেও উপালির প্রথম সংগীতিতে বিনয়পিটক সংকলনের কথা সমর্থিত (মহাবংস, ৩,৩০)। ভিক্ষুগণের মধ্যে বিনয়-শীল সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা বিচার-বিতর্ক উত্থিত হলে বুদ্ধ স্বয়ং উপালির সাহায্যে ব্যাপারগুলি নিষ্পত্তি করতেন। তিনিই বিনয় পালনে বিভেদ-সৃষ্টিকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় শীলাচরণগুলি নির্দ্দিষ্ট করতেন এবং ভিক্ষুগণের ক্ষেত্রে উপালির সিদ্ধান্তকে মেনে চলা আবশ্যিক ছিল। বিনয়পিটকের পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া খণ্ডের অনেক ক্ষেত্রেই ভিক্ষুগণের বিনয় নির্দ্দিষ্ট শীলগুলির স্খলন সম্বন্ধে সতর্কীকরণে উপালির ভূমিকাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।

পালি বিনয়পিটকের পরিবার খণ্ডে (৫,১৮০-২০৬) উপালি পঞ্চকে ভগবান্ বুদ্ধের সহিত উপালির বিনয় সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্বমূলক আলোচনার কথা বর্ণিত। ভগবান্ বুদ্ধ উপালিকে বিনয়শীল বিষয়ে সকল শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রদান করেন। অনুরূপ উপালি বগ্গেও (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫,৭০) উপালির বিনয়-শীলাচরণ বিষয়ে প্রজ্ঞার কথা ধ্বনিত।

বিনয়পিটকের পাচিত্তিয়া অংশে (৪,১৪২) দেখা যায় যে বুদ্ধের জীবৎকাল পর্যন্ত ভিক্ষুগণ উপালির নিকট বিনয়-বিষয়ক শিক্ষাগ্রহণার্থী হয়ে নিজেদের বিশেষরূপে কৃতার্থ মনে

করতেন। ভিক্ষুগণও উপালিকে বিনয়-ব্যাপারে বিশেষ পরামর্শ-দাতা ও বন্ধুজ্ঞানে সেবা ও শ্রদ্ধা করতেন। উপালিও ঐ সকল ভিক্ষুদলকে বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।

সাধনচন্দ্র সরকার

উপাসক-উপাসিকা

বুদ্ধের অনুগামীরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত (চতুপরিসং) যথা—ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা।

যদি কোন গৃহস্থ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হন, তাঁকে উপাসক নামে অভিহিত করা হয়। ("যো কোচি সরণগতো গহটেঠা'তি উপাসকো" দীঘনিকায়ট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪) স্ত্রীলিঙ্গে উপাসিকা। পঞ্চশীল পালন (পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী, কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী, মুসাবাদা বেরমণী, সুরা-মেরয়-মজ্জ পমাদটঠানা বেরমণী—প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরতি) উপাসক-উপাসিকাদের নৈতিক কর্তব্য। বৌদ্ধ উপাসক সৎপথে থেকে তাঁর জীবিকা অর্জন করবেন। যেহেতু উপাসক দীক্ষাপ্রাপ্ত নন, সেইজন্য তাঁকে সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং কোন সঙ্ঘকর্মে তাঁর উপস্থিতি অনুমোদন করা হয় না।

বুদ্ধগয়ায় সম্বোধি লাভ করার অনতিকাল পরে তপস্সু ও ভল্লিক নামে উড়িষ্যা থেকে আগত দুজন ব্যবসায়ী বুদ্ধের প্রথম উপাসক হন। যেহেতু তখনও সঙ্ঘস্থাপন হয়নি সেইজন্য তাঁরা বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিয়েছিলেন। তাই তাঁদেরকে 'দ্বেবাচিক উপাসক' বলা হয়। তারপর যশের পিতা বারাণসীতে হলেন বুদ্ধের তৃতীয় উপাসক। তখন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁকে 'তেবাচিক উপাসক' বলা হয়। (বিনয় পিটক ১/১৫-২০ ; ধম্মপদটঠকথা ১/৭২)। বৌদ্ধ উপাসিকাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন যশের মা ও স্ত্রী। তাঁদেরকে 'তেবাচিকা উপাসিকা' বলা হয়। 'মিলিন্দপঞহ' গ্রন্থে (পৃঃ ৯৪-৯৫) উপাসকের দশটি গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পালি দীঘনিকায়ের লক্খণ ও সিগালোবাদসুত্তে বৌদ্ধ গৃহীদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা যায়।

Ref. Dictionary of early Buddhist monastic Terms by C. S. Upāsak, p. 50

শুভ্রা বড়ুয়া

উপসমানুস্সতি (উপশমানুস্মৃতি = উপশম + অনুস্মৃতি)

উপশম অর্থ নির্বাণ শান্তি। অনুস্মৃতি অর্থ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা। অনুস্মৃতি ধ্যান বা ভাবনার বিষয়বস্তু বা কর্মস্থান। বৌদ্ধমতে সাধনাপ্রণালী শমথ ও বিদর্শন ভাবনাবশে দু প্রকার। চিত্তের স্থূল অকুশল-বৃত্তির শান্ত অবস্থার নাম 'শমথ', এটি চিত্তের একাগ্রতা-প্রসূত। এই অবস্থার উৎপাদন ও বর্ধনের নাম 'শমথভাবনা' বা 'সমাধিভাবনা'। এই ভাবনা অভ্যাসের

চল্লিশ প্রকার প্রণালী আছে। এইসব ভাবনা প্রভাবে বিমুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু চিত্ত শান্ত হয়ে বিমুক্তি সাধনার জন্য দৃঢ় ও সক্ষম হয়। শমথ ভাবনার চল্লিশটি কর্মস্থানের মধ্যে দশটি অনুস্মৃতি :—

(১) বুদ্ধানুস্মৃতি (বুদ্ধানুস্‌সতি), (২) ধর্মানুস্মৃতি (ধম্মানুস্‌সতি), (৩) সঙ্ঘানুস্মৃতি (সঙ্ঘানুস্‌সতি), (৪) শীলানুস্মৃতি (সীলানুস্‌সতি), (৫) ত্যাগানুস্মৃতি (চাগানুস্‌সতি), (৬) দেবতানুস্মৃতি (দেবতানুস্‌সতি), (৭) মরণস্মৃতি (মরণ-সতি), (৮) কায়গতাস্মৃতি (কায়গতাসতি), (৯) আনাপানস্মৃতি (আনাপানসতি), (১০) উপশমানুস্মৃতি (উপসমানুস্‌সতি)।

উপশম বলতে বোঝায় উপশান্তি অর্থাৎ সমস্ত দুঃখ উপশম। এর অবলম্বন নির্বাণ শান্তি চিন্তা। আর্যমার্গ অবলম্বন করে সাধনার মাধ্যমে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অতীত হওয়াই প্রকৃত উপশম। নির্বাণ শান্তি বিষয়ে চিন্তা করলে চিত্ত নির্বাণ শান্তিতে নিমজ্জিত থাকে। এই ভাবনা করার আগে যোগীকে নির্বাণের গুণ কি কি তা জানতে হবে। এই ভাবনায় যোগী নিজেকে শান্তিতে নিমগ্ন, শান্তিতে পরিবেষ্টিত মনে করবে। এই শান্তি বিরাগ শান্তি, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত শান্তি। নির্বাণ দর্শনে সব মত্ততা দূর হয়, সব আস্রব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, ভবচক্রের আবর্তন ছিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, দুঃখের শেষ হয়—এটাই নির্বাণ। নির্বাণ অনাদি, অনন্ত, একে জরা স্পর্শ করতে পারে না তাই অক্ষয়, মৃত্যু তাকে ধ্বংস করতে পারে না, তাই ধ্রুব। তাই নির্বাণ দর্শনে অনাবিল আনন্দ লাভ হয়। নির্বাণের নিরন্তর ধ্যানে মন যখন নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন মন শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে ভরে ওঠে এবং নীবরণগুলি দূরে সরে যায়। ভাবনায় মগ্নভাব নিবিড়তর হওয়ার ফলে ধ্যানাঙ্গগুলি (বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা) একে একে আত্মপ্রকাশ করে। বিবিধ গুণে আবদ্ধ এই নির্বাণ অনুস্মৃতিতে মন উপচার সমাধিতে সমাহিত হয়। উপশমকে অর্থাৎ নির্বাণকে অবলম্বন করে তা সম্পন্ন হয় বলে একে উপশমানুস্মৃতি ভাবনা বলা হয়।

দ্রষ্টব্য : অভিধম্মথসংগহ IX. 8. বিসুদ্ধিমগ্‌গ VIII. 4.

শুভ্রা বড়ুয়া

উপাদা রূপ

উপাদা রূপ অর্থাৎ আহরিত রূপ। রূপ বলতে চার মহাভূত অর্থাৎ পঠবী, আপ, তেজ, বায়ু এবং এই চার মহাভূতকে আশ্রয় বা গ্রহণ করে উপাদা বা উপাদায় রূপ গৃহীত হয়েছে। 'উপাদা রূপ' অর্থাৎ আহরিত রূপ বা জড়বস্তু নিগূঢ় ও অস্পষ্ট হয়ে থাকে, অপরপক্ষে 'মহাভূত' রূপের দ্বারা গঠিত জড়বস্তু স্থূল ও সুস্পষ্ট। ২৪টি উপাদা রূপের বর্ণনা এই :—

প্রসাদ রূপ (পসাদরূপ)—৫টি

(১) চক্‌খুপসাদ—প্রসাদ অর্থে স্বচ্ছতা। যেমন আয়নায় স্বচ্ছতাগুণ আছে বলে ছায়া প্রতিফলিত হয়, তেমনি পঞ্চেন্দ্রিয়ে প্রসাদগুণ আছে বলে নিমিত্তগুলি প্রতিফলিত হয়, এটি

জড়পদার্থের বিশিষ্ট গুণ। চক্ষুগোলকের সঙ্গে যখন কোন বস্তুর সংস্পর্শ হয়, তখন তার ওপর প্রতিবিম্ব পড়ে, এই কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এতেই বস্তুর আকার-বর্ণ-গঠন প্রভৃতির সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হয়।

(২) **সোতপসাদ**—কানের পর্দার সঙ্গে শব্দের সংঘাতে শব্দবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এর একত্র কাজ শোনা।

(৩) **ঘানপসাদ**—নাকের সঙ্গে গন্ধের সংস্পর্শে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(৪) **জিহ্বাপসাদ**—জিহ্বার সঙ্গে রসের সংস্পর্শে এর আস্বাদনজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(৫) **কায়পসাদ**—ত্বকের সঙ্গে বস্তুর সংস্পর্শে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। দেহের যে কোন অংশে স্পর্শ করামাত্র সমস্ত দেহে এর উপলব্ধি হয়। এটিই স্পর্শের বিশেষগুণ।

গোচর রূপ—৪টি

পঞ্চেন্দ্রিয়ে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ আলম্বনে গো-চারণের মতো বিচরণ করে বলে গোচর-রূপ বলে।

(১) **রূপারম্মণ**—বস্তুর রং-বর্ণ-আকার যা দিয়ে নির্ণয় হয়। এটি চক্ষুগ্রাহ্য।

(২) **সদ্দারম্মণ**—শব্দের মধুরতা, কর্কশতা জানা। এটি শ্রোত্রগ্রাহ্য।

(৩) **গন্ধারম্মণ**—সুগন্ধ-দুর্গন্ধ জানা, এটি ঘ্রাণগ্রাহ্য।

(৪) **রসারম্মণ**—মিষ্টি, টক, তিক্ত, লবণাক্ত ইত্যাদি রসের স্বাদ জানা। এটি জিহ্বাগ্রাহ্য, এখানে ত্বকেন্দ্রিয়ের আলম্বন আপ্‌ধাতু বর্জিত বাকী তিনটি ধাতু পৃথিবী-তেজ-বায়ু বোঝায়। কারণ ত্বগিন্দ্রিয় কায়ের গ্রাহ্য নয়। সুতরাং এটি কায়ের আলম্বন নয়। সাধারণতঃ যা আপের কোমলতা তা পৃথিবী ধাতু। যা শীতলতা তা তেজ ধাতু। গতিশীলতা বায়ুধাতু। এসব কায়ের গ্রাহ্য। কিন্তু বন্ধন বা সংসক্তিগুণ কায়ের গ্রাহ্য নয়। এ কারণে আপ ধাতু বর্জিতের বিশেষ সংজ্ঞা দেখাতে ফোট্‌ঠব্ব বা স্পৃষ্টব্য বলা হয়েছে।

ভাবরূপ—২টি

(১) **ইত্থিভাব**—স্ত্রীজাতিসুলভ আকার প্রভৃতি ; এখানে 'ভাব' শব্দ দিয়ে জড়ের উৎপানকারী গুণ বোঝায়।

(২) **পুরিসভাব**—পুরুষজাতিসুলভ আকার প্রভৃতি।

হৃদয়রূপ (হদয়বত্থু)—১টি

যা জীবিতরূপ তা রূপের জীবনীশক্তি। অতীত কর্মপ্রভাবে যদিও রূপস্কন্ধ জন্মায়, জীবিতরূপ বা ইন্দ্রিয় একে বাঁচিয়ে রাখে। জড় বস্তুতে এই গুণ থাকে না।

আহার রূপ—১টি

রূপের পোষণ-পুষ্টির সহায় একমাত্র আহার। জীবিতেন্দ্রিয়ও আহারে নির্ভরশীল।

পরিচ্ছেদ রূপ (আকাস ধাতু)—১টি

এটি সীমাব্যঞ্জক। দুই পরমাণুর মধ্যে যে শূন্যস্থান। এটির অপর নাম আকাশ ধাতু। প্রত্যেক পদার্থে এই আকাশ বর্তমান। সেই কারণে পদার্থকে ভাঙতে পারা যায়। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ এই আটটি গুণ আছে। একে অষ্টকলাপ বলে।

বিজ্ঞপ্তি রূপ (বিঞ্ঞত্তি রূপ)—২টি

(১) **কায় বিঞ্ঞত্তি**—ইসারা-ইঙ্গিতে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়, তার নাম বিজ্ঞপ্তি। শরীরের দ্বারা যা ব্যক্ত হয় তা কায়বিজ্ঞপ্তি।

(২) **বচিবিঞ্ঞত্তি**—মনের কথা যখন মুখে ব্যক্ত হয়, তখন তাকে বাক্ বিজ্ঞপ্তি বলে। প্রত্যেক বিষয়ের অবস্থা দর্শনে কায় বাক্যের ক্রিয়া বোঝা যায়। বিজ্ঞপ্তি দুটি চিত্তজ।

বিকার রূপ—৩টি

(১) **লঘুতা** (লহুতা)—উৎপন্ন রূপের বিশেষ অবস্থার নাম বিকার। রূপের হাল্কা ভাবই লঘুতা।

(২) **মৃদুতা** (মুদুতা)—সঞ্চালনশীলতাই মৃদুতা।

(৩) **কর্মণ্যতা** (কম্মঞ্ঞতা)—শারীরিক কর্মোপযোগিতাই কর্মণ্যতা। যখন শরীরে চারটি ধাতু সমানুপাতে থাকে, তখন শরীর সুস্থ মনে হয়। যখন চার মহাভূতের তারতম্য ঘটে, তখন শরীর অসুস্থ মনে হয়।

লক্ষণ রূপ—৪টি

(১) **উপচয়**—অনুক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থা।

(২) **সন্ততি**—উপচিতের পূর্ণাবস্থা।

(৩) **জড়তা**—বার্ধক্য অবস্থা।

(৪) **অনিত্যতা** (অনিচ্চতা)—মৃতাবস্থা।

এই সব অবস্থা জীবদেহে ও জড়পদার্থে উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। চার মহাভূত ও ২৪ প্রকার উপাদা রূপ একসঙ্গে রূপস্কন্ধ বলে পরিচিত।

[দ্রষ্টব্য : অভিধম্মথসংগহ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপাদান খন্ধ (উপাদান স্কন্ধ)

উপাদান অর্থাৎ উপ + আদান, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ। তৃষ্ণার বস্তুকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণই উপাদান। তৃষ্ণা যখন গাঢ় হয় তখনই তা উপাদানে পরিণত হয়। খন্ধ অর্থাৎ স্কন্ধ বলতে বোঝায়

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ বা রাশি যা আমাদের অস্তিত্বকে বহন করছে। পঞ্চস্কন্ধ বা জড় চেতনার সমন্বয়ই আমাদের আমাদের জীবনপ্রবাহ। এই পঞ্চস্কন্ধই সমস্ত দুঃখের মূল। পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসে, তখন তাকে উপাদানস্কন্ধ বলে। এই পঞ্চস্কন্ধ যথা :—

(১) **রূপস্কন্ধ**—আমাদের এই শরীরে কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহারের দ্বারা বর্ধিত চার প্রকার ধাতু আছে। (ক) পৃথিবী বা পঠবী ধাতু যার মৌলিক গুণ কাঠিন্য, কোমলতা, এবং বিস্তৃতি। (খ) আপ ধাতু—অর্থাৎ জলীয় ধাতু, আপ্ অর্থ বন্ধন বা সংসক্তি (গ) তেজ ধাতু—ঠাণ্ডা, গরম প্রভৃতি অবস্থারই পরিভাষা 'তেজ ধাতু'। (ঘ) বায়ু ধাতু—বেগ ও গতি শীলতাই এর গুণ। বৌদ্ধদর্শনে আকাশ বা ব্যোম ভূত বা জাত নয় বলে একে 'ভূত' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। জড়ের এই চারটি শক্তির মিলিত নাম 'মহাভূত-রূপ' কারণ এই চারটি থেকেই জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। রূপান্তরিত, পরিবর্তিত, বিকার প্রাপ্ত হয় বলে এদেরকে 'রূপ' বলা হয়। এই চারটি মৌলিক ধাতু ও এদের বিকারজনিত ২৪ প্রকার জড় পদার্থ বা 'উপাদা রূপ'কেই রূপস্কন্ধ বলা হয়।

২৪টি উপাদা রূপ :—

(ক) প্রসাদ রূপ (৫টি)—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়

(খ) গোচর রূপ (৪টি)—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস

(গ) ভাব রূপ (২টি)—স্ত্রীভাব, পুংভাব

(ঘ) হৃদয় রূপ (১টি)—হৃৎপিণ্ড

(ঙ) পরিচ্ছেদ রূপ (১টি)—আকাশ ধাতু

(চ) জীবিত রূপ (১টি)—জীবিতেন্দ্রিয়

(ছ) বিজ্ঞপ্তি রূপ (২টি)—কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি

(জ) বিকার রূপ (৩টি)—লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা

(ঝ) লক্ষণ রূপ (৪টি)—উপচয় বা বৃদ্ধি, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা

(ঞ) আহার রূপ (১টি)

(২) **বেদনাস্কন্ধ**—বেদন বা বোধ হয় এই অর্থে বেদনা। ইন্দ্রিয় ও আলম্বন সংযোগে যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ওদের চিন্তার সংস্পর্শে এসে যে সুখ বা দুঃখ বা অ-সুখ, অ-দুঃখ অনুভব করি তাই বেদনা। 'ফস্সো পচ্চয়া বেদনা'। অন্তরায়তন ও বহিরায়তনের সংযোগ হলেই বেদনার উদ্ভব হয়। বেদনা ৫ প্রকার :—

(ক) সুখ বেদনা (কায়িকা সুখা বেদনা—শারীরিক সুখের অনুভূতি)

(খ) দুঃখ বেদনা (কায়িকা দুক্খ বেদনা—দুঃখের অনুভূতি)

(গ) সৌমনস্য (সোমনস্স = চেতসিক সুখা বেদনা—মানসিক সুখের অনুভূতি)

(ঘ) দৌর্মনস্য (দোমনস্‌স = চেতসিক দুক্‌খ বেদনা—মানসিক দুঃখের অনুভূতি)

(ঙ) উপেক্ষা (উপেক্‌খা = অদুক্‌খ-ম-অসুখাবেদনা—অদুঃখ ও অ-সুখের অনুভূতি)

এই পাঁচ প্রকার বেদনা রাশির সমষ্টিই 'বেদনা স্কন্ধ'।

(৩) সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা)—সংজানন হয় বা জানা যায় এই অর্থে 'সংজ্ঞা'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিষয় সম্বন্ধে যে প্রাথমিক ধারণা জন্মায়, তাকে বলা হয় সংজ্ঞা। এই ধারণাকে অন্ধের হাতিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সংজ্ঞার দ্বারাই এক আলম্বন থেকে অন্য আলম্বনকে আলাদা করে চেনা যায় এবং আলম্বনে জ্ঞান জন্মায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন সংস্পর্শ থেকে সংজ্ঞার উদয় হয়, সুতরাং উৎপত্তি কারণভেদে সংজ্ঞা ছয় প্রকার।

(৪) সংস্কার (সংখার)—সংস্করণ হয় এই অর্থে সংস্কার। বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়া লোভ, দ্বেষ মোহ কিংবা শ্রদ্ধা, প্রীতি, জ্ঞান প্রভৃতি পঞ্চাশ প্রকার সৎ ও অসৎ চিত্তবৃত্তিকে সংস্কার বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন সংস্পর্শ থেকে এই চিত্তবৃত্তি বা চেতনার উদ্ভব হয়। এইসব মানসিক বৃত্তির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কে রেখাপাত করে ও আমাদের ভবিষ্যত জ্ঞানের সহায়ক হয়। সংস্কাররাশি চিত্তসন্ততিতে সুপ্তাবস্থায় থাকে, অনুকূল অবস্থায় প্রকাশ পায়। কর্মকেই সাধারণতঃ সংস্কার বলা হয়। 'চেতনাহং ভিক্‌খবে কম্মং বদামি'। কর্ম ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে সাধারণতঃ অতীতে যে সব কর্ম করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সব কর্ম করা হবে, সেইসব কর্মের সমষ্টিকে 'সংস্কার' এবং বর্তমান কর্মপ্রবাহকে 'কর্ম' বলা হয়। এই সংস্কার কুশল, অকুশল, আনেঞ্জা (স্থির, দৃঢ়), কায়, বাক্য ও চিত্ত সংস্কার ভেদে ছয় প্রকার।

(ক) অন্যসমান চৈতসিক (১৩টি)—৭টি সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক + ৬টি প্রকীর্ণ চৈতসিক

(খ) অকুশল চৈতসিক (১৪টি)

(গ) শোভন চৈতসিক (২৫টি)

(৫) বিজ্ঞান (বিঞ্‌ঞাণ) **স্কন্ধ**—বিজানন অর্থে বিজ্ঞান। চিত্ত বা মনের অন্য নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ জানা শক্তি। চিত্ত বৃত্তি সহযোগে উৎপন্ন একাশিটি লৌকিক চিত্তকে নিয়ে বিজ্ঞানস্কন্ধের গঠন। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-ধাতু ও মনো-বিজ্ঞান ধাতু এবং লৌকিক চিত্তগুলির সমষ্টিগত নাম বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

৪টি মহাভূত ও ২৪টি উপাদারূপ, এই ২৮টি রূপ এবং বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই চারটি স্কন্ধকে 'নাম' বলা হয়। এই 'নাম' ও 'রূপের' সংস্পর্শে 'আমি'র উৎপত্তি হয়। এই 'নাম' ও 'রূপ' পরস্পরের সাহায্যে 'আমি' সৃষ্টি করে চলেছে। উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এটি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মার অধীন নাম-রূপের প্রবাহ মাত্র এবং এতে 'আমিত্ব' ধারণাই জগতের সব দুঃখের মূল।

[দ্রষ্টব্য : বিসুদ্ধিমগ্‌গ, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপাদিন্ন রূপ

এর অর্থ 'গৃহীত রূপ'।

চারটি ভূত-রূপ, পাঁচটি প্রসাদ-রূপ, চারটি গোচর-রূপ, দুটি ভাব-রূপ, একটি হৃদয়-রূপ, একটি জীবিত-রূপ এবং একটি আহার-রূপ এই আঠার প্রকার রূপকে 'কর্মজ রূপ' বলে। কর্মের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলে এদের অন্য নাম 'নিষ্পন্ন-রূপ'। এরা তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান দ্বারা দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয় বলে 'উপাদিন্ন রূপ' বা 'গৃহীত রূপ'।

৪টি ভূত-রূপ—পঠবী, আপ, তেজ, বায়ু

৫টি পসাদ-রূপ—চক্খুপসাদ, সোতপসাদ, ঘাণপসাদ, জিব্হাপসাদ, কায়পসাদ

৪টি গোচর-রূপ—রূপারম্মণ, সদ্দারম্মণ, গন্ধারম্মণ, রসারম্মণ

২টি ভাব-রূপ—ইত্থিভাব, পুরিসভাব

১টি হৃদয়-রূপ—হৃদয়বত্থু

১টি জীবিত-রূপ—জীবিতিন্দ্রিয়

১টি আহার-রূপ

[দ্রষ্টব্য : অভিধম্মত্থসংগহ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

শুভ্রা বড়ুয়া

উপেক্ষা

মনের সমতা। ইহার অপর নাম তত্রমধ্যস্থতা অর্থাৎ চিত্তের লীন ও ঔদ্ধত্য দুই বিষম অবস্থার মধ্যস্থ অবস্থা। অদুঃখ-অসুখ বেদনাও উপেক্ষা বেদনা। কিন্তু ইহা শারীরিক। আলোচ্যস্থলে মানসিক সুখ দুঃখহীন বেদনাকে উপেক্ষা বলা হয়েছে। ইহাই শোভন চৈতসিক 'তত্রমধ্যস্থ'। সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ। চারি ব্রহ্মবিহারের মধ্যে উপেক্ষা ব্রহ্মবিহার। ইহা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত। ইহা জ্ঞানজ উপেক্ষা। শারীরিক বেদনাজ উপেক্ষা নহে।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

উপোসথ

উপবসথ ; উপবাস > উপোস (fasting) থেকে, উপোসথ অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে উপবাস করার দিন। প্রতিমাসে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণাষ্টমী ও শুক্লাষ্টমী অর্থাৎ মাসে চারবার ভিক্ষুরা উপোসথ পালন করেন। কাজেই সপ্তাহে একদিন বৌদ্ধভিক্ষুদের বিশেষ পালনীয় দিন (Sabbath day)। প্রতিমাসে এরূপ দুটি উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্ঘ 'প্রাতিমোক্ষ' আবৃত্তি করেন (পাতিমোক্খুদ্দেস) এবং তাতে উপস্থিত ভিক্ষুদের শুদ্ধাশুদ্ধি জিজ্ঞাসা করা হয়। শুদ্ধ থাকলে 'মৌন' থাকতে হয়, অশুদ্ধ থাকলে বলতে হয় কি অন্যায় করেছে। তদনুসারে

বিনয়মতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ভিক্ষুদের মধ্যে কোনও কারণে বিবাদ উপস্থিত হলে বিশেষ একটি উপোসথ করতে হয়। তার নাম সামগ্গি-উপোসথ (reconciliation uposatha) এবং এই উপোসথ করে বিবাদের নিষ্পত্তি করা হয়।

বৌদ্ধ গৃহীরাও এরূপ উপোসথের দিনে অষ্টাঙ্গশীল (প্রাণীহত্যা না করা ইত্যাদি ৮ প্রকার ব্রত) পালন করে থাকেন।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

উপ্‌পত্তিভব (উৎপত্তিভব)

উৎপত্তিভব অর্থাৎ বিশ্বজগৎ। ভব দুই প্রকার কর্মভব ও উৎপত্তিভব। উপাদান বা দৃঢ় আসক্তির জন্য জীব সকাম কর্ম সম্পাদনে রত হয়। বীজ উপ্ত হলে বৃক্ষোদ্‌গম হবেই। তেমনই কর্মবীজ উপ্ত হলে তার পরিণতিতে উৎপত্তিভব বা পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অতএব, কর্মভব ও উৎপত্তিভব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

উলার-বিমান

রাজগৃহে একটি পরিবারে এক দানশীলা রমণী বসবাস করত। মহামোগ্‌গল্লানকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য সে প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকত। দানশীলা মেয়েটি তার অধিকারে যে সমস্ত বস্তু থাকতো তার অর্ধেক দানপাত্রে প্রদান করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত। একসময় মেয়েটির কোন এক অবিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর মেয়েটি একদিন মহামোগ্‌গল্লানকে ভিক্ষা পাত্র হস্তে আসতে দেখে তার বাড়ীতে আহ্বান জানায় এবং শাশুড়ীর রাখা কিছু পিঠে মহামোগ্‌গল্লানকে প্রদান করে। শাশুড়ী এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েটির মাথায় হামানদিস্তার ডাঁটি দিয়ে আঘাত করে এবং মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। মারা যাওয়ার পর সে তাবতিংসে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটির জন্মস্থান উলার-বিমান নামে পরিচিতি লাভ করে। মহামোগ্‌গল্লান মেয়েটির সঙ্গে পরে সেখানে দেখা করেন।

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P., Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. I, pp.437-8 ; Vimana-vatthu, p. 24 ; Vimana-vatthu Aṭṭhakathā, p. 120.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

উলুক জাতক

এই জাতকের (জাতক সংখ্যা ২৭০) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে কাকের সহিত উলুকের শত্রুতার কারণ বর্ণিত হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ জেতবনে কাক ও উলুকের মধ্যে পরস্পর প্রাণহানিকর বিবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন—জেতবনের নিকটস্থ এক পরিবেণের চারিদিকের ভূমি পরিচ্ছন্ন করার সময় একজন ভিক্ষু প্রচুর কাকের কর্তিত মাথা ঝাঁট দিয়ে সংগ্রহ করে ৭/৮ ঝুড়ি করে

ফেলতেন। তিনি ভিক্ষুদের এই সংবাদ জানালে ভিক্ষুরা ভগবানের কাছে জানতে চাইলেন কোন সময় থেকে কাক ও উলুকের মধ্যে বৈরভাব চলে আসছে। ভগবান বললেন প্রাচীন কাল থেকে।

প্রাচীনকালে মনুষ্যগণ এক সুশ্রী সুলক্ষণযুক্ত পুরুষকে রাজপদে অভিষিক্ত করে।পশুরা সিংহকে, মৎস্যেরা আনন্দ নামক মৎস্যকে নিজেদের রাজপদে অভিষিক্ত করে। পক্ষীরা সমবেত হয়ে উলুককে রাজপদে মনোনীত করল। পক্ষীদের সভায় তিনবার উলুকের নাম ঘোষিত হল। তখন এক কাক এসে অভিষেক পণ্ড করল। সে বলল—ভাই সব, একটু অপেক্ষা কর। রাজপদে অভিষেকের সময়ই যদি উলুক মশায়ের মুখশ্রী এ রকম হয়, তবে উনি যখন কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হবেন তখন আরো কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন। তখন আমাদের কী দশা হবে। এজন্য উলুকের রাজপদে নির্বাচন আমার অভিপ্রেত নয়। বলেই কাক আকাশে উড়ে গেল। উলুকও আসন ত্যাগ করে কাককে অনুসরণ করল। সেদিন থেকে কাক ও উলুকের মধ্যে বৈরভাব চলে আসছে। অতঃপর পক্ষীরা সুবর্ণহংসকে রাজপদে নির্বাচিত করল।

সমাধানে বলা হয়েছে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সেই সুবর্ণহংস।

সূত্র :—

Jātaka ed. Fausboll, Vol. II, P. T. S. 1879

ঈশান ঘোষ জাতক, ২য়, পৃঃ ২২৯-২২২

আশা দাশ

উস্সংখপাদ

৩২ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণের মধ্যে ৭ম মহাপুরুষলক্ষন। পায়ের গুল্ফ বা গোড়ালির গাঁট গোড়ালির উপর নহে বরং পাদতলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মহাপুরুষলক্ষণ বুদ্ধের ছিল।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

উসভ থের১

ইনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলাবস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে পিণ্ডাচরণরত দেখে তিনি প্রসন্নচিত্তে একটি কোসম্বফল দান করেন। পরে আপন জ্ঞাতিদের উপর ভগবানের অসাধারণ প্রভাব দেখে তিনি প্রব্রজিত হন। কিন্তু ধ্যানধারণায় মনোযোগী ছিলেন না।

তিনি সারাদিন গল্পগুজব এবং রাত্রে নিদ্রায় অতিবাহিত করতেন। এক রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি যেন কেশশ্মশ্রু ছেদন করে প্রবাল বর্ণ চীবরধারী হয়ে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে গ্রামে পিণ্ডের জন্য প্রবেশ করছেন আর পথে বিত্তবান লোকদের দেখে

হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করছেন। এ অবস্থায় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল। তিনি সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন। এই স্বপ্ন দর্শন তিনি একটি গাথায় প্রকাশ করেন।

সূত্র ঃ থেরগাথা, ed. H. Oldenbedg, P. T. S. 1883

আশা দাশ

উসভ থের[২]

ইনি একজন অর্হৎ। কোশল রাজ্যের কোন এক বিত্তবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ জেতবন দানগ্রহণ সময়ে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দান করেন। শ্রামণের জীবন সমাপ্ত করে তিনি পার্বত্য প্রদেশে বাস করতে থাকেন। একদা বর্ষাপ্লাবিত দিনে নিজের কুঁড়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তখন অরণ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। পর্বতের বৃক্ষ সমূহে নব কিশলয়ের শোভা। বনভূমি ও পার্বত্য প্রদেশের মনোরম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি একটি গাথা রচনা করেন।

নগা নগ্গেসু সুসংবিরূলহা
উদগ্গমেঘেন নবেন সিত্তা
বিবেকানস্‌স অরঞ্ঞসঞ্ঞিঞনো
জনেতি ভিয়্যো উসভস্‌স কল্যতন্তি। (১১০)

শিখী বুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন একজন দেবপুত্র এবং বুদ্ধকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করেন। পুষ্পটি সাতদিন বুদ্ধের মস্তকোপরি পুষ্প মণ্ডপ রূপে পরিশোভিত ছিল। দশকল্প কাল পূর্বে তিনি ছিলেন একজন রাজা। নাম জ্যোতিষ্কর। তিনি 'অপদানের' মন্দারপূজক-এর সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

সূত্র :—

(১) থেরগাথা, ed. H. Oldenberg, P. T. S. 1883

(২) থেরগাথা অট্‌ঠকথা, Vol. I, P. T. S. 1940

(৩) অপদান ed. M. E. Likey, Vol II, 1927

আশা দাশ

একগ্গতা

একাগ্রতা, চিত্তের একাগ্রতা (One-pointedness of mind), একটিমাত্র বিষয়ে চিত্তের নিশ্চল অবস্থার নাম একাগ্রতা। পরিপূর্ণ একাগ্রতাকেই 'সমাধি' বলা হয়। একাগ্র বা সমাহিত চিত্ত যথাযথ দর্শন করতে পারে। সুতরাং জ্ঞান একাগ্রতার পরিণামফল। একাগ্রতা ব্যতীত চিত্ত কোনও বিষয়ের আলম্বন গ্রহণ করতে পারেনা।

পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন শ্রেণীর কীটাদি এবং প্রাণীদের মধ্যেও এই একাগ্রতার অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। চোরের চুরি করা, বকের মাছ ধরা, বিড়ালের ইঁদুর ধরা সবক্ষেত্রেই একাগ্রতার প্রয়োজন। তবে এই সকল ক্ষেত্রের একাগ্রতাকে অকুশল বলা যেতে পারে। আলোচ্যস্থলে কুশল একাগ্রতার কথাই বলা হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য ঃ ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘনিকায়]

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

একনালা

দক্ষিণগিরি সন্নিকটস্থ একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। ইহা রাজগৃহের দক্ষিণে অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের একাদশবর্ষে তিনি এই গ্রামে উপনীত হন। এই সময়ে কাশী ভারদ্বাজ ক্ষেত্রে শষ্য বপন করছিলেন।। তিনি এই সময় কাশীর কর্মক্ষেত্রে গমন করেন এবং ভারদ্বাজকে ধর্ম দেশনা দান করেন। ভগবানের প্রদত্ত ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে তিনি ধর্মান্তরিত হন। এই একনালা গ্রামের সন্নিকটে ছিল দক্ষিণগিরি বিহার।

সূত্র ঃ—

(১) সংযুত্ত অট্ঠকথা Vol. I, P. T. S. 1921, p. 188

(২) সুত্তনিপাত, ed. Dines Andersen and Helmer, Mnith, P. Ts. S. 1913

(৩) সুত্তনিপাত অট্ঠকথা, Vol. I, ed. Helmer Smith P. T. S. 1989

(৪) সংযুক্ত নিকায়, Vol. I, ed L. Feer, P. T. S. 1884

আশা দাশ

একপন্ন (একপর্ণ) জাতক

এই জাতকের (জাতক নং ১৪৯) বর্তমান বস্তুতে আছে ভগবান বুদ্ধ বৈশালী নগরীর সন্নিকটস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করার সময় এক দুষ্ট লিচ্ছবি রাজকুমারকে লক্ষ্য করে এই জাতক বলেছেন। তখন বৈশালী সর্ব-বিষয়ে সমৃদ্ধ নগরী। বৈশালীর রাজকুমারদের মধ্যে একজন ছিলেন উগ্র ও নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও দাম্ভিক প্রকৃতির। পুত্রের চরিত্র সংশোধনের জন্য মাতাপিতা তাকে বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করলেন। ভগবান তাকে ক্রোধরিপুর চরম অপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ভগবানের দেশনা শ্রবণ করে দুষ্ট রাজকুমার শান্তচিত্ত ও নিরীহ হলেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান অতীত কথা বললেন।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালের ঘটনা। বোধিসত্ত্ব তখন উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে যান। দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাস করার পর অম্ল ও লবণের প্রয়োজনে তিনি বারাণসীতে আগমন করেন। পরদিন ভিক্ষার্থ রাজদ্বারে উপনীত হলেন। রাজা এক কর্মচারীকে আদেশ দিলেন—ঐ তপস্বীকে এখানে নিয়ে এসে। তপস্বী রাজাদেশ শুনে বললেন—আমি তপস্বী, হিমালয়ে বাস করি,

রাজভবনে আমার যাতায়াত নেই। রাজা তপস্বীকে জানালেন রাজার কোনও কুলোপগ অর্থাৎ যিনি নিয়ত গৃহে ভিক্ষা করতে আসেন এবং সকলকে ধর্মদেশনা দান করেন সেই রকম ভিক্ষু তাঁর প্রয়োজন। সুতরাং তিনি তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানালেন। তপস্বী রাজভবনে উপনীত হলে রাজা তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রাজ উদ্যানে পর্ণশালা নির্মাণ করে বাস করতে দিলেন এবং ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। তপস্বী রাজ উদ্যানে বসবাস করতে লাগলেন। রাজার একপুত্র অত্যন্ত উগ্র, নিষ্ঠুর, কোপন প্রকৃতির ছিল। রাজা তপস্বীর উপর তাঁর শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন।

একদিন তপস্বী রাজকুমাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যানে বিচরণ করতে করতে একটি নিম গাছের চারার একটি পাতা তুলে নিয়ে রাজকুমারকে খেতে দিলেন। কুমার পাতাটি মুখে দিয়েই ভূমিতে থুথু নিক্ষেপ করল এবং চারা গাছটি উপড়িয়ে ফেলে দিল। বলল—এই গাছটি এখনই বিষতুল্য, বড় হলে এর দ্বারা কত লোকের প্রাণনাশ হবে! তপস্বী বললেন—কুমার গাছটি তিক্ত বলে তুমি একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করলে। এ রাজ্যের অধিবাসীরাও তোমাকে তাই করবে। তারা জানে তুমি এখনই এত উগ্র ও নিষ্ঠুর, বড় হয়ে রাজা হলে তাদের কত ক্ষতি করবে। সুতরাং নিম গাছের দৃষ্টান্ত দ্বারা তুমি সাবধান হও। ক্ষান্তি ও মৈত্রী সম্পন্ন হও। এর পর কুমারের মত পরিবর্তন হল। তিনি মৈত্রী সম্পন্ন হলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে দানাদি সৎকর্ম সম্পন্ন করলেন।

সমাধানে বুদ্ধ বলেছেন এই লিচ্ছবি কুমার ছিল সেই দুষ্ট রাজকুমার, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।

(১) Jātaka, Vol. I, ed Fausboll, P. T. S. 1877

(২) ঈশান ঘোষ, জাতক, ১ম, পৃঃ ২৬৯-২৭২

আশা দাশ

একব্বোহারা

মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের একটি শাখা। এই নামকরণের কারণ তাঁরা মনে করেন সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অধিগম্য। সুতরাং ভগবানের প্রদত্ত সমস্ত তত্ত্ব বুদ্ধিদ্বারা আয়ত্ত করা যায়। তাঁরা আরো মনে করেন—তথাগতগণ জাগতিক নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন, তথাগতগণের প্রবর্তিত ধর্মচক্রও এক প্রকার নয়। বোধিসত্ত্বগণও মাতৃজঠরের ক্রম পরিণতির স্তর পরম্পরা অতিক্রম করেন না। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন—মানুষের মুক্তির জন্য।

সূত্র :—

Buddhist Sects in India, N. Dutt, Calcutta, Firma KLM Private Lted., 1977

আশা দাশ

একসালা

কোশলের একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। ভগবান এখানে কিছু কাল অবস্থান করেন। তখন বিশাল জনসঙ্ঘ ধর্মশ্রবণের জন্য তথায় আগমন করে। এই সময় দুষ্ট মার জনসাধারণের ধর্ম শ্রবণে বাধা দানের জন্য ভগবানকে বলল—আপনি কাকেও দেশনা দিতে পারেন না। বুদ্ধ মারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। অবশেষে মার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রস্থান করে।

সূত্র :—

সংযুত্ত, Vol. I. ed L. Feer, 1884

আশা দাশ

একাসনিকঙ্গ

(এক + আসনিক + অঙ্গ)। ইহা একাগ্রতার ধুতাঙ্গবিশেষ (ascetic practice)। ধুতাঙ্গধারীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র আহার করে থাকেন এবং এক আসনে বসে আহার সমাপন করেন। ইহা ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গব্রতের মধ্যে ৫ম ব্রত।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

এণিজঙ্ঘ

৩২ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণের মধ্যে ৮ম মহাপুরুষলক্ষণ। এণিমৃগের (antelope) জঙ্ঘার মত যাঁর জঙ্ঘা। বুদ্ধের জঙ্ঘাদ্বয় ঈদৃশ ছিল।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

এরক থের

ইনি একজন অর্হৎ। শ্রাবস্তীর এক প্রখ্যাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শরীর বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল ছিল, দৈহিক গঠনও ছিল অতুলনীয়। কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়েও স্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। মাতাপিতা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হল না। তিনি ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর দেশনা শ্রবণ করে সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু মারদ্বারা তিনি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন এবং মিথ্যা বিতর্কে নিরত হন। ভগবান তাঁকে ধর্ম দেশনা দ্বারা প্রণোদিত করেন। তিনি কামের অপকারিতা ও কাম ভোগের পরিণাম উপলব্ধি করলেন এবং অর্হত্বস্তরে উন্নীত হলেন।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন একজন গৃহপতি। একদা তিনি পথে বুদ্ধকে দর্শন করেন। বুদ্ধ এগিয়ে আসছেন, এরক কৃতাঞ্জলিপুটে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন 'আমি কায়িক পুণ্য দান করব'। বুদ্ধের চলার পথ ছিল কর্দমাক্ত। এরক এগিয়ে এসে পথ বিশোধন করে সমান করে দিলেন। সাতান্নকল্প পূর্বে এরক সুপ্রবুদ্ধ নামে রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ এরক এবং অপদানের মল্লদায়ক স্থবির এক ও অভিন্ন।

সূত্র :—

(১) থেরগাথা, ed. H. Oldenberg, P. T. S. 1883

(২) থেরগাথা অট্‌ঠকথা, Vol I, 1940

আশা দাশ

এসুকারী সুত্ত

এসুকারী সুত্তে ব্রাহ্মণ এসুকারী ও বুদ্ধের মধ্যে জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। সুত্তটি মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ডের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ এসুকারী শ্রাবস্তীর জেতবনে ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করেন এবং বিভিন্ন জাতি, তাদের শ্রেণীকরণ ও পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ভগবান বললেন জাতি প্রথা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণগণ বলেন পরিচর্যা চার প্রকার। যথা (১) ব্রাহ্মণের পরিচর্যা (২) ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা (৩) বৈশ্যের পরিচর্যা (৪) শূদ্রের পরিচর্যা। ভগবান এই ব্যবস্থা অস্বীকার করেন এবং এসুকারীকে বললেন সমস্ত বিশ্ববাসী ব্রাহ্মণদের এই চার প্রকার পরিচর্যা ব্যবস্থা নিদান দেওয়ার অধিকার প্রদান করেননি। পরিচর্যার যোগ্য কে? যার পরিচর্যা হেতু পরিচারকের শ্রদ্ধা, শীল, শিল্পজ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় তাকেই পরিচর্যার যোগ্য বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণেরা ৪ প্রকার স্বধন বিধান করেন। তাদের মতে ভিক্ষাচর্যা ব্রাহ্মণের, অস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের, কৃষি ও গোরক্ষা বৈশ্যের এবং কাস্তে বাঁক শূদ্রের স্বধন। ভগবান এই মতের বিরোধিতা করে বলেন লোকোত্তর আর্য-ধর্মই হল স্বধন। ব্রাহ্মণ্য বিধানানুযায়ী উচ্চ নীচ কুলব্যবস্থা হয়েছে এবং ক্ষত্রিয়াদি কুলকর্মানুসারে চতুর্বর্গের জীবিকাকে স্বধনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সত্বগণের লোকাগ্রভাব সিদ্ধ হয়।

সূত্র :—

মজ্ঝিমনিকায় Vol. II, ed. R. Chalmers, 1896-98

আশা দাশ

ওত্তপ্প

অপত্রপা (সং, ঔত্তপ্য)—'পর-গারব-বসেন পাপতো উত্তাসনতো বেসিয়া বিয় ওত্তপ্পং'। কায়দুশ্চরিতাদি পাপকর্মে ভয় এবং উদ্বিগ্নতাই অপত্রপা। লোকনিন্দা, দুর্গতিভয়, রাজদণ্ডভয় ইত্যাদি বহির্জগতের আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। হ্রী বা লজ্জা থেকে অপত্রপার পার্থক্য আছে। হ্রী নিজ চিত্ত থেকে উৎপন্ন হয়, আত্মমর্যাদাবোধ মিথ্যাচারকে ঘৃণা করে লজ্জিত হয়, আর অপত্রপা হচ্ছে বাইরের লোকনিন্দাদি কারণে পাপকর্মে ভীত হওয়া।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

ওপপাতিক সত্তা (ঔপপাতিক সত্ত্ব)

স্বতোজাত সত্ত্ব, অতীতের কর্মানুসারে মাতাপিতার সংযোগ ব্যতিরেকে জাত সত্ত্ব। প্রেত, দেব ও ব্রহ্মাগণ ওপপাতিক সত্ত্ব। ওপপাতিক সত্ত্বগণ অদৃশ্য। তাঁরা অযৌন এবং তাঁদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয় এবং কায়েন্দ্রিয় অকেজো থাকে।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

ওরম্ভাগিয় সংযোজন

অধোভাগীয় বন্ধন (fetters)। যে সকল বন্ধন ব্যক্তিকে কামলোকেই বেঁধে রাখে, এর উপরে যেতে দেয় না, সেগুলোকে অধোভাগীয় সংযোজন বলে। এদের সংখ্যা ৫ যথা—

(১) সৎকায়দৃষ্টি (= আত্মবাদ)

(২) বিচিকিৎসা (= সংশয়)

(৩) শীলব্রত পরামর্শ (= শীলব্রতাদিতে লেগে থাকা)

(৪) কামরাগ (= কামতৃষ্ণা)

(৫) ব্যাপাদ (= বিদ্বেষ)

যিনি প্রথম ৩টি বন্ধন অতিক্রম করতে পারেন তাঁকে বলা হয় স্রোতাপন্ন (অর্থাৎ নির্বাণগামী স্রোতে পতিত) তাঁর আর অধোগতি হবে না। যিনি ৪নং এবং ৫নং বন্ধন অতিক্রম করেছেন তাঁকে বলা হয় সকৃদাগামী (যিনি একবারমাত্র কামলোকে জন্ম নেবেন)। আর যিনি প্রথম ৫টা বন্ধনই অতিক্রম করেন তাঁকে বলা হয় অনাগামী (অর্থাৎ কামলোকে তাঁর আর জন্ম হবে না)। অর্হত্ত্বলাভ করতে হলে ঊর্ধ্বভাগীয় ৫টি বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, যেমন, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী